বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা
রূপ ও রীতি

বিনয় মিত্র

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা
রূপ ও রীতি

www.pathagar.com

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা
রূপ ও রীতি

বিনয় মিত্র

ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ

www.pathagar.com

প্রকাশনার এক দশক

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা : রূপ ও রীতি
শিক্ষাবিষয়ক
বিনয় মিত্র

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৪

প্রকাশক
ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৪৭৬০, ০১৭১৫ ৪২৮২১০, ০১৭১২ ২৩৫৩৪২
e-mail : ittadisutrapat@yahoo.com
web : www.ittadigranthoprokash.com

পরিবেশক
যুক্তরাষ্ট্র : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক
যুক্তরাজ্য : সঙ্গীতা, ২২ ব্রিক লেন, পূর্ব লন্ডন
রূপসী বাংলা লিমিটেড, ২২০ টুটিং হাই স্ট্রিট, লন্ডন

প্রচ্ছদ
সমর মজুমদার

অক্ষরায়ন
বন্ধু কম্পিউটার্স
২৮/সি-২ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।

ছাপাখানা
নিউ এস আর প্রিন্টিং প্রেস
১০/১ বি কে দাশ রোড, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা

মূল্য
২৫০ টাকা

Bangladesher Sikkhabyabasta : Rup O Rati by Binoy Mitra, Published by Ittadi Grantho Prokash : February 2014. Price Tk. 250, ISBN: 978 984 904 369 0

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধেয় সকল শিক্ষককে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

উপক্রমণিকা / ৯
শিক্ষার লক্ষ্য ও আমাদের চিন্তন / ১৩
শিক্ষাব্যবস্থার সেকাল ও একাল / ১৬
শিক্ষার মূল ভিত / ১৮
বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার হালহকিকত / ১৯
শিক্ষা ও বিশ্বশিক্ষকগণ / ২৫
শিক্ষানীতি, ছাত্র অসন্তোষ ও কুমস্রে রিপোর্ট / ৩১
শিক্ষার সাধারণ স্তর / ৩৫
আমাদের বিভাজনধর্মী শিক্ষাব্যবস্থা বনাম জাতিসঙ্ঘ-গৃহীত শিক্ষানীতি / ৩৭
বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা : প্রাথমিক শিক্ষা / ৪০
উপাসনালয়ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা / ৪২
পঞ্চপাণ্ডব ও আমাদের শিশুরা / ৪৩
কিন্ডার গার্টেনভিত্তিক শিক্ষা / ৪৫
ইংলিশ মিডিয়ামভিত্তিক শিক্ষা / ৫৩
সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রাথমিক শিক্ষা / ৫৮
মাদ্রাসাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা / ৬৪
কমিউনিটি কিংবা এনজিও পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষা / ৬৭
শিক্ষাসংক্রান্ত সমাধানযোগ্য কতিপয় সমস্যা / ৬৮
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা / ৮৮
স্কুল-কলেজকেন্দ্রিক সাধারণী শিক্ষা / ৯০
বেসরকারি স্কুল এবং কলেজ / ৯১
বেসরকারি স্কুল কলেজের শিক্ষকবৃন্দ / ৯৩
সরকারি স্কুল-কলেজ এবং এর শিক্ষকবৃন্দ / ৯৮

www.pathagar.com

মাদ্রাসাভিত্তিক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা / ১০৯
বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা / ১১৬
ক্যাডেট কলেজীয় শিক্ষা / ১১৯
উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষা / ১২০
উচ্চশিক্ষা / ১২২
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় / ১২৫
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় / ১২৯
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় / ১৩৩
উচ্চশিক্ষা এবং এর ব্যবহারগত দিক / ১৩৬
উচ্চশিক্ষার বিশ্বমানচিত্র / ১৩৯
বিভিন্ন দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা / ১৪০
শ্রেণিভিত্তিক তুলনামূলক শিক্ষা / ১৪২
শিক্ষানীতি বনাম রাষ্ট্রের চরিত্র / ১৪৮
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার আলোচিত-সমালোচিত কয়েকটি দিক / ১৫০
পাঠ্যপুস্তক ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় / ১৬২
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও কয়েকটি প্রস্তাব / ১৬৫
আমাদের অতীত ও বর্তমান শিক্ষানীতিবিষয়ক কথকতা / ১৬৭
পরিশেষ / ১৭০
'শেষ হয়েও হইল না শেষ' / ১৭৩

www.pathagar.com

উপক্রমণিকা

শিক্ষা নিরন্তর চলমান প্রক্রিয়া—যার শুরু আছে, শেষ নেই। জন্মের পর থেকে শিক্ষাজীবনের অনানুষ্ঠানিক সূচনা; নানা রূপ-রস-বর্ণে-গন্ধে রঞ্জিত হয়ে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এর বিচিত্রবিকাশ। শিক্ষা আহরণের বয়স যেমন নেই, তেমনি নেই নির্দিষ্ট আহরণাগার। সব মানুষ সব সময়ের জন্য শিক্ষার্থী এবং পৃথিবীর সবটুকু জায়গা সবার জন্য উন্মুক্ত, নিয়ত শিক্ষাপীঠ।

ভিন্ন ভিন্ন শিশুর পরিবেশ-প্রতিবেশ-জীবনাচরণ-মাতৃভাষা ভিন্ন ভিন্ন হলেও তাদের শিক্ষাবিকাশের ধরন মোটামুটি অভিন্ন। প্রাথমিক পর্যায়ে সব শিশু, পরিবারের বলয়ে বাবা-মা, ভাইবোন, প্রতিবেশী প্রমুখের মুখ থেকে উচ্চারিত একটা একটা করে শব্দ শেখে নীরবে, যক্ষের ধনের মতো শব্দগুলো আগলে রাখে মস্তিষ্কের কোটরে এবং অন্যের সাথে ছোট ছোট বাক্যে ভাববিনিময়ের মধ্য দিয়ে অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় মাতৃভাষাটি রপ্ত করে নেয়। লক্ষণীয় যে, ওই ভাষার ব্যাকরণ তখন সে কিছুই জানে না, তবে চারপাশ থেকে উচ্চারিত বাক্যাবলি শুনে শুনে শব্দমালা গাঁথার প্রক্রিয়া আত্মস্থ করে নেয় সে, ফলে ব্যাকরণসম্মত বাক্য নির্মাণ করতে তার তেমন অসুবিধে হয় না। সে কখনো বলে না, 'খেলতে ভাত আমি খেয়ে যাব', সে বলে, 'আমি ভাত খেয়ে খেলতে যাব।' শিশুর এই শব্দশিক্ষা বা বাক্য বিনির্মাণবোধ, যাকে বলা যেতে পারে 'সহজাত স্বশিক্ষা' এর অদৃশ্য পাঠশালা সব শিশুর মস্তিষ্কের মধ্যে প্রায় অভিন্নভাবে সুগঠিত হয়, তার ভাষা, পরিবেশ বা প্রতিবেশ ভিন্ন হলেও শিখনপ্রক্রিয়ার মধ্যে তেমন হেরফের থাকে না।

শিশু প্রথমে একটা একটা করে শব্দ শেখে, পরে এর অর্থ ধারণ করে, তারপর শব্দের মালাগাঁথার কৌশলটি রপ্ত করে নেয়। একটু বড় হওয়ার পর, ৩ থেকে ৫ বছর বয়স হলে, কোনো শিশু পাঠ নেয় বিদ্যালয়ে গিয়ে, কেউ বিদ্যালয়ে যেতে না পেরে পাঠ নেয় প্রকৃতির পাঠশালা থেকে। যে বিদ্যালয়ে যায়, বা যে যায় না, উভয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ক্ষণিকের জন্য থেমে থাকে না। উভয়েই নিয়ত শেখে, কেউ শেখে কাগজের বই পড়ে, কেউবা জীবনের বই

www.pathagar.com

পড়ে, পথে-প্রান্তরের, চারপাশের অবিরাম ঘটনাপ্রবাহ থেকে। আমাদের প্রচলিত শিক্ষাপ্রবাহ বিদ্যালয়কেন্দ্রিক বটে, তবে শিক্ষা কেবল প্রতিষ্ঠানাবদ্ধ বা সূত্রবদ্ধ প্রপঞ্চ নয়, তা আহরণ করবার জন্য ছকবাঁধা পদ্ধতিতে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন নেই, যে কেউ যে কোনো পথে স্বাধীনভাবে হেঁটে তা অর্জন করতে পারেন। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিয়ায় বলা হয়েছে, 'Education, any process, either formal or informal, that shapes the potential of a maturing organism. Informal education results from the constant effect of environment and it strength in shaping values and habits cannot be overestimated. Formal education is a conscious effort by human society to impart the skill and modes of thought considered essential for social functioning. Techniques of instruction often reflect the attitudes of society, i, e.'

তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী 'শিক্ষা হলো এমন একটি মানসিক প্রক্রিয়া, যার মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তর্লীন প্রতিভা ও সুপ্ত শক্তিকে বিকশিত করা ও ফুটিয়ে তোলা যায়।' ওই 'বিকশিত করা' বা 'ফুটিয়ে তোলা'র জন্য প্রথাবদ্ধ বিদ্যালয়ের অভাব নেই, তবে প্রকৃত লক্ষ্য অর্জনে সেগুলো যথেষ্ট কার্যকর নয়, কারণ এগুলো 'অন্তর্লীন প্রতিভা ও সুপ্ত শক্তি'কে জাগ্রত করে না, বরং ঘুম পাড়িয়ে দেয়, মনকে প্রসারিত না করে নির্দিষ্ট বৃত্তে আবদ্ধ করে ফেলে; এই বৃত্তাবদ্ধ শিক্ষায় সনদ মেলে, চাকরিও মেলে, তবে যথার্থ জ্ঞান বা স্বকীয়তাবোধ মেলে না; জ্ঞান অন্বেষণের জন্য বিদ্যালয় ছেড়ে বা ফেলে কত জায়গায় যে যেতে হয়, যেতে হয় বিদ্যালয়ী পুস্তকের শাসন এড়িয়ে মুক্ত-পাঠাগারে, যেতে হয় প্রকৃতি বা বিশ্বপাঠশালার আনাচে-কানাচে, পুবে-পশ্চিমে, ডানে-বাঁয়ে—যেখানে যেটুকু 'আলো' মেলে, উপলব্ধির মধ্য দিয়ে তা ধরে রাখতে হয়; এই মুক্ত প্রোজ্জ্বল পাঠশালায় নির্দিষ্ট কোনো সিলেবাস নেই, পরীক্ষা নেই, শেখার জন্য বয়সের পরিসীমা নেই, এটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া এবং মানুষ হয়ে উঠার জন্য অবশ্যম্ভাবী প্রক্রিয়া। এ শিক্ষা থেকে সনদ মিলবে না, চাকরিও না, তবে মানুষ হতে হলে সনদি শিক্ষা না থাকলেও চলে, প্রকৃতিভিত্তিক আত্ম-উদ্বোধনী শিক্ষা ছাড়া মানুষ হবার উপায় নেই।

বিদ্যালয়ী পাঠ্যসূচির সীমা আছে, সীমাবদ্ধতা আছে—কারণ তা আমজনতার জন্য প্রণীত এবং ছকবাঁধা পরীক্ষা পাসের জন্য গৃহীত। অমিত জ্ঞানভাণ্ডারের ভগ্নাংশমাত্রও তা ধারণ করতে সক্ষম নয়। যে কোনো বিষয়ের

www.pathagar.com

সীমিত, খণ্ডিত, অগভীর ধারণার উপর তা প্রতিষ্ঠিত, বিধায় মনের পাঁপড়ি উন্মীলনে ব্যর্থ। এ পাঠ্যসূচি সর্বসাধারণকে স্বাক্ষরযুক্ত করতে চায়, চাকরি-উপযোগী করতে চায়, ফাইল বাঁধা বা খোলা বা আটকে রাখার কৌশল শেখাতে চায়, তাই প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যসাধনের সীমাবদ্ধতায় তা আকীর্ণ। বেশিরভাগ শিক্ষার্থী ওই পাঠ্যসূচি মাড়িয়ে বা চোখ বুলিয়ে সনদ নেয় কেবল, মেধা ও মননের চোখ বন্ধ রেখে ঢুকে যায় চাকরিতে, চাকরিপ্রাপ্তির পর চর্মচোখ খুলে ফাইল-পত্তর দেখে, বিবিধ উপার্জনের পথ খুঁজে ফেরে। তাদের সৃষ্টিশীল মেধা, প্রথাগত শিক্ষায় যা বিকশিত হয়নি, সুপ্ত থেকে থেকে মরে যায় একদিন। মাত্র অল্প কজন, প্রথাগত পরীক্ষা আর পুস্তকি প্রাচীর পেরিয়ে পাখা মেলতে পারেন দশদিগন্তে, জ্ঞান অন্বেষায় ক্লান্তি-শ্রান্তি ভুলে আকাশের পর আকাশ পার হয়ে যান। যত যান, আকাশের অনন্ততা টের পান তত, আর ততই বাড়ে তাঁদের জ্ঞানতৃষ্ণা। বস্তুত জ্ঞানজগতে বিচরণশীল কোনো মানুষ, কেউ কখনো 'পূর্ণ' হয়ে যান না, প্রবীণ হয়ে যান না—আমৃত্যু শিশু বা ছাত্রই থেকে যান। এ প্রসঙ্গে মহাবিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটনের অসামান্য উক্তিটি স্মরণ করতে পারি, 'I seem to play myself like a child on the sea-shore with curious shells and pretty pebbles while the boundless ocean of truth lies undiscovered before me.'

২

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মূল মাধ্যম হলো বই। মনোজাগতিক শিক্ষার মূল মাধ্যম হলো ব্যক্তিক বোধ ও চিন্তন, প্রকৃতি ও পরিবেশ। প্রথমটার অবয়ব ও ব্যাপ্তি সীমিত, তাই সমাপ্তিযোগ্য, পরেরটা সীমাহীন ও অনতিক্রম্য। প্রথমটা বাধ্যবাধকতার বেড়াজালে আকীর্ণ, বিধায় আনন্দবর্জিত, পরেরটা স্বেচ্ছাজাত, তাই অমল-আনন্দে আলোকিত। বিদ্যার্জনের নিমিত্তে দুয়ের মধ্যে যে কেউ যে কোনো পথে হাঁটতে পারেন, তবে প্রথমটি এড়িয়ে যাবার সুযোগ আছে, দ্বিতীয়টি পরিহার করবার উপায় নেই। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩২৮ বাংলায় শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে 'শিক্ষার বিরোধ' শীর্ষক ভাষণে বলেছিলেন, 'বিদ্যা এবং বিদ্যালয় এক বস্তু নয়। শিক্ষা ও শিক্ষা প্রণালী এ-দুটো আলাদা জিনিস। সুতরাং কোনো একটা ত্যাগ করাই অপরটা বর্জন করা নয়। এমনও হতে পারে, বিদ্যালয় ছাড়াই বিদ্যালাভের বড় পথ। আপাতদৃষ্টিতে কথাটা উল্টো মনে হলেও সত্য হওয়া অসম্ভব নয়।'

www.pathagar.com

বিদ্যালয়ী শিক্ষার পরিসর ও প্রভাব সীমিত হলেও, এর ফল প্রত্যক্ষ। মনোজাগতিক শিক্ষার ফলাফল আপাত দুর্নিরীক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের গুটিকয় রচনা পড়ে তাঁকে চেনা যায় না, তবে পরীক্ষায় ভালো করতে অসুবিধে হয় না। চাকরি বাগানোর জন্য ভাসা ভাসা রবীন্দ্রনাথে চলে, তবে মনের চোখ উন্মীলনের জন্য তাঁকে দূর থেকে দেখা চলে না। এজন্য তাঁর সৃষ্টি ও চিন্তাতত্ত্বের গভীরে অবগাহন করা চাই, তাঁর বোধের ভেতরে প্রবেশ করা দরকার। পাঠ্য বইয়ের রবীন্দ্রনাথ, যেন দূর থেকে দেখা ছবি; হৃদয়ের আনন্দে অর্জিত রবীন্দ্রনাথ, তিনিই আসল, অখণ্ড সত্তায় দীপ্তিমান। প্রশ্ন হলো, আমরা কোন রবীন্দ্রনাথকে চাই? চাকরির রবীন্দ্রনাথ, নাকি মনোদীপক, চেতনা-উদ্দীপক রবীন্দ্রনাথ?

আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায়, দ্বিধাহীনচিত্তে বলা যায়, তাতে আশরীর রবীন্দ্রনাথকে জানার উপায় নেই। জানাবার সুচিন্তিত পরিকল্পনাও নেই। এ শিক্ষা জিজ্ঞাসা করার জন্য কাউকে উদ্দীপ্ত করে না, কেবল মুখস্থ শেখায়, চাকরির চিকন-সরু পথ বাতলে দেয়। স্ফীত নম্বরদান, চকচকে সনদ-প্রদান, চাকরির ফাঁপা যোগ্যতা-প্রদান ইত্যাদি ব্যতিরেক এর বিস্তৃত, প্রসারিত কোনো লক্ষ্য নেই। শিক্ষাগবেষক সুধীর চক্রবর্তীর ভাষায়, 'এ দেশে পৌনে দুশো বছর রাজত্ব করে গেছে ইংরেজ সায়েবরা। তারা আমাদের কেরানি বানিয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থা পরীক্ষা সিস্টেম সবই এ দেশে ইংরেজি মডেলে আজও চলছে। ওরাই আমাদের চিন্তাকে চাকরি-সর্বস্ব করে দিয়েছে। ফলে সব গার্জেন নিশ্চিন্ত হন ছেলে চাকরি পেলে। মেয়ের বাবা গর্ব করে সবাইকে বলেন, জামাই আমার ওমুক চাকরি করে। দেশের সব যুবকের প্রথম স্বপ্ন হলো চাকরি করা। সে অফিস কাছারি কলেজ স্কুল ওষুধ কোম্পানি যাই হোক। চাকরিই মোক্ষ, না হলে সর্বনাশ হয়ে গেল।' (লেখাপড়া করে যে, পৃষ্ঠা-১০৯)।

www.pathagar.com

শিক্ষার লক্ষ্য এবং আমাদের চিন্তন

বস্তুত শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য নির্ণয়ে আমরা যেন শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। আমরা ভুলে গেছি, শিক্ষার লক্ষ্য চাকরি নয়, জ্ঞানার্জন। জ্ঞানের নির্মল, সুশীতল বারিতে মন ভিজিয়ে নিজের পরিশীলন, জগৎ ও জীবনকে অনুধাবন এবং অর্জিত প্রজ্ঞায় অন্যকে দ্যুতিকরণ। 'শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই স্বশিক্ষিত'—কথাটা অমান্য করার উপায় নেই। কিন্তু 'স্বশিক্ষা' সাধারণত 'স্বকেন্দ্রিক' থাকার কথা নয়। এটা ছড়িয়ে দেয়ার জিনিস, বিলিয়ে দেয়ার জিনিস, অন্যকে স্বনিষ্ঠ করার জিনিস। একে জোর করে পেটে আটকে রাখলে হয় অজীর্ণতা বাড়বে, অথবা তার তাপে দগ্ধ হতে হবে, নতুবা দম বন্ধ হবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। কাজেই 'স্বশিক্ষা' ব্যক্তিবদ্ধ ব্যাপার নয়, ব্যক্তিক কল্যাণের জন্যও নয়, তা সর্বাংশে দশ-দেশের কল্যাণার্থে নিবেদিত হওয়ার জিনিস।

কিন্তু সমাজ আলো করা, মন কর্ষণ করা, পরশপাথরধর্মী শিক্ষা পাই কোথায়? আমাদের বিদ্যাপীঠ বা বিদ্যাব্যবস্থায় তা কতটুকু মেলে? অথবা আদৌ কি মেলে? উত্তরটা জেনে নেই বরেণ্য শিক্ষাবিদ ও লেখক যতীন সরকারের কথায়, 'বিদ্যার উদ্দেশ্য যদি হয় বাস্তব-পরিপার্শ্বকে জানা ও নিজেকে জানা এবং সেই জানার ফলে পরিপার্শ্বকে ও নিজেকে পরিবর্তন করা, তা হলে বলতেই হয়, এ বিচারে আমাদের অর্জিত বিদ্যা একেবারেই ব্যর্থ ও নিষ্ফল। পরিপার্শ্বকে জানতে হয় তার পরিবর্তন-প্রয়াসের মধ্য দিয়ে, জানা ও পরিবর্তন একই অভিন্ন প্রক্রিয়ার অঙ্গাঙ্গী দুটো দিক, একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি অসম্ভব। বাস্তব কর্মের প্রয়োগশালাতেই বিদ্যা তার যথার্থ রূপটিকে লাভ করে, জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের সম্মিলন ও তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োগের উদ্বাহ বন্ধনের অপর নাম বিদ্যা। আমাদের বিদ্যা যে নিতান্তই মেকি বিদ্যা, তার প্রমাণ ওই উদ্বাহ-বন্ধন না হওয়ার মধ্যেই নিহিত। আমাদের তত্ত্বজ্ঞানের অবস্থান বাস্তবের প্রয়োগশালা থেকে যোজন যোজন দূরে।' [যতীন সরকার রচনাসমগ্র-১, পৃষ্ঠা ৩৬৫]।

বিজলি বাতির আলো দৃষ্টিগ্রাহ্য, ত্বরিৎ ফলদায়ক। শিক্ষার আলো অনুভবযোগ্য, এর উপযোগিতা খুব দৃশ্যমান নয়। 'নগদ নারায়ণে' বিশ্বাসী

www.pathagar.com

বাঙালিকুল শিক্ষার দূরাগত আলোতে আস্থা স্থাপন করতে অনিচ্ছুক। তারা চায় ত্বরিৎ মুনাফা, চায় বিজলি বাতি, সূর্যের আলোর জন্য তারা প্রতিদিন বারো ঘণ্টা করে অপেক্ষা করতে নারাজ। তাদের এই কূপমণ্ডূক প্রবণতা, চাকরিকেন্দ্রিক বৃত্ত আর বিত্তকেন্দ্রিক ঔজ্জ্বল্য ঘিরে আবর্তিত। আমরা বিস্মৃত হয়ে গেছি, প্রাচীন গ্রিক ও আর্য সভ্যতার মধ্যে না ছিল বিজলি বাতি, না ছিল ঐশ্বর্যের ঝলক; কিন্তু জ্ঞানের জ্যোতি ছিল অফুরন্ত। সে জ্যোতি কয়েক হাজার বছর পরও হারিয়ে যায়নি, এতটুকু ম্লান হয়ে যায়নি। কিন্তু এ কথা কে কাকে বোঝাবে?

বর্তমান জমানায়—'সাধারণ ছাত্র এখন কোনও কিছু শিখতে চায় না, শুধু পরীক্ষায় পাস করতে চায়। সে তার নিজের এবং অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছে যে পাস করতে হলে জানতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। প্রতি বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন বাছাই করে, নোট বই থেকে কয়েকটি উত্তর মুখস্থ করে, পরীক্ষার খাতায় যেমন তেমন করে সেগুলি লিখে এলেই অনায়াসে পাস করা যায়। তাই পাঠ্য কোনও বিষয়ে স্থায়ী আগ্রহ তার থাকে না। তাছাড়া আরও একটা বিষয় আছে যা লেখাপড়া থেকে ছাত্রের আগ্রহকে সরিয়ে নেয়। সে দেখে যে, লেখাপড়া শিখে সর্বদা লাভ হয় না। প্রচলিত অর্থে জীবন-সাফল্য প্রায়ই পারিবারিক-সামাজিক সম্পর্ক এবং রাজনৈতিক আনুগত্যের উপর নির্ভর করে। আত্মীয়পোষণ ও দুর্নীতির এই আবহাওয়ায় শিক্ষার মূল্য স্বভাবতই হ্রাস পায় এবং একটি ছাত্র শিক্ষাসায়রে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়ে না। সে সেখানে ভেসে থাকে।' (শিক্ষা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা : সুনীল চট্টোপাধ্যায়, পৃ-১৪৫)। এই কথার সূত্র ধরে আমরা প্রশ্ন করতে পারি, শিক্ষাসায়রে ছাত্রটিই কেবল ভেসে আছে, নাকি আমাদের পুরো শিক্ষাব্যবস্থা সায়রে ভেসে ভেসে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছে?

মুশকিল হলো, চাকরি-সর্বস্ব শিক্ষা কেবল তথ্য শেখায়, নজরুলের জন্মমৃত্যুর সাল, তাঁর গুটিকয়েক কবিতা মুখস্থ করায়, তাঁর কবিতার মনোময় মাহাত্ম্য বা কবিতা লেখার কৌশল ও নিয়ম-কানুন শেখায় না। ভাবে উদ্দীপ্ত করে মনের চোখকে একটুও প্রসারিত করে না। বরং তা শিক্ষার্থীর, বিশেষত শিশুমনের 'কী' এবং 'কেন' প্রশ্ন করার আগ্রহকে দমিয়ে রাখে, অবরুদ্ধ করে রাখে। তার চিন্তাকে ডানা মেলতে দেয় না। কারণ ওই কাজটি করবার দায়িত্ব যাদের উপর অর্পিত, তাঁরা নিজেরাই যে বদ্ধ ঘরের মানুষ, ডানা মেলতে না জানা মানুষ। যারা নিজেরা উড়তে জানে না, তারা উড়ার কৌশল অন্যকে শেখাবে কী করে? যে শিশু পুস্তকি জগতের বাইরে 'এটা কী' 'ওটা কেন'

www.pathagar.com

ইত্যাদি হাজার প্রশ্ন নিয়ে বিচরণ করে, পাঠ্য বইয়ের সংস্পর্শে এসে সে ম্রিয়মাণ হয়ে যাবে কেন? গল্প-কেচ্ছার বই নিয়ে যার প্রবল আগ্রহ, ক্লান্তিহীন অপরিমেয় উদ্যম, বিদ্যালয়ী পুস্তকের বেলায় সে জড়বৎ—এ অবস্থার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কী? এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিমত উদ্ধৃত করা যাক, 'আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা অর্থাৎ অত্যাবশ্যক তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনোই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না—বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়া যায়।... তাহার ফল হয় এই, হজমের শক্তিটা সকল দিক হইতেই হ্রাস হইয়া আসে। যথেষ্ট খেলাধুলা এবং উপযুক্ত আহারাভাবে বঙ্গ সন্তানের শরীরটা যেমন অপুষ্ট থাকিয়া যায়, মানসিক পাকযন্ত্রটাও তেমনি পরিণতি লাভ করিতে পারে না।' (শিক্ষা, ২৭৮-৭৯, রবীন্দ্র রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩০০ বঙ্গাব্দ।)

আনন্দবর্জিত, বাস্তবতাবিবর্জিত, অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির শিক্ষার অফুরন্ত চাপ শুরু হয় শিশুজন্মের তিন কিংবা চার বছরের মধ্যেই। সেই শোচনীয় চাপ—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রায় অর্ধজীবন বয়ে যেতে হয়। প্রারম্ভিক চাপে ন্যুব্জ-পিষ্ট-রক্তাক্ত শিশুমন, পরে আর জ্ঞান আহরণে স্থিত হতে পারে না, পাঠজীবন টেনে নিয়ে যায় কোনোভাবে, বিষণ্নচিত্তে। পরীক্ষার পর পরীক্ষা দিয়ে, গাইড-নোট বই মুখস্থ করে করে, প্রাইভেট-কোচিং সেন্টারে ধরনা দিয়ে দিয়ে, বহুর একাংশ শেষপর্যন্ত উচ্চতর সনদপ্রাপ্ত হয়, কোনো একটা পেশায় প্রবেশ করে এবং উচ্চবেতন বা প্রবল ক্ষমতাধারী কর্মকর্তাও হয়, কিন্তু জ্ঞানজগৎ থেকে তারা বরাবরই বিচ্ছিন্ন থেকে যায়। আমাদের সমাজটাও যেন জ্ঞানসাধনা বা জ্ঞানচর্চায় প্রবল নিরুৎসাহী, এখানে জ্ঞানী অপেক্ষা ক্ষমতাবান, মানী অপেক্ষা ধনীর কদর বেশি। এখানে জ্ঞানব্রতীর অভাব প্রকট, সবাই চায় অর্থ আর শক্তি। যে সমাজে জ্ঞানীর যথাযোগ্য মর্যাদা নেই, শিক্ষকের প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধাবোধ নেই, শিক্ষকতাকে মনে করা হয় অন্য চাকরি না-পাওয়াদের পেশা, সে সমাজে বা দেশে শিক্ষার উন্নতি সাধন করা সহজ ব্যাপার নয়।

www.pathagar.com

শিক্ষাব্যবস্থার সেকাল ও একাল

প্রাচীন সমাজে পাঠশালা বসত গাছতলায়, মাঠে অথবা গুরুগৃহে। বিদ্যার্থীরা জ্ঞান আহরণ করত নিজের গরজে, মন-প্রাণ সঁপে দিয়ে। তারা ভক্তিভরে গুরুপ্রণত হয়ে তাঁর যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করে দিত। তখন বিদ্যাদান ছিল মহান ব্রত, দ্যুতিময় কর্তব্য। মহামতি সক্রেটিস প্রসঙ্গে পাই, একদিন সাতসকালে সক্রেটিস উপস্থিত হলেন সিফিসাসের বাড়ি। মহাপণ্ডিত সক্রেটিসকে দেখে সিফিসাস বিস্মিত হয়ে বললেন, 'মহান পণ্ডিতবর আপনি! খবর দিলে তো আমি নিজেই যেতাম।' সক্রেটিস বললেন, না, তা হবে কেন? যে জ্ঞান লাভ করে ও সত্যের সন্ধান পায়, তা অন্যের কাছে জানিয়ে দেয়া তারই কর্তব্য। এ আমারই কর্তব্য, তাই আপনাকে জানাবার জন্য আমি নিজেই বলতে এসেছি। কালান্তরে বিদ্যাদান হলো মহান পেশা এবং এর সাথে যুক্ত হলো বিনিময় প্রথা । ধীরে ধীরে ওই পেশাটি বিবর্তিত হতে হতে পরিণত হলো আর দশটার মতো সাদামাটা চাকরিতে। বিদ্যা, যা আগে ছিল পূজার পর্যায়ে, একদিন তা হলো আত্মোজ্জ্বল হওয়ার অলঙ্কার। পরে হলো চাকরিপ্রাপ্তির অস্ত্র, এখন হয়েছে বাজারি পণ্য। শিক্ষালয় নামক সুদৃশ্য ভবনগুলো পবিত্রতা হারিয়ে, যেন একেকটা বিপণি-বিতান হয়ে ওঠেছে। শিক্ষা এখন চড়ামূল্যের পণ্য, যার খুচরা ক্রেতার নাম ছাত্র, খুচরা বিক্রেতার নাম শিক্ষক, এর পাইকার ব্যবসায়ী হলো প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, অথবা ক্ষমতাসীন কোনো রাজনীতিক। যারা বিদ্যালয়ের দেহ গড়েন, বোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়-মন্ত্রণালয় বা সংশ্লিষ্ট স্থান থেকে যথাযথ স্বীকৃতি বা অনুমতিপত্র নিয়ে আসেন, তারা বহু টাকা বিনিয়োগ করেন অবশ্যই। বিনিয়োগকৃত টাকা থেকে মুনাফা না এলে ব্যবসায়ী তার টাকা খাটাবেন কেন? লাভ বিনা টাকা দান, জনকল্যাণমূলক নিঃস্বার্থ বিনিয়োগ—বর্তমান বঙ্গীয় সমাজে এমন উদার, নির্মোহ ব্যক্তির দেখা মেলা ভার।

আগে বিদ্যাপীঠ বানাতেন দানবীরগণ, উদারশ্রেণীর মহাজনগণ, নির্মোহ রাজনীতিকবৃন্দ, উদ্দেশ্য ছিল—শিক্ষা প্রসার বা জনসেবা। এখন বিদ্যাপীঠ

www.pathagar.com

বানান শিল্পপতি-ব্যবসায়ী-অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা শিক্ষকরা, এমন কি বেকার ছেলেমেয়েরাও; তাদের উদ্দেশ্য একটাই—মুনাফা অর্জন। তাদের পুঁজির পরিমাণের উপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের ধরন ও প্রকৃতি। বড় পুঁজিওয়ালার হাত থেকে জন্ম নেয় বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ বা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। কম পুঁজিদাররা হাত দেয় প্রথাগত স্কুল বা কিন্ডার গার্টেন গড়ার কাজে। অবশ্য কিন্ডার গার্টেন জন্মদাতার পরিচয় সহজ ছকে আঁকার সুযোগ নেই। এ জগতে বড়-মাঝারি-ছোট, সব কারবারির অবাধ আনাগোনা। কারণ এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়তে বা চালাতে ব্যয় কম, লাভ হয় বেশি। তাছাড়া এখানে যাকে-তাকে নিয়োগ দেয়া যায়, ইচ্ছেমতো কর্তৃত্ব ফলানো যায়, শ্রমিকের চেয়েও কম মূল্যে শিক্ষাশ্রম কেনা যায়, যোগ্যতা যা-ই থাকুক, নিজের প্রতিষ্ঠানে নিজেই বা পছন্দের লোককে অধ্যক্ষ বানানো যায়।

কারবারি-গড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কী পরিমাণ পোশাকি, চটকদারী ও চন্দ্রালোকিত—তা অনুমান করা যায় ওইসব প্রতিষ্ঠানের নামের দিকে তাকালে। 'নর্থ-সাউথ,' 'সাউথ-ইস্ট', 'ইস্ট-ওয়েস্ট', নর্থ-ইস্ট' প্রভৃতি নাম দেখে অনুমিত হয়, দিকের সংখ্যা যদি আরো ক'টি বেশি থাকত, তা হলে আরো কিছু প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা সহজসাধ্য হতো। ক্যামব্রিজ-অক্সফোর্ডের হাস্যকর মিশেল 'অক্সব্রিজ', প্রথমটি থেকে উপজাত শব্দ 'ক্যামব্রিয়ান, কিংবা 'এশিয়ান,' 'আমেরিকান,' 'স্ট্যামফোর্ড' প্রভৃতি শব্দ সংবলিত প্রতিষ্ঠানের নাম দেখে দ্বন্দ্বে পড়ে ভাবতে হয়, এগুলো কি ভাষা-শহিদ 'রফিক-সালাম-বরকত-জব্বার'-এর রক্তভেজা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান?

জগন্নাথ, আনন্দমোহন, ব্রজলাল, আজিজুল হক, আশেক মাহমুদ—প্রভৃতি নাম এখন বোধহয় পুরনো, কালগত, প্রমিতবোধবর্জিত হয়ে গেছে। আমরা এখন বাপদাদার স্মৃতি ভুলে, সাত সমুদ্র-তেরো নদীর ওপাড়ে, দূরবর্তী স্বপ্নে আপাদমস্তকে বিকুলিত। আমাদের নতুন প্রজন্ম যেন ২১ ফেব্রুয়ারি, ১ বৈশাখ এ দুটি দিন ছাড়া আর বাকি দিনগুলোতে বাঙালি থাকতে নারাজ। তারা, প্রায় সবাই চায় ইংরেজ হতে, ইংরেজি ভাষায় স্বপ্ন কিংবা চিন্তা সাজাতে। নতুন প্রজন্মের এমন উন্মূল প্রবণতা আমাদের শিক্ষাব্যবসায়ীদের জানা আছে ঢের। তাই তারা কাককে ময়ূর বানাবার ফাঁকা প্রতিশ্রুতি দিয়ে একের পর এক বাংলিশ শিক্ষালয় গড়ে তুলছেন। তাদের বিচিত্র ব্যবসার বিভিন্ন সেক্টরের সাথে জুড়ে দিচ্ছেন নতুন একটা উয়িং, 'এডুকেশানাল বিজনেস'। সেখানে নিত্য তৈরি করা হচ্ছে 'ড্যাডি-পাপ্পা-মাম্মি' প্রভাবিত একুশ শতকীয় 'ইয়ং বেঙ্গল' (টাইগার)।

www.pathagar.com

শিক্ষার মূল ভিত

বৃক্ষ যেমন শাখা-প্রশাখাসহ দাঁড়ানো থাকে মূলের উপর, বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া সব শিশুমনের মূল ভিত গড়ে উঠে তার পারিবারিক আবহে। পরিবার বা এর সন্নিহিত আবেশ থেকে শিশুর প্রাথমিক মানসগঠন বা চারিত্র্যবিকাশ শুরু হয়। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তার মনোবৃত্তের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়ে দূর থেকে দূরান্তরে। আমরা বড়রা, শিশুর এই নীরব শিক্ষাপ্রবাহ অনুধাবনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হই। তাই তাদের মানসপ্রকৃতি ও চাহিদাকে গ্রাহ্য না করে সবকিছু নিজের মতো করে চালাতে চাই। ওদেরকে তোতাপাখি বানিয়ে বোঝাই, "তোমরা হলে দুধের শিশু। অবোধ ও অজ্ঞান। তোমাদের জীবন সাজাবার পুরো দায়িত্ব আমাদের। যা বলব, বিনা প্রশ্নে মেনে নেবে।" এক্ষেত্রে যারা সবকিছু মেনে নেয়, আমরা বাহবা দিয়ে তাদেরকে বলি 'ভালো শিশু'। যারা মানতে গররাজি হয়, তাদের নাম দেই 'বেয়াড়া শিশু।' মুশকিল হলো, আমরা বড়রা চোর-ঘুষখোর-ধান্দাবাজ-প্রতারক-মেধাশূন্য, যা-ই হই না কেন, নিজের সন্তানের কাছ থেকে দাবি করি ঝলমলে আচরণ, দ্যুতিময় ভবিষ্যৎ। নিজের আমলকিত্ব বিস্মৃত হয়ে আত্মজের কাছে আম্রত্ব প্রত্যাশা করা—অদ্ভুত ব্যাপার নয়?

প্রকৃতপ্রস্তাবে মূলের ভিত শক্ত না হলে গাছের কাণ্ড-শাখা-প্রশাখা যেমন নড়বড়ে হয়ে পড়ে, হেলে পড়ে, দোলে পড়ে, বা ভেঙে যায়—তেমনি শিক্ষার প্রথম স্তরটি যদি দুর্বলতায় আকীর্ণ থাকে, বিজ্ঞানবর্জিত অযৌক্তিক পথে এগোয়, তাহলে মূলের অপুষ্টতা বা চিত্তের দীনতা পরবর্তীকালে কাটিয়ে ওঠা খুব একটা সম্ভব হয় না। কাজেই নিজেদের স্বার্থে, দেশের কল্যাণার্থে সার্বিক শিশুশিক্ষা মনস্তত্ত্বধর্মী, উদ্দীপক, বিজ্ঞানসম্মত ও বস্তুনিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মতে, 'জ্ঞান উন্মেষের পর শিশু যখন তার চারপাশের জগতের দিকে তাকিয়ে দেখে তখন মন তার চরম বিস্ময়ে ভরে ওঠে। চারপাশে যা কিছু সে দেখে, সবই তার কাছে রহস্যময় বলে মনে হয়, তার কৌতূহলী মনে কত প্রশ্নই না জাগে। এজন্য শিশুদের শিক্ষার ভার যাদের হাতে আছে, তাদের উচিত সাধারণত হাতের কাছে যেসব জিনিস পাওয়া যায়, যা ছোট ছেলেমেয়েদের মনকে আকর্ষণ করে—যে কোনো ফুল, লতাপাতা, পাখি এমনি সব টুকরো-জিনিসের ওপর নজর দিতে শেখানো। কাজটা অবশ্য শক্ত। শিক্ষকদের নিজেদের মনকে ছোটদের কৌতূহলী মনের রসে রসিয়ে নিতে হবে। তার জন্য চাই শিক্ষকদের একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা অর্জন করা, যাতে তাঁরা ছাত্রদের সঙ্গে সহজে মিশতে পারেন।... প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়

www.pathagar.com

রাখতে গেলে শিশুর মনে সবার আগে জাগিয়ে তুলতে হবে কৌতূহল, তাদের নতুন নতুন জিনিস সংগ্রহের ভার দিতে হবে।... আমরা তাদের সামনে বস্তুর পাহাড় তুলে ধরেছি, আর চেয়েছি সেই পাহাড়ই তারা উদ্‌গীরণ করুক। বস্তুর মর্মে যে সত্য নিহিত আছে, সেই সত্যের দ্বারে তো আমরা ছাত্রদের পৌঁছে দিতে পারিনি।' (শিশু ও বিজ্ঞান, সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, কলিকাতা, ১৩৯৯)।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার হাল হকিকত

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা কী প্রত্যাশা করি? নিজে যা হতে পারিনি, ছেলেমেয়েকে বোধহয় তা-ই বানাতে চাই। ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-জজ-ম্যাজিস্ট্রেট, এমনকি সরকারি অফিসের কেরানি হলেও চলে, তবে কোনোভাবেই তাকে শিল্পী-সাহিত্যিক-শিক্ষক বানাতে চাই না। আমাদের কাম্য কেবল উপার্জনকারী পেশা, দেশের গান গেয়ে বিদেশে স্থায়ী হওয়ার চেষ্টা করা—আমাদের আজন্ম নেশা। আমাদের উদ্দেশ্য চর্বিযুক্ত সার্টিফিকেটের জোরে মেদবহুল আয়ের চাকরি, নিজেকে চেনা বা সত্যকে জানা অথবা জীবনের মর্মমূলে প্রবেশের চিন্তা না আছে কারো চিন্তাতে, না আছে শিক্ষারীতি বা নীতিতে। আমাদের বিজ্ঞজনেরা, যারা শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক ও নীতিনির্ধারক, তারা নিশ্চয়ই এ ব্যবস্থার ত্রুটি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল। তা না হলে, দেশের জন্য কেঁদে কেঁদে যারা গণ্ডায় গণ্ডায় রুমাল ভেজান, তারা কেন নিজের ছেলেমেয়েকে বিদেশ পাঠিয়ে দেন শিক্ষালাভের নিমিত্তে? নিজেদের প্রণীত ব্যবস্থায় নিজেরা যদি আস্থাহীনতায় ভোগেন, তাহলে ওই ব্যবস্থার অসারতা প্রমাণের জন্য তথ্য-উপাত্তের প্রয়োজন পড়ে কি?

প্রথাগত ধারায়, শিক্ষা বলতে বোঝায়—কতকগুলো বই মুখস্থ করা এবং পরীক্ষা নামক মঞ্চে সফলভাবে তা উদ্‌গীরণ করে দেয়া; শিক্ষিত ব্যক্তি বলতে বোঝায়—ওইসব প্রথাগত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সার্টিফিকেটধারী ব্যক্তি, যার যত বেশি সার্টিফিকেট আছে, তিনি তত বড় শিক্ষিত। ওইসব সনদের ভারিত্ব-পুরোত্ব—ব্যক্তির জ্ঞান-গরিমার পরিমাপক, চাকরির সহায়ক। 'সে-বিদ্যার বাস্তব মূল্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হলেও, তার ছাপটির মূল্য অপরিসীম। সেই ছাপ বা ডিগ্রি ডিপ্লোমা সার্টিফিকেটের জোরে শাসক শ্রেণীর কৃপাধন্য হওয়ার ও জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ এখনও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান বলেই সে ছাপটি অর্জন করার জন্য নাগরিকবৃন্দের প্রয়াসের অন্ত নেই। বিদ্যার পরীক্ষা দিয়ে সে ছাপটি অর্জিতব্য। আর পরীক্ষার অন্য নাম তো প্রতারণা, পরীক্ষক

www.pathagar.com

ও পরীক্ষার্থী দুই-ই সেখানে প্রতারণার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ। পরীক্ষককুল প্রশ্নপত্র তৈরি করেন গোপনে—এই গোপনীয়তার মধ্যেই প্রতারণার একটা মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি নির্মিত।... পরীক্ষার্থীদের তো আসলে বিদ্যার পরীক্ষা দিতে হয় না, দিতে হয় ওই প্রতারণা-ভেদের পরীক্ষা। এক বা একাধিক বছর ধরে অনুশীলিত বিদ্যার যদি পরীক্ষা দিতে হয় দুই বা তিন ঘণ্টা সময়সীমার মধ্যে, তা হলে সে পরীক্ষায় ফাঁক ও ফাঁকি থাকা তো একেবারেই অপরিহার্য।' [যতীন সরকার, রচনাসমগ্র ১, পৃষ্ঠা-৩৭৬]

বর্তমান সমাজে মেধাবী ছাত্র মানে ভালো নম্বরধারী ছাত্র। তার কাণ্ডজ্ঞান কম থাকুক, স্বকীয়তা না-ই থাকুক, কলাবোধ না থাকলেও ক্ষতি নেই, কেবল পরীক্ষায় উচ্চ নম্বর পেলেই কেল্লাফতে। তার ছবি ছাপা হবে পত্রিকায়, পুরস্কৃত করবার জন্য এখান-ওখান থেকে ডাকা হবে তাকে, তার উচ্চ নম্বরপ্রাপ্তির পেছনে কোন বিদ্যাপীঠ বা কোচিং সেন্টারের ভূমিকা কেমন ছিল—এই নিয়ে বিজ্ঞাপন চলতে থাকবে দিনের পর দিন। আমরা একবারও ভাবি না, বেশি নম্বর পেলেই মেধাবী হয় না, বড় সনদধারী হলেই 'শিক্ষিত' হয় না। আবার সনদহীন ব্যক্তি মাত্রই 'অশিক্ষিত' হয়ে যায় না। 'শিক্ষা' মূলত মনন-সংবেদন, পরিচর্যা, পরিশীলন, চেতনাসংশ্লিষ্ট ব্যাপার। এর সাথে প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ বা সার্টিফিকেটের সম্পর্ক নেই। সার্টিফিকেট হলো চাকরিপ্রাপ্তির অবশ্যম্ভাবী উপাদান, তবে তা জ্ঞান বা মনুষ্যত্ব অর্জনের সনদ নয়। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা, তা কেবল সার্টিফিকেটের যোগানদাতা, তা ব্যক্তির ভেতরের জ্ঞানস্পৃহা ও মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তুলতে পারে না। এ ব্যবস্থা কেবল চাকরিজীবী সাহেব বা বড়বাবু তৈরি করতে পারে, যে সাহেব বা বাবু সম্পর্কে তীর্যক মন্তব্য করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'যাঁহার বুদ্ধি বাল্যে পুস্তকমধ্যে, যৌবনে বোতল মধ্যে, বার্ধক্যে গৃহিণীর অঞ্চলে, তিনিই বাবু। যাঁহার ইষ্টদেবতা ইংরেজ, গুরু ব্রহ্মধর্মবেত্তা, বেদ দেশী সংবাদপত্র এবং তীর্থ 'ন্যাশনাল থিয়েটার', তিনিই বাবু।... যিনি নিজ গৃহে জল খান, বন্ধু গৃহে মদ খান, বেশ্যা গৃহে গালি খান এবং মুনিব সাহেবের নিকট গলাধাক্কা খান, তিনিই বাবু।... যাঁহার যত্ন কেবল পরিচ্ছদে, তৎপরতা কেবল উমেদারীতে, ভক্তি কেবল গৃহিণী বা উপগৃহিণীতে এবং রাগ কেবল গ্রন্থের উপর, নিঃসন্দেহে তিনি বাবু।' [বাবু, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সুবোধ চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃ. ১১-১২]

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার পরতে পরতে দুর্বলতা, কূপমণ্ডূকতা, বিজ্ঞানহীনতা বিদ্যমান। বস্তুত 'বিজ্ঞান' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'বিশেষ

www.pathagar.com

জ্ঞান'কে আঁকড়ে থেকে আমরা প্রকৃত জ্ঞানের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি। ওই বিশেষ জ্ঞান যে সামগ্রিক বিদ্যার একাংশ মাত্র, সেদিকে কারো দৃষ্টি নেই। আমাদের প্রচলিত বিদ্যায় প্রথাগত বিশেষজ্ঞ তৈরি হয়, মানবিক বোধসম্পন্ন মানুষ তৈরি হতে দেখা যায় না। শতাধিক বছর আগে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদেশীয় শিক্ষার তিনটি ত্রুটি নির্দেশ করেছিলেন, কালান্তরে সেগুলো যেন আরো সত্য হয়ে দেখা দিচ্ছে :

ক. আধুনিক শিক্ষার প্রথম দোষ জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলির প্রতিই অধিক মনোযোগ; কার্যকারিণী বা চিত্তরঞ্জিনীর প্রতি প্রায় অমনোযোগ।

খ. আধুনিক শিক্ষাপ্রণালির দ্বিতীয় ভ্রম এই যে সকলকে এক এক, কি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পরিপক্ব হইতে হইবে—সকলের সকল বিষয়ে শিখিবার প্রয়োজন নাই। যে পারে, সে ভালো করিয়া বিজ্ঞান শিখুক, তাহার সাহিত্যের প্রয়োজন নাই। যে পারে, সে সাহিত্য উত্তম করিয়া শিখুক, তাহার বিজ্ঞানের প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে মানসিক বৃত্তির সকলগুলির স্ফূর্তি ও পরিণতি হইল কৈ? সবাই আধখানা করিয়া মানুষ হইল, আস্ত মানুষ পাইব কোথা? যে বিজ্ঞান কুশলী, কিন্তু কাব্যরসাদির আস্বাদনে বঞ্চিত, সে কেবল আধখানা মানুষ। অথবা যে সৌন্দর্যদত্ত প্রাণ, সর্ব সৌন্দর্যের রসগ্রাহী, কিন্তু জগতের অপূর্ব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে অজ্ঞ—সে-ও আধখানা মানুষ। উভয়েই মনুষ্যত্ববিহীন, সুতরাং ধর্মে পতিত।

গ. জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে একটি সাধারণ ভ্রম এই যে সংকর্ষণ অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন, বৃত্তির স্ফুরণ নহে। যদি কোনো বৈদ্য রোগীকে উদর ভরিয়া পথ্য দিতে ব্যস্ত হয়েন, অথচ তার ক্ষুধাবৃদ্ধি বা পরিপাক শক্তির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করেন, তবে সেই চিকিৎসক যেরূপ ভ্রান্ত, এই প্রণালির শিক্ষকেরাও সেইরূপ ভ্রান্ত। যেমন সেই চিকিৎসার ফল অজীর্ণ, রোগবৃদ্ধি—তেমনি এই জ্ঞানার্জন বাতিকগ্রস্ত শিক্ষকদের শিক্ষার ফল মানসিক অজীর্ণ—বৃত্তিসকলের অবনতি। মুখস্থ করো, মনে রাখো, জিজ্ঞাসা করিলে যেন চটপট করিয়া বলিতে পারো। তারপর, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইল কি শুষ্ক কাষ্ঠ কোপাইতে কোপাইতে ভোঁতা হইয়া গেল, স্বশক্ত্যবলম্বিনী হইল, কি প্রাচীন পুস্তক-প্রণেতা এবং সমাজের শাসনকর্তৃরূপ বৃদ্ধ পিতামহীবর্গের আঁচল ধরিয়া চলিল, জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলি বুড়ো খোকার মতো কেবল গিলাইয়া দিলে গিলিতে পারে, কি আপনি আহারার্জনে সক্ষম হইল সে বিষয়ে কেহ ভ্রমেও চিন্তা করেন না। এই সকল শিক্ষিত গর্দভ জ্ঞানের ছালা পিঠে করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া

www.pathagar.com

বেড়ায়—বিস্মৃতি নামে করুণাময়ী দেবী আসিয়া ভার নামাইয়া লইলে তাহারা পালে মিশিয়া সচ্ছন্দে ঘাস খাইতে থাকে।" [ধর্মতত্ত্ব, বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড, সুবোধ চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃ. ৬১৩-১৪]

বঙ্কিমচন্দ্র এই কঠোর মন্তব্যটি করেছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করে। এরপর দেশ বিভাগ হলো। ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি পৃথক রাষ্ট্র জন্ম নিল। পাকিস্তান ভেঙে বাঙালির নিজস্ব আবাসভূমি তৈরি হলো। পণ্ডিত-বিদ্বান ব্যক্তিবর্গের তত্ত্বাবধানে বারবার শিক্ষানীতি প্রণীত হলো। কিন্তু না, আমাদের বিদ্যাপীঠগুলো এখনও বঙ্কিমকথিত 'শিক্ষিত গর্দভ' তৈরি করা ছাড়া কাজের কাজ কিছুই করতে পারছে না। কী পূর্ব, কী পশ্চিম—উভয় বঙ্গে শিক্ষার হাল হকিকতে তেমন ভিন্নতা পরিদৃশ্যমান নয়।

আমাদের ছাত্রছাত্রীরা, এখন আর বিদ্যাগ্রহীতা নয়, বিদ্যাক্রেতা। ক্রেতার সাধারণ ধর্ম হলো, বাজার যাচাই করে একই মানের জিনিস যত সস্তায় কেনা যায়, এর চেষ্টা করা। জিনিস একটু খারাপ হলেও ক্ষতি নেই, তা চকচকে, টেকসই হলেই হলো। বর্তমান বিশ্বায়নের কালে কোনো পণ্য কিনতে যেমন খুব দূরে যেতে হয় না, টাকা থাকলে তা যেমন যত্রতত্র থেকে কেনা যায়—তেমনি এখন শিক্ষা নামক পণ্যটি কেনার জন্য শিক্ষালয়ে হাজির হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। শিক্ষাক্রেতারা লাইন দেয় নিজের সুবিধেমতো জায়গায়, প্রাইভেট টিউটরের কাছে, অথবা মেকি আলোয় ঝলমলকরা 'কোচিং সেন্টার'-এর বারান্দায়। নগদ অর্থ ঢেলে অধিক নম্বর প্রাপ্তির নিশ্চয়তা যেখানে মিলছে, সে জায়গাটা ছাত্রপদভারে স্বীকৃতিবিহীন বিদ্যাপীঠের পরিচিতি পেয়ে যাচ্ছে। যে সব ছাত্রের হাতে টাকা নেই, অর্থ ঢেলে বিদ্যাক্রয়ে যারা অসমর্থ—তারা যে শ্রেণিমুখী হচ্ছে, এমন নয়। তারা ছুটছে অন্য পথে, শর্টকাট রাস্তায়। আমাদের করিৎকর্মা শিক্ষাব্যবসায়ীরা তাদের জন্য বাজারে ছেড়েছে 'শিউর সাকসেস' বা 'শেষ সম্বল' জাতীয় গাইড বই, নোট বই। কম খরচ করে অথবা কম কষ্ট করে প্রাপ্তি যদি সন্তোষজনক হয়, তবে চতুর বাঙালি নন্দনদের মধ্যে কে যায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বিদ্যার্জনের ঝামেলায়?

পরাধীন ভারতবর্ষে, সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী ব্যক্তির মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র কেবল দেখেছেন 'আধখানা মানুষ'। তখনকার কলাবাদীরা বিজ্ঞান কিংবা বিজ্ঞানবাদীরা কলাবিদ্যায় হয়তো কাঁচাই ছিলেন, তবে তাঁরা কেউ যে ইংরেজি শিক্ষায় নাদান ছিলেন না, এ কথা জোর দিয়ে বলা যায়। আমাদের বর্তমান সময়ে উচ্চশিক্ষিত বলে যারা কথিত, তাদের ভেতরে না আছে কলা, না

www.pathagar.com

বিজ্ঞান, না ইংরেজি দক্ষতা? হাল আমলে তুখোড় মেধাবী বলে কথিত, যারা—স্থাপত্য-চিকিৎসা বা অন্য 'বিশেষ জ্ঞানের' ধারক ও বাহক, বাংলা ভাষার সহজ বানান ভুল করে হাসি দিয়ে বলেন,' বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম তো, তাই বানানশিক্ষা রপ্ত করতে পারিনি।' কেউ কেউ বলেন, 'ছাত্রজীবনে বিজ্ঞানের সূত্র আর অঙ্ক করতে করতে সময় গেল, পেশাগত জীবনে কাজ করতে করতে প্রাণান্তকর অবস্থা। রবীন্দ্র-নজরুল দেখার সময় কই?' সেদিন কারবারি বিদ্যার সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী একজন বললেন, 'আইনস্টাইনের নাম শুনেছি বটে, খুব বিখ্যাত ছিলেন—তবে কীসের জন্য বিখ্যাত, ঠিক মনে করতে পারছিনে।'

কলাবিদ্যার সর্বশেষ সনদধারী বেশ কজন আছেন আমার আশেপাশে। তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বা কিন্ডার গার্টেনে চাকরি করতে গিয়ে বড্ড বিপদে পড়েছেন। তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণির অঙ্ক নিয়ে মুশকিলে আছেন। বাজার থেকে গাইড বই-নোট বই কিনে এনে, অনেক শ্রম ব্যয় করেও কামিয়াব হতে পারছেন না। ইংরেজির বেলায় তাদের অবস্থা আরো করুণ ও শোচনীয়। আগে নিজে মুখস্থ করে তবেই যান শ্রেণিকক্ষে, ছাত্র পড়াতে। সেখানে কী পড়ান, কেমন পড়ান—জানার সুযোগ নেই, তবে তাদের কড়া মেজাজের কথা ছাত্রদের মুখে প্রায়ই শুনতে পাই। পড়াতে গিয়ে তারা নাকি রেগে যান, প্রশ্ন করলে আরো বেশি রাগেন, 'গাধা', 'গরু', 'ছাগল' প্রভৃতি বেচারা প্রাণীর নাম নিয়ে মনের ঝাল মেটান। ওইসব অবুঝ প্রাণীরা, যাদের তাদের নামে মনুষ্যশিশুকে অহরহ সম্বোধন করা হচ্ছে, তারা এটা যদি জানতে পারত তাহলে হৃষ্টচিত্তে ভিড় জমাত সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোর আঙ্গিনায়।

আমাদের ওইসব উচ্চ ডিগ্রিধারীদের এহেন বেহাল অবস্থার কারণ কী? বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভারী সনদে সজ্জিত হওয়ার পরও, তাদের আপাদমস্তক কৃশ, মলিন-ধূসর কেন? সাধারণ জ্ঞানে, পাঠদানে, অঙ্ক-ইংরেজিতে তারা দুর্বল থাকে কেন? আরো একটু বড় ক্লাসে পড়াতে গেলে কী করুণ দশা হবে তাদের? যারা নিজেরা সৃজনশীল, আলোকিত, বিদ্যাবর্তিকা হওয়ার কথা, শিশুশিক্ষা প্রদানেই তাদের কেন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা? এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য—'গর্দভ অনেক রকমের অনেক বস্তু পৃষ্ঠে বহন করে। একটি গর্দভের ভার নামাইয়া খুলিয়া দেখুন—অমুক রাজার বাড়ির একশত টাকা মূল্যের একখানি শান্তিপুরে শাড়ী, অমুক বড়লোকের গৃহিণীর একটি বিচিত্র ঢাকাই শাড়ী, কৃষ্ণকান্ত তর্কালঙ্কারের একখানি ছেঁড়া মলমলের চাদর, ফয়জুল্লা শেখের আধখানি

www.pathagar.com

পায়জামা—উত্তম, মধ্যম, অধম অনেক রকম বস্ত্র দেখিতে পাইবেন, গর্দভের বাছাবাছি নাই, সে সব বহন করে। কৃতবিদ্য যুবকদের মধ্যে একটি ভার নামাইয়া দেখুন—শেক্সপীয়রের একটি প্লে, মিল্টনের দুই ছত্র, কালিদাসের আধখানি শ্লোক, মিল এবং হামিল্টনের দুইটি কথা; গৃহিণীর রচিত একটি পদ্য, বটতলার একখানি নাটকের এক অঙ্ক দেখিতে পাইবেন। গর্দভ অনেক বস্ত্র বহন করে, কিন্তু আপনি উলঙ্গ—ইহার পৃষ্ঠে বিদ্যাবিষয়ক অনেক কথা আছে, কিন্তু আপনি কোনো বিষয়েই বাক্যব্যয় করিতে পারে না। একজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করুন, 'মহাশয়, অমুক বিষয়ে আপনার মত কি?' বাবু থেলিস হইতে অগস্টী কোমটী পর্যন্ত সকলের নাম আওড়াইবেন, কিন্তু নিজের মতের বেলা পৃষ্ঠ হাতড়াইয়া দেখিবেন, কেশব বাবু কিছু বলিয়াছেন কি-না? যদি না বলিয়া থাকেন তবেই অবাক।'

অর্থাৎ চন্দ্রশেখর বাবুর অভিমত, আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিরা বিচিত্র বিচিত্র বিদ্যার খণ্ড খণ্ড ভার বহন করেন মাত্র, জানেনও না তাদের কাঁধে বিদ্যার কোন কোন বোঝা আছে। কোনো বিষয়ে মতামত দিয়ে গিয়ে তারা কেবল ধার করা কথা বলেন, নিজের ভেতর থেকে মৌলিক মত দিতে পারেন না। অর্জিত বিদ্যার আলোকে নিজের আলো ছড়াতে পারেন না। কেন পারেন না? কারণ, তাদের পুরো শিক্ষা আহরিত, অন্যের জমি থেকে সংগৃহীত, কোনোটাই নিজের চেতনা দ্বারা উপলব্ধ নয়। মুখস্থ বা ক্রীত বা কুড়িয়ে পাওয়া বিদ্যা, বাজার থেকে নিয়ে আসা সব্জি বা মাছের মতো, আনার সময় যতই টাটকা-সজীব থাকুক, দুদিন পরেই নিশ্চিত পচন ধরে তাতে, অর্থাৎ নষ্ট হয়ে যায়। ফ্রিজিং করে আয়ু কিছু বাড়ানো যায় বটে, কিন্তু তাতে স্বাদ ও সজীবতা কদিনই বা ধরে রাখা যাবে? বস্তুত বর্তমান জমানায়, বিশেষত বঙ্গীয় সমাজে, কেবল তা-ই বা বলি কেন, কৃশ-স্ফীত অনেক দেশে, শিক্ষা কেবল কেতাব থেকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মাথায় ধারণ করবার অনুষঙ্গ, সময়মতো উদ্‌গীরণ করবার বিষয়—এর চেতনগ্রাহ্য রূপ প্রায় অপ্রত্যক্ষ, বিরল।

www.pathagar.com

শিক্ষা ও বিশ্বশিক্ষকগণ

কোনো সভ্য দেশ বা জাতি-সৌধের অন্যতম নয়, মূল স্তম্ভ হলো শিক্ষা। সম্পদ বা ঐশ্বর্য মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারে, তেল-গ্যাস-স্বর্ণ-হীরক খনি হিসেবে। লটারির টিকেটে হঠাৎ করে বিপুল টাকা হাতে আসতে পারে। শিক্ষা আকাশ থেকে পড়ে না, মাটির নিচ থেকে বেরোয় না, লটারির মাধ্যমে পাওয়া যায় না। সেটা অর্জনের জিনিস, যুগ যুগ ধরে সাধনা, গবেষণা ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে অর্জন করতে হয়। মাটির নিচে জমাকৃত সম্পদ, যার কথা কিছুক্ষণ আগে বলেছি, সেটাও এমনি এমনি নাগালে আসে না, তা করায়ত্ত করবার জন্যও চাই শিক্ষা। শিক্ষা সম্পদ-ঐশ্বর্য-সুখ-প্রাপ্তি, এমন কি ভাগ্য বা ভাগ্যবিধাতাকেও নিয়ন্ত্রণ করে, সে নিজে নিয়ন্ত্রিত হয় বিশ্বপ্রকৃতির শৃঙ্খলা দ্বারা।

শিক্ষার পরিসর অসীম, তাকে নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ করবার উপায় নেই, তবে তা অর্জন বা আহরণের উপায় প্রণালিবদ্ধ করার সফল-অসফল প্রয়াস লক্ষণীয়। এর সংজ্ঞা, লক্ষ্য, গ্রহণের উপায় ইত্যাদি বিষয়ে তাবৎ বিশ্বে কত না আলোচনা হয়েছে। আলোচনার আকার যত বেড়েছে, আলোচকদের মতভিন্নতার ব্যাপ্তি তত বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক সব কুলের মনীষী নিজের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী শিক্ষার সংজ্ঞায়ন করেছেন এবং তা গ্রহণের পদ্ধতি উপস্থাপন করেছেন। দৃষ্টিকোণের ভিন্নতাসূত্রে শিক্ষার রূপ-রস-বর্ণ বিচিত্রতায় ভরে গেছে, তবে একটা বিষয়ে সবাই একমত হয়েছেন যে, শিক্ষা জীবনব্যাপী অনুশীলনভিত্তিক বহুমাত্রিক পপঞ্চ, যার কেবল শুরু আছে, শেষ নেই।

শিক্ষা সম্পর্কে কতিপয় আলোচিত অভিমত

সক্রেটিস (৪৭০-৩৯৯ খ্রি. পূর্ব) : জগৎখ্যাত শিক্ষক, দার্শনিককুল-শিরোমণি সক্রেটিসের শিক্ষাদর্শন ছিল, আত্ম-আবিষ্কারের মাধ্যমে জগৎ ও জীবনকে জানা। প্রশ্নের পর প্রশ্নে মনের সুপ্ত ও গুপ্ত অনুজ্ঞাকে বাঁধনমুক্ত করতে হবে,

www.pathagar.com

বুদ্ধি-যুক্তির নিবিড় অনুশীলনে, পারস্পরিক আনন্দময় মিথস্ক্রিয়ায় সত্যানুসন্ধানে ব্রতী হতে হবে। শিক্ষায় থাকবে প্রশ্ন করবার অবকাশ, যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের সুযোগ এবং এমন একটা পরিমণ্ডল, যেখানে ছাত্র ও শিক্ষককে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে।

প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ খ্রী. পূর্ব) : সক্রেটিসের সত্যানুরাগ, 'আত্ম-আবিষ্কার' ও 'Only an examined life is worthliving' (পরীক্ষিত জীবনই সার্থক জীবন) এই তত্ত্বকে সামনে রেখে তদীয় শিষ্য প্লেটো নিজের শিক্ষাভাবনাকে চারটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। প্রথম স্তরটি কল্প ও গল্পময়, 'মনে করা'র স্তর। এ স্তরে শিশুমনে জিজ্ঞাসার জন্ম হয়। দ্বিতীয়টি 'বিশ্বাসনির্ভর স্তর; এটা কল্পনার খোলস ছেড়ে নিজের ভাবনাবৃত্তে স্থিত হওয়ার স্তর। তৃতীয়টি যুক্তি-বুদ্ধি-পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি প্রয়োগ করবার স্তর। পরেরটি যুক্তি, সাধনা, বিচার-বিশ্লেষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণে সিদ্ধ হওয়ার স্তর।

প্লেটো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাক্রমকে তিনটি পর্যায়ে (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা) বিভক্ত করে, প্রতি স্তরের লক্ষ্য হিসেবে সৌন্দর্যচেতনা-নীতিবোধের উন্মেষ, চরিত্র গঠন-শৃঙ্খলাজ্ঞান-জীবনঘনিষ্ঠতা, গবেষণা-যুক্তি ও বুদ্ধির অনুশীলন—এসব উপাদানের উপর সবিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি তিন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কথা বলেছেন; প্রাথমিক জ্ঞান বিকাশের প্রতিষ্ঠান, বিষয়ভিত্তিক (সাহিত্য, গণিত, অর্থনীতি, সঙ্গীত প্রভৃতি) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধীমান ছাত্রদেরকে রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে গড়ে তোলবার জন্য বিজ্ঞান, দর্শন, আইন প্রভৃতি বিষয়ের গবেষণা-উপযোগী প্রতিষ্ঠান। তাঁর মতে, উত্তম রাষ্ট্রনায়ককে অবশ্যই উত্তম দার্শনিক হতে হবে।

এরিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রী. পূর্ব) : প্লেটোর যোগ্য ছাত্র এরিস্টটল, যাকে বলা হয় 'সকল জ্ঞানীর গুরু' (The master of all who know), তাঁর মতে শিশুর সুপ্ত শক্তির বিকাশসাধনই শিক্ষার মূল লক্ষ্য। শিশুর শিক্ষাজীবন শুরু হবে পারিবারিক পরিবেশে, ছয় বছর বয়স থেকে তার যাবতীয় শিক্ষার ভার রাষ্ট্র বহন করবে। এ শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক এবং তা খেলা-গান ছবি আঁকা ইত্যাদি আনন্দদায়ক অনুষঙ্গের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবে। শিশুমানসের প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি অনুযায়ী তার শিক্ষাক্রমে বৈচিত্র্য রক্ষা থাকবে এবং তার উদার ও মানবিক চরিত্রগঠনে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। তাঁর মতে, শিক্ষায় যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে সত্যানুসন্ধানে ব্রতী হতে হবে এবং এর জন্য আরোহী প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে হবে।

www.pathagar.com

যোহান এমস কমেনিয়াস (১৫৯২-১৬৭০) : কর্মজীবনে বিশপ হয়েও, শিক্ষানীতি পরিকল্পনায় অসামান্য ভূমিকা রেখেছেন যোহান এমস কমেনিয়াস। তাঁর মতে, একজন শিশু প্রথম ছয় বছর বয়সে খেলা-গান-গল্প-ব্যায়াম-বেড়ানোর মাধ্যমে ধর্ম-নৈতিকতা-সৌন্দর্য চেতনায় ঋদ্ধ হবে। পরের ছয় বছরে সে শিখবে মাতৃভাষা-ইতিহাস—সঙ্গীত-অর্থনীতি-যন্ত্রপাতির ব্যবহার। তৃতীয় পর্যায়ে, অর্থাৎ আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত তাকে রসায়ন-ব্যাকরণ-তর্কবিদ্যা এবং শিল্প, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি প্রভৃতিতে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক নৈপুণ্য অর্জন করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে তার মেধা-দক্ষতা-ঝোঁক অনুযায়ী উচ্চতর শিক্ষায় প্রবেশ করতে হবে। তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত, শিক্ষার মূল লক্ষ্য তিনটি : বিশ্বাস ও ধর্মচেতনার সঞ্চার, ন্যায়পরায়ণতায় উদ্বুদ্ধকরণ, ভাষাব্যবহার ও শিল্পচেতনায় সমৃদ্ধতা দান। সরল থেকে জটিল, জানা থেকে অজানায় প্রবেশ—শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য বলে বিশ্বাস করতেন কমেনিয়াস।

জ্যাঁ জ্যাকস রুশো (১৭১২-১৭৭৮) : শিক্ষানীতি বিষয়ে বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন জ্যাঁ জ্যাকস রুশো। তাঁর শিক্ষানীতির লক্ষ্য ছিল পরিপূর্ণ মানুষ গড়ে তোলা। রুশোর কণ্ঠে প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল নতুন তত্ত্ব, শিক্ষার কেন্দ্রে থাকবে কেবল শিশু, তার প্রকৃতি-প্রবণতা-যোগ্যতা-চাহিদা ঘিরে সকল শিক্ষাক্রম পরিচালিত হবে। এখানে কোনো প্রকার গোঁড়ামি-সংকীর্ণতা-নিয়মের কাঠিন্য-বিষয়সূচির অতিরিক্ত চাপ রাখা যাবে না। জীবনমুখী ও বাস্তবধর্মী শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর আচার-আচরণ, বৃত্তি-প্রবৃত্তি, অনুরাগ-অনুসন্ধিৎসা, সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতির সুষম বিকাশ ঘটাতে হবে এবং তাকে নিজের মতো করে বেড়ে ওঠার সুযোগ দান করতে হবে।

রুশোই সর্বপ্রথম প্রকৃতিনির্ভর শিক্ষাদর্শের কথা বলেছেন। তাঁর প্রকৃতিবাদী শিক্ষার পর্যায়সমূহ বিন্যস্ত হয়েছে এভাবে :

ক. ১ থেকে ৫ বছর পর্যন্ত শিশুর মূল শিক্ষক হবেন তার পিতামাতা। এ সময় তারা শিশুকে সততা, সক্রিয়তা ও ইন্দ্রিয়াদি অনুশীলনের শিক্ষা দেবেন।

খ. ৫ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুকে পুস্তকবিহীন স্বভাবসুলভ শিক্ষায় পারদর্শী করে তুলতে হবে।

গ. ১২ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত শিক্ষালাভের উর্বর ও গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময়ে আত্মশক্তির প্রকাশ ও ব্যক্তিত্ব গঠনের শিক্ষা দিতে হবে। স্বকীয়তা ও স্বনির্ভরতার মূলমন্ত্র রপ্ত করতে হবে।

ঘ. ১৫ থেকে ২০ বয়স পর্যন্ত অধীত ও অর্জিত বিদ্যাকে চিন্তা ও কর্মে

www.pathagar.com

সফল রূপদান করতে হবে। যুক্তি-বুদ্ধি-বিচার প্রভৃতির মধ্য দিয়ে জীবনের পরবর্তী পথ পাড়ি দিতে হবে।

ফোডারিক ফ্রোয়েবল (১৭৮২-১৮৫২) : জার্মান দার্শনিক ফোডারিক ফ্রোয়েবল, সমকালীন প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করে যথেষ্ট খ্যাতিমান হয়েছেন। তাঁর মতে, ব্যক্তি মানুষের বিবর্তনের ধারায় যে পরিবর্তন লক্ষ করা যায় এবং জীবনের বিকাশ ও প্রকাশে যে ক্রমোন্নতি ঘটে, তা-ই হলো শিক্ষা। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যেহেতু শিশুমাত্রই খেলাধুলাপ্রিয়, তাই খেলা বা আনন্দচ্ছলে তার শিক্ষাজীবন শুরু করতে হবে। খেলার মাধ্যমেই সে তার সুকুমার চিত্তের নানা ভাব-ভাবনা, কর্মপ্রয়াস-আত্মবিকাশ ইত্যাদি প্রকৃতিকে বাইরের জগতের সাথে সম্পৃক্ত করে নিজের গভীরে শক্তি ও প্রত্যয়কে দৃঢ়রূপ দিতে পারে। তিনি তাঁর শিক্ষা ভাবনাকে প্রায়োগিক রূপ দিতে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন বহুল আলোচিত প্রতিষ্ঠান 'কিন্ডার গার্টেন'। ফুল বাগানের মালি যেমন চারাগাছের বিকাশের পথে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না, তেমনি শিশু তার বিকাশের ধারায় নিজের মতো করে এগিয়ে যাবে, বিশ্বপ্রকৃতি ও পরম সত্তার স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবে।

ফ্রোয়েবল বিশ্বাস করতেন, বিদ্যালয় সমাজবিচ্ছিন্ন প্রপঞ্চ নয়, এটা সমাজেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র। সমাজের উন্নতিবিধানে ব্যক্তির অন্তরের উপলব্ধিকে জাগ্রত করতে হবে।

জন ডিউই (১৮৫৯-১৯৫২) : আধুনিক ও প্রগতিশীল শিক্ষার সার্থক রূপকার জন ডিউই। তাঁর মতে, শিক্ষা জীবনযাত্রার একটি প্রণালী বিশেষ; অবিরাম অভিজ্ঞতা অর্জন এবং এর আলোকে জীবন-পরিচালনা করা যেমন বুদ্ধিমানের কাজ, তেমনি জীবনভিজ্ঞতার প্রয়োগ ও অভিযোজনের মধ্য দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া উচিত। জন্মের পর থেকে প্রতিটি মুহূর্ত বা ঘটনা শিশুকে নিয়ত শিক্ষা দিয়ে যায় এবং সমাজ ও বিদ্যালয়, শিশু ও পাঠক্রম, সমাজাদর্শ ও জীবনাদর্শ—এসবের যা লক্ষ্য, শিক্ষার লক্ষ্যও তা-ই। জ্ঞানলাভ ও জ্ঞানের প্রয়োগ, দুটি যখন সুষ্ঠু ও সমন্বিত রূপ পায়, কেবল তখনই শিক্ষার সাফল্য প্রতিভাত হয়। তাঁর মতে, শিক্ষার্জনে শিক্ষার্থীর আগ্রহ হবে স্বতঃস্ফূর্ত এবং তার বৃত্তি-প্রবৃত্তি, চাওয়া বা চাহিদা অনুযায়ী কর্মমুখী, জীবনানুগ শিক্ষার বিস্তার ঘটানো উচিত।

আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেড (১৮৬১-১৯৪৭) : বিশ্বখ্যাত শিক্ষাবিদ আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেড সম্পূর্ণ ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন, 'জ্ঞান অর্জন এবং অর্জিত জ্ঞানের সুষ্ঠু ব্যবহারের মধ্যে যে আর্ট বা

www.pathagar.com

নিপুণতা নিহিত থাকে, তা-ই হচ্ছে শিক্ষা।' তাঁর মতে, মানুষের জীবন নানামুখী পর্যায়ের মধ্য দিয়ে প্রবহমান। পরিশ্রমের পর খেলা বা বিশ্রাম, ক্লান্তির পর রাতের সুখনিদ্রা প্রভৃতি যেমন নিত্যদিনের অপরিহার্য অঙ্গ, তেমনি শিক্ষায় থাকবে পঠন, পর্যালোচনা, পরীক্ষার অবকাশ, নতুন পাঠারম্ভের প্রস্তুতি ও গতি। তিনি বুদ্ধিবিকাশের পর্যায়কে তিনটি স্তরে (রোমান্স, যথার্থতা, সাধারণী) বিভক্ত করেছেন এবং এই ত্রিধারার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সত্য ও উপলব্ধিজাত যুক্তিভিত্তিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারিগরি বিদ্যা, বিজ্ঞান চর্চা, শিল্পকলা ও ধর্মশিক্ষা—এ চারটি বিষয়কে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করবার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেছেন, সামাজিক মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচায়করূপে উক্ত চারটি মূল বিষয়ের সাথে সবার সম্পৃক্তি থাকা আবশ্যক। তিনি কারিগরি ও বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রকে আরো প্রসারিত করে জনগণকে জনশক্তিতে পরিণত করবার ব্যাপারে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি-লেখক, সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে বিশ্ববিশ্রুত, আবার বাঙালির শিক্ষাপদ্ধতির দিক-নির্দেশনা দানে তিনি যেমন অবিসংবাদিত শিক্ষাবিদ, তেমনি অতুলনীয় শিক্ষাসম্প্রসারকও। বাঙালির শিক্ষানীতি বিষয়ে তিনি আমৃত্যু চিন্তা করেছেন, এ সম্পর্কে ধীমান বিশেষজ্ঞের মতামত দিয়েছেন এবং নিজের ভাবনার আলোকে প্রতিষ্ঠা করেছেন বিশেষ বিদ্যাপীঠ, যা এখন বিশ্ব মিলনকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। শিশু ও বয়স্কশিক্ষা, কলা বা বিজ্ঞানশিক্ষা, কারিগরি বা কারবারি শিক্ষা—সব দিকেই সনিষ্ঠ আলোকপাত করেছেন রবীন্দ্রনাথ এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাধারার মধ্য থেকে কোন বিষয়টি আমাদের জন্য গ্রহণযোগ্য, কোনটি বর্জনীয়—সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রেখেছেন। শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায় সম্পর্কে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অভিমত, 'শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুকে চিন্তার স্বাধীনতা, ভাবের স্বাধীনতা এবং ইচ্ছার স্বাধীনতা দিতে হইবে।' শিশুশিক্ষায় নীতি-উপদেশের আধিক্য ছেঁটে দিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'জীবনের প্রারম্ভেই মনকে, চরিত্রকে গড়িয়া তুলিবার সময় উপদেশ নহে, অনুকূল অবস্থা এবং অনুকূল নিয়মই সকলের চেয়ে বেশি আবশ্যক।' এবং 'শিশুর মন যতটুকু শিক্ষার উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে, অল্প হইলেও সেইটুকু শিক্ষাই শিক্ষা, আর যাহা শিক্ষা নাম ধরিয়া মনকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়, তাহাকে পড়ানো বলিতে পার, কিন্তু তাহা শেখানো নহে।' প্রচলিত মুখস্থধর্মী শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট অভিমত, 'আমাদের নীরস শিক্ষায় জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ অতীত হইয়া যায়। আমরা বাল্য হইতে কৈশোর এবং কৈশোর হইতে যৌবনে প্রবেশ করি

www.pathagar.com

কেবল কতকগুলো কথার বোঝা টানিয়া। সরস্বতীর সাম্রাজ্যে কেবলমাত্র মজুরি করিয়া মরি, পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায় এবং মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয় না।'

'আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি, পরে ইংরেজি শেখার পত্তন' শিক্ষার বাহন হিসেবে মাতৃভাষার গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে তিনি আরো বলেছেন, 'রাজা কত আসিতেছে, কত যাইতেছে, পাঠান গেল, মোগল গেল, ইংরেজ আসিল, আবার কালক্রমে ইংরেজও যাইবে, কিন্তু ভাষা সেই বাংলাই চলিয়া আসিতেছে এবং বাংলাই চলিবে, যাহা কিছু থাকিবে বাংলায় থাকিবে, তাই যথার্থ থাকিবে এবং চিরকাল থাকিবে।'

শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত, 'তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তি দান করে।' এবং জাতি নির্মাণে শিক্ষার অশেষ গুরুত্ব অনুধাবন করে মন্তব্য করেন, 'দেশের লোককে শিশুকাল হইতে মানুষ করিবার সদুপায় যদি নিজে উদ্ভাবন এবং তাহার উদ্যোগ যদি নিজে না করি, তবে আমরা সর্বপ্রকারে বিনাশপ্রাপ্ত হইব—অন্নে মরিব, স্বাস্থ্যে মরিব, চরিত্রে মরিব—ইহা নিশ্চয়। বস্তুত আমরা প্রত্যহই মরিতেছি অথচ তাহা প্রতিকারের উপযুক্ত চেষ্টা করিতেছি না, তাহার চিন্তামাত্র যথার্থরূপে আমাদের মনেও উদয় হইতেছে না, এই নিবিড় মোহাবৃত নিরুদ্যম ও চরিত্রবিকার—বাল্যকাল হইতে প্রকৃত শিক্ষা ব্যতীত কোনো অনুষ্ঠান—প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ইহা নিবারণের উপায় নাই' [শিক্ষাসংস্কার, ১৩১৩]। রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শনের বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায় তাঁরই গড়া 'বিশ্বভারতী' নামক অসাধারণ বিদ্যাপীঠের পঠন-পাঠন ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে।

বিখ্যাত লেখক লিও টলস্টয় শিক্ষা সংস্কার বিষয়ে বলেছিলেন, 'যা সঠিক তা করা উচিত নিঃশব্দে এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে, সরকারের সম্মতি না নিয়ে তো বটেই, একেবারে সরকারের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে।' রবীন্দ্রনাথ নিজেও রাষ্ট্র এবং সমাজকে সমার্থক মনে করেননি; রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল বেশি। 'গ্রামে গ্রামে সামাজিক স্বরাজ' গড়ার বাসনায় কবি শিক্ষার এক 'ভাগীরথী ধারা' চেয়েছেন, যে শিক্ষার লক্ষ্য হবে, 'মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ উন্মোচন, ব্যক্তির সকল শুভ সম্ভাবনার স্ফুরণ, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের যোগ, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যোগ, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের বৈষম্য বিমোচন, আত্মিক ও ব্যবহারিকের মধ্যে সমন্বয়, জ্ঞান বোধ কল্পনা ও সৌন্দর্য-চেতনার কর্ষণ ও বিকাশ, কর্মে জ্ঞানের নিয়োগের দ্বারা জীবনে সম্পন্নতা ও সমৃদ্ধি অর্জন, সৃজনশীলতার সাহায্যে মনুষ্যত্বের পরিচর্যা ও

www.pathagar.com

বিকাশ।' এবং এর সর্বাঙ্গে 'দানে এবং গ্রহণে থাকবে আনন্দ।' [রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা : খান সারওয়ার মুরশিদ, শিক্ষাবার্তা : এ এন রাশেদা সম্পাদিত, পৃ-৪৩২]।

কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭–১৯৮১) : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের শীর্ষব্যক্তিত্ব কাজী মোতাহার হোসেনের শিক্ষাভাবনা যেমন সংস্কারমুক্ত, তেমনি কালঘনিষ্ঠ। তাঁর মতে, 'কোন জাতি কতটা সভ্য, তা নির্ণয় করার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মাপকাঠি হচ্ছে তার শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠ্যপুস্তক ও সাধারণ সাহিত্য।' তাঁর সুচিন্তিত অভিমত, 'মায়ের পেট থেকে পড়েই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়। কিন্তু এরও আগে পিতামাতার মনোবৃত্তি, পারস্পরিক সম্পর্ক, ... ইত্যাদির প্রভাব কিছুটা উত্তরাধিকার-সূত্রে শিশুর উপর বর্তে। এই কারণে বয়স্কদের শিক্ষার প্রয়োজন আছে।' বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কাজী মোতাহার হোসেনের অসন্তুষ্টি 'আমরা বিদেশীর সঙ্গে অবশ্যই সম্পর্ক রাখব, তাই বলে নিজের দেশে নিজেরাই বিদেশী বনে যেতে রাজি নই। যে শিক্ষা আমাদের দেশের লোককে ঘৃণা করতে বা তাদেরকে শোষণ করার প্রবৃত্তি জোগায়, সে দুষ্ট শিক্ষা থেকে আমাদের শতহস্ত দূরে থাকা দরকার।'

শিক্ষানীতি, ছাত্র অসন্তোষ ও কুমসের রিপোর্ট

শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞানী গুণীদের মতামত যা-ই থাকুক, দুনিয়ার কোনো রাষ্ট্রই তাঁদের মত সর্বাংশে আমলে নিয়ে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে না। রাষ্ট্র তার শ্রেণিচরিত্র অনুযায়ী শিক্ষানীতি সাজায়। কখনোবা নির্দিষ্ট শাসকের সময়কালীন তাঁরই মর্জিমতো প্রণীত হয় ওই দেশের শিক্ষানীতি। এ বিষয়ে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মধুসূদন চক্রবর্তীর অভিমত, 'শিক্ষাব্যবস্থা যেহেতু সমাজের উপরি-কাঠামোগুলোর অন্যতম, তাই কোনো একটি সমাজের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা ও বাস্তবতা তার শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। আবার বিপরীতক্রমে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার নিজস্ব গতি প্রকৃতি ও বিকাশের বাস্তবতা অনেক সময় সমাজের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চরিত্র ও বাস্তবতাকে প্রভাবিত করে।' [প্রসঙ্গ : শিক্ষা, মার্কসবাদী দৃষ্টিতে, পৃ-৩১৪]। তাই দেখা যায়, সব শিক্ষানীতির কিছু অংশ পণ্ডিতকুলের মত থেকে চয়িত, কিছু অংশ সংশ্লিষ্ট দেশ বা জাতির সংস্কৃতি-ঐতিহ্য-ধর্মীয় বোধ থেকে জাত, আর বেশির ভাগই ওই দেশের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে দেশ কাল পাত্রভেদে শিক্ষার লক্ষ্য প্রায় অভিন্ন হলেও, এর বাস্তব প্রতিফলনে অনেক ভিন্নতা দেখা যায়। অর্থাৎ সব দেশ অভিন্ন লক্ষ্যের

www.pathagar.com

কথা বলে লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করে থাকে। ওই পথ সবসময় আলোকিত, সরল, কল্যাণকামী হয় না। কোনো পথে থাকে বস্তুনিষ্ঠতা, সর্বসাধারণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, কোনো পথে থাকে সূক্ষ্ম দুরভিসন্ধি, জাতি-গোষ্ঠী বা ভাষা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র। শিক্ষার ওই বহুপথ একেক দেশকে নিয়ে যায় ভিন্ন ভিন্ন আবহে, কখনো পূর্ণিমাতে, কখনোবা অমাবস্যায়।

বিশ্বের বহু দেশ, যেখানে হরহামেশাই গণবিচ্ছিন্ন স্বৈরশাসকের আবির্ভাব ঘটে থাকে, তাদের অনেকেই নিজের আসন পাকাপোক্ত করবার জন্য সুভাষিত কথামালায় 'মরীচিকাময়' শিক্ষানীতি গ্রহণ করেন। নিজের ক্ষমতা কুক্ষীগত করে রাখবার জন্য অনেক স্বৈরশাসক 'হীরক রাজা'র মতো শিক্ষানীতি গ্রহণ করতেও দ্বিধাবোধ করেন না। অনেক দেশের শিক্ষানীতিতে লিঙ্গবৈষম্য প্রকট। কোনো দেশে শ্বেত-কৃষ্ণের পার্থক্য ব্যাপক। কেউ বা নারীশিক্ষাকে হারাম বলে মানে। এসব পশ্চাৎমুখী জাতি-রাষ্ট্রের কথা না হয় বাদই রইল। যেসব রাষ্ট্রকে আমরা 'কল্যাণকামী' বলে জানি ও মানি, এর কোনো কোনোটির শিক্ষানীতি নিয়ে কম শোরগোল হয়নি। ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেনের মতো উন্নত দেশকেও স্ব স্ব শিক্ষানীতি নিয়ে তীব্র গণঅসন্তোষের মুখে পড়তে হয়েছে। ওই নীতি নিয়ে দেশে দেশে অনেক রক্ত ঝরেছে।

১৯৬৮ সালের মে মাসে গোটা ফ্রান্স কেঁপে উঠেছিল প্রচণ্ড ছাত্র-বিক্ষোভে। বিভিন্ন পর্যায়ের দুর্বল পাঠ্যক্রম, পাঠ্য বিষয়বস্তুর নিষ্প্রাণতা, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে সাধারণ ছাত্ররা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। দেশের প্রগতিশীল সকল নাগরিক, বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন, পেশাজীবী সম্প্রদায় সে আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিল। শুরুতে শাসকশ্রেণী ব্যাপক দমন-পীড়নের আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু তাতে আন্দোলন থামানো গেল না। দিন দিন তা বেড়েই চলল, ছড়াতে থাকল শহর থেকে শহরান্তরে। রাষ্ট্র অবশেষে বাধ্য হলো ছাত্রদাবি মেনে নিতে। সেই আন্দোলনের প্রবল প্রভাব পড়েছিল অন্তত পঞ্চাশটি দেশে। সেখানকার ছাত্ররাও নিজেদের শিক্ষাব্যবস্থার অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে রাস্তায় নেমে এসেছিল।

একই সময়ে 'মিলেটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশন'-এর সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক ছেদের দাবিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে হার্ভার্ডসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইংল্যান্ডে এ আন্দোলন উত্তাল রূপ পায় ৪ মে, ১৯৭০, যখন কেন্ট শহরে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায় ৪

www.pathagar.com

জন ছাত্র। তখন ৯০০ জুনিয়র কলেজসহ পঁচিশ হাজার উচ্চ শিক্ষালয়ের লক্ষ লক্ষ ছাত্র ওই আন্দোলনের সাথে সংহতি প্রকাশ করে। সে সময় ছাত্র আন্দোলন এমন উন্মাতাল রূপ ধারণ করেছিল যে, ইংল্যান্ডের পত্রিকাগুলোর প্রায় প্রতিদিনের সংবাদ শিরোনাম হতো ছাত্র বিক্ষোভ বা সমাবেশ। এ প্রসঙ্গে একই দশকে (১৯৬২-১৯৬৪) তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) আইয়ুব-বিরোধী ছাত্র-আন্দোলনের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে।

ওই সময়ে, ইউনেস্কো কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে ফিলিপ এইচ কুমস প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার অসঙ্গতি সম্পর্কে যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন, এর গুরুত্ব বর্তমান কালেও ফুরিয়ে যায়নি : 'সব দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে যে সরলীকৃত কর্মপদ্ধতি, তাদের দেশে বর্তমানে প্রচলিত বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক আনুভূমিক সম্প্রসারণ—যা তারা অনুসরণ করছে, এখনই সে সম্বন্ধে নতুন করে চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন। অবশ্য সীমাবদ্ধ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, তাদের এই কৌশলের সাফল্য খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। কিন্তু যত দ্রুত সম্ভব শিক্ষার সমস্ত স্তরে ছাত্র ভর্তি ও পরিমাণ বাড়িয়ে এই কৌশল ভয়ঙ্কর পরিণতি ডেকে এনেছে। বিশেষত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সেখানে, যেখানে শিক্ষা ব্যবস্থাপকগণ তাদের দেশের পরিবর্তিত নতুন পরিস্থিতিতেও সেই পুরনো ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাকে ক্রমাগত বাড়িয়ে যাওয়ার কাজে নিজেদের ব্যস্ত রেখেছেন। যখন শিক্ষার দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্র দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, তখন সহজ সরলভাবে 'একই জিনিসের আরো সংখ্যাবৃদ্ধি' কখনোই সমাধানসূত্র হতে পারে না। বরং যা দরকার, তা হলো আরো বেশি সংখ্যার এবং আরও বৈচিত্র্যময় শিক্ষার্থী গোষ্ঠীর চাহিদার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে নবতর কর্মপ্রচেষ্টা গ্রহণ করা। ইতোমধ্যে শিক্ষার গুণগত মানের বিকাশ, যা কি-না অভ্যন্তরীণ কার্যকারিতা এবং বাহ্যিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে, তা থেকে কর্মোদ্যোগ সরিয়ে নিয়ে কেবল আনুভূমিক পরিমাণ বৃদ্ধি ও যান্ত্রিক কৌশলের প্রতি অগ্রাধিকারের মানসিক আবিষ্টতা শিক্ষার গুণগত মান ও সামাজিক তাৎপর্যকে কার্যত নির্মূল করে দিয়েছে।'

রিপোর্টের উপসংহারে এসে 'প্রথাবিমুক্ত শিক্ষা'র (নন-ফরমাল এডুকেশন) প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে কুমস বলেছেন, প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থায় উন্নয়নশীল দেশগুলো দুদিক থেকে বিপদগ্রস্ত হয়েছে। যে শিক্ষাব্যবস্থা তারা চালু রেখেছে, তা অন্য কোনো উন্নত দেশ থেকে আমদানিকৃত এবং যা

www.pathagar.com

ভিন্নতর উদ্দেশ্য ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে রূপায়িত। ফলে ভিন্ন আদলের ভিন্ন শিক্ষারীতি, অনেক উন্নয়নশীল দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে এক সরলরেখায় চলতে পারছে না। বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে কুমসের এই বক্তব্য প্রায় শতভাগ প্রযোজ্য।

কুমসের সেই বিখ্যাত রিপোর্ট এবং তৎকালের আরো ক'জন শিক্ষাচিন্তক, যেমন আইভান ইলিচ, এভারেস্ট রেইমার, পল গুডম্যান, জন হল্ট, নিল পোস্টম্যান প্রমুখ বিদ্যালয়ভিত্তিক প্রথাবদ্ধ শিক্ষার ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরে দেখিয়েছেন যে, ওই শিক্ষার পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি, পঠন-পাঠন ও মূল্যায়ন পদ্ধতি—সবকিছুই সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। এ প্রক্রিয়ায় গরিব মেহনতি দলিত সমাজের মানুষ নিয়ত বঞ্চনার শিকার হয়ে থাকে। তাছাড়া উন্নয়নশীল বিশ্বে যে শিক্ষারীতি চালু আছে, এর অধিকাংশের বীজ ইউরোপ আমেরিকার মাটিতে রোপিত। ফলে পশ্চাৎদেশীয় মাটি মানুষ ও পরিবেশের সঙ্গে তা বেমানান এবং প্রত্যাশিত ফল বয়ে আনতে অক্ষম। ওই বিদগ্ধ পণ্ডিতকুলের সুচিন্তিত অভিজ্ঞান, পাশ্চাত্যজাত শিক্ষার ক্রমাগত বিস্তার উন্নয়নশীল দেশের পুরো শিক্ষা-পরিবেশকে ব্যাপকভাবে দূষিত করে ফেলছে।

www.pathagar.com

শিক্ষার সাধারণ স্তর

বর্তমান বিশ্বের সব দেশে জীবনব্যাপী শিক্ষার তিনটি স্তর কম-বেশি পরিদৃশ্যমান।

এক. প্রথাবিহীন শিক্ষা

জন্মের পর থেকে সমাজ বা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত প্রথাগত বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরুর পূর্ব পর্যন্ত শিশুর নিজের বাড়ি বা আশেপাশের পরিবেশ থেকে প্রধানত দেখা শোনা বলা বা কাজের মাধ্যমে যে শিক্ষা আহরিত হয়, তা-ই প্রথাবিহীন শিক্ষা। এ স্তরে কোনো নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি বা কার্যকারণ-ফল সম্পর্কিত যুক্তিপরম্পরার স্থান নেই।

দুই. প্রথাবদ্ধ শিক্ষা

যে কোনো সভ্য সমাজ বা রাষ্ট্র কতকগুলো সুনির্দিষ্ট দর্শন, লক্ষ্য বা আদর্শ সামনে রেখে তার নিজস্ব চেতনার নিরিখে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচিভিত্তিক একধরনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলে। এ ধরনের শিক্ষা কতিপয় সুনির্দিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ, যা দেশ কাল পাত্র ভেদে প্রায় অভিন্ন। পড়া লেখা পরীক্ষা মূল্যায়ন ইত্যাদি প্রচলিত ধারায় অগ্রসরমান বলে এটিকে প্রথাবদ্ধ শিক্ষা নামে অভিহিত করা হয়েছে। শত ত্রুটিবিচ্যুতি, সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ ধারা ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে বর্তমান বিশ্ব-শিক্ষাব্যবস্থা।

তিন. প্রথাবিমুক্ত শিক্ষা

প্রথাবদ্ধ বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আয়ুষ্কাল সীমাবদ্ধ; এ শিক্ষা শেষ হওয়ার পর প্রথাবিমুক্ত শিক্ষার শুরু এবং আমৃত্যু বহমান। প্রথাবিমুক্ত শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কোনো পাঠ্যক্রম বা পাঠ্যসূচি নেই; নেই কোনো প্রতিষ্ঠান। অধীত বিদ্যা বা অভিজ্ঞতার আলোকে প্রকৃতি, সমাজ বা বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ থেকে মানুষ

www.pathagar.com

প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু শেখে। এই শিক্ষা তাকে জীবনসংগ্রামে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে, তার ভেতরের বোধকে পরিশীলিত করে।

প্রথাবিহীন শিক্ষার স্তরে কোনো শিশু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কোনোরূপ বিচার বিশ্লেষণ ছাড়াই গ্রহণ করে থাকে। প্রথাবদ্ধ স্তরে অর্জিত বিদ্যার চন্দ্রালোকে সবকিছু যাচাই-বাছাই করা হয়। আর প্রথাবিমুক্ত স্তরে মানুষ সবকিছু গ্রহণ করে চিন্তন-মনন বা বুদ্ধির দ্বারা পরীক্ষা করে। বয়স্ক সাক্ষরতা, টিভি, রেডিও প্রদত্ত শিক্ষা—প্রথাবিমুক্ত শিক্ষারই অংশ।

www.pathagar.com

আমাদের বিভাজনধর্মী শিক্ষাব্যবস্থা বনাম জাতিসঙ্ঘ-গৃহীত শিক্ষানীতি

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণিবৈষম্যের শোচনীয় চিত্রটি প্রকটিত হয়ে আছে শিশুশিক্ষার ধরন-ধারণের মধ্যে। শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য শ্রেণিবৈষম্য নাশ করা, মানুষে মানুষে বিভেদ ঘোচানো। কিন্তু আমাদের বঙ্গীয় শিক্ষা এক্ষেত্রে উল্টো পথের পথিক। বিদ্যালয়গামী হওয়ার আগে যে শিশুরা অভেদাত্মা, প্রায় সম মানসিকতাসম্পন্ন, শিক্ষালয়ে পা ফেলার পর তারা বহুবর্ণে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আচার-ব্যবহার, চলন-বলন, স্বপ্ন-চেতনায় তারা ভিন্ন পথে, ভিন্নভাবে এগিয়ে যায়। ব্রাহ্মণ্যবাদ আর বল্লাল সেন এখন নেই। তাতে কী, ওদের প্রেতাত্মারা আছর করে আছে আমাদের শিশুশিক্ষাকে ঘিরে। এর বদৌলতে শিশুরা, জীবনের উষালগ্নে বিশ্বাস করতে শুরু করে, 'আমি আর সে একই ধারার, একই রকম পথিক নই, পাশাপাশি থেকেও আমরা আলাদা, ভিন্ন জগতের ভিন্নধর্মী স্বপ্নবাহক।' শিক্ষার এই শ্রেণিবিভাজন বা বৈষম্যনীতি নিচ থেকে উপর—সর্বব্যাপী শোচনীয়ভাবে বিদ্যমান। 'একদিকে আলিশান ইমারতে চোখ-ধাঁধানো জাঁকালো সব উপকরণের মধ্যে অর্থবান, ভাগ্যবান মানুষদের সন্তানদের অভিজাত শিক্ষা প্রদানের সাড়ম্বর আয়োজন, অন্যদিকে জীর্ণ-শীর্ণ দীন কুটিরে একান্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষা-উপকরণের অভাবকেই সঙ্গী করে নিয়ে অর্থ-সম্পদ বঞ্চিত ভাগ্যহীনদের ছেলেপুলেদের অতি সাধারণ শিক্ষা লাভের করুণ প্রয়াস। শিক্ষায় আশরাফ-আতরাফ বিভেদ আজ বড় বিশ্রী হয়ে উঠেছে।... বিত্তবান ও উচ্চবিত্তরাই যাবে অভিজাত শিক্ষা-বিপণিতে,—অর্থাৎ কিনে আনবে কিন্ডার গার্টেনের, এ-লেভেল ও-লেভেলের, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির শিক্ষা। আর বিত্তহীন ও নিম্নবিত্তেরা কোনোমতে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার ভোগ্য বস্তুর জন্য যেমন নির্ভর করে বস্তির ধারে কিংবা ফুটপাতে বসা সস্তা পণ্যের বাজারটির উপর, তেমনি শিক্ষার জন্যও তাদের শরণ নিতে হয় বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের বিদ্যালয়ের বা মক্তব মাদ্রাসার' (বিনষ্ট রাজনীতি ও সংস্কৃতি : যতীন সরকার, পৃ-৩৩, ৩৪)।

www.pathagar.com

জাতিসঙ্ঘ কর্তৃক গৃহীত মানবাধিকার সনদের ২৬ নম্বর ধারায় জোর দিয়ে বলা হয়েছে, 'Elementary education shall be compulsory and unitary.' ১৯৮৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লিতে, জাতিসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে Appeal (Asia-Pacific Programme of Education for All) নামক শিক্ষাবিষয়ক একটি কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয় এবং সবার জন্য একমুখী শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষার বৈষম্য ঘুচানোর আহ্বান জানিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, 'Primary schooling can take the form of different modes delivery (formal schools, traditional centres of learning, community centres etc) but should be unitary in its outcome of standards and potentials for further education.'

'শিক্ষায় সকলের সমান অধিকার' জাতিসঙ্ঘের এই ঘোষণাকে সামনে রেখে 'ইউনেস্কো'র উদ্যোগে এক বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় থাইল্যান্ডে, ৫-৯ মার্চ, ১৯৯০। সেখানে 'সারা বিশ্বের সকল বয়সের নারী-পুরুষের জন্য শিক্ষা হলো মৌলিক অধিকার' এই প্রত্যয় সামনে রেখে সকল বয়সের, সবার জন্য বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, An active commitment must be made to removing educational disparity. Udeserved groups : the poor, street and working children, rural and remote populations, nomads and migrant workers, indenigious people, ehnic, racial and linguistic minority, religious, those displaced by war; and people under occupation, should not suffer any discrimination in access to learning opportunity.

শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণিবৈষম্য বা জাতিগত বৈষম্য কমবেশি সব দেশেই ছিল এবং আছে। শিক্ষা-সংস্কৃতিতে অসাধারণ প্রাগ্রসর থাকা সত্ত্বে প্রাচীন গ্রিসে দাসদের শিক্ষার অধিকার ছিল না। কিংবা বর্তমানে, সম অধিকারের ঝাণ্ডাবাহী হিসেবে স্বঘোষিত দাবিদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাক্ষেত্রেও ব্যাপক বৈষম্য বিদ্যমান। সে দেশের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, in America educational opportunity is linked closely to class status. ....To admit this goes directly against the basic instinct of a majority of Americans, the fact is so well-documented as to be beyond argument. It has long been a common place of

www.pathagar.com

educational sociology that the American public school is thoroughly middle-class in its orientation and that is discriminates systematically against lower-class children, usually unconsciously and therefore unusually effectively. The plight of the black child in the slum school is the most dramatic example of this in our time, but it is only one example. (G. Max Bingo, Philosophies of Education, 1st Indian reprint, New Delhi, 1985, pp 287-88)

কোনো কোনো পণ্ডিত বা গবেষক শিক্ষায়তন বা শিক্ষাপ্রদান প্রক্রিয়ার মধ্যেই কেবল বৈষম্য দেখেননি। তাঁদের মতে শিক্ষা নামক বিষয়টিই শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টি করবার বড় একটা হাতিয়ার। বার্ট্রান্ড রাসেল, জগৎখ্যাত মহামানব, শিক্ষা সম্পর্কে শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, "But inspite of these exceptions, education in the modern world tends to be a reactionary force, supporting the Government when it is conservative and opposing it when it is progressive." (The Individual versus the citizen, page 12). অক্টোবর বিপ্লবের পর, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম জনশিক্ষা কর্মকর্তা ভার্সিলিয়েভ লুনাচারস্কি মন্তব্য করেছিলেন, 'The school has always been and cannot help but be a class weapon.' এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যও প্রণিধানযোগ্য, 'ইস্কুলে যারা পড়া মুখস্থ করেছে, আর ইস্কুলের বাইরে পড়ে থেকে যারা পড়া মুখস্থ করেনি, তাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ ঘটে গেছে—শিক্ষিত ও অশিক্ষিত' (রাশিয়ার চিঠি, রবীন্দ্র রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড, পৃ-৩৮৫)।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা

প্রাথমিক শিক্ষা

বৃক্ষের সমস্ত ভর যেমন মূলে, প্রাথমিক শিক্ষাও তেমনি, পরবর্তী সকল শিক্ষার মূল বা ভিত। আমাদের দেশের অধিকাংশ পিতামাতা অজ্ঞ, সন্তানের মানসিক পরিচর্যাকরণে বোধহীন, অসমর্থ। ফলে ওই সব শিশু পারিবারিক বলয় থেকে প্রাপ্তিশূন্য হয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। এ শিক্ষা তার পেশাগত জীবনে তেমন ভূমিকা পালন করে না, তবে তার চরিত্র-ব্যক্তিত্ব-মানসগঠনসহ পরবর্তী প্রত্যয়গুলোর ভিত তৈরি করে দেয়। সততা-নিয়মনিষ্ঠা-কর্মানুরাগ-আত্মিক বিকাশ, যে উপাদানগুলো জীবনের প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত, সেসবের অঙ্কুরোদগম ও বীজরোপণ হয় প্রাথমিক শিক্ষার জমি থেকেই। দুঃখজনক বিষয় হলো, আমাদের এ জমি যথেষ্ট উর্বর নয়, চাষকারীও প্রত্যাশিত দক্ষ নয়, কৃত্রিম সার দিয়ে জমির উর্বরতা বাড়াবার প্রচলিত সুযোগ এখানে নেই। প্রকৃতির হরেক রকম বিরূপতা সয়ে ওই জমি থেকে যেটুকু ফসল উৎপাদিত হয়, তা গুণে-মানে-পরিমাণে, কোনো দিক থেকেই সন্তোষজনক হয় না।

আগেই বলেছি, শিক্ষা দূরকে কাছে টানে, পরকে আপন করে। এর মধ্যে আছে মিলন এবং ঐক্যের সুর। বিভেদ বিনাশের ডাক। অথচ আমাদের বিদ্যালয়ী শিক্ষার প্রথম পদক্ষেপে, একদল শিশুকে অগণিত উপদলে বিভক্ত করে দেয়ার অবিবেচক প্রবণতা বিদ্যমান। খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ ড. মইনুল ইসলাম অভিমত ব্যক্ত করেছেন, 'প্রাথমিক স্তরে দেশে ১১ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে : সরকারি প্রাইমারি স্কুল, রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাইমারি স্কুল, নন-রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাইমারি স্কুল, এক্সপেরিমেন্টাল প্রাইমারি স্কুল, প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের সঙ্গে সংযুক্ত প্রাইমারি স্কুল, কমিউনিটি স্কুল, এনজিও পরিচালিত স্কুল, কিন্ডার গার্টেন, এবতেদায়ি মাদ্রাসা, স্যাটেলাইট স্কুল ও হাইস্কুলের সঙ্গে সংযুক্ত প্রাইমারি স্কুল।'

মইনুলের সুচিন্তিত অভিজ্ঞান, 'এই ১১ ধরনের স্কুল গড়ে ওঠার ব্যাপারটি বলে দিচ্ছে যে, আমরা ছেলেমেয়েদের গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার

www.pathagar.com

করছি এবং শিক্ষাজীবনের শুরুতেই তাদের বৈষম্যের সমুদ্রে ঠেলে দিচ্ছি। ধনাঢ্য পিতা-মাতার সন্তানেরা কিন্ডার গার্টেনের 'শিক্ষা বাজার' থেকে মানসম্পন্ন (প্রধানত ইংরেজি মিডিয়ামের) শিক্ষা লাভ করছে; কিন্তু বাকি ১০ ধরনের স্কুলশিক্ষার মধ্যে রয়েছে বিশাল বৈষম্য। বিশেষত নন-রেজিস্টার্ড বেসরকারি স্কুল ও এবতেদায়ি মাদ্রাসায় যে ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত রয়েছে, তাকে মানসম্পন্ন বলা যাবে না। গ্রামের সরকারি প্রাথমিক স্কুল, রেজিস্টার্ড বেসরকারি স্কুল এবং শহরাঞ্চলের নিম্নবিত্ত জনবসতির প্রাথমিক স্কুলের লেখাপড়াও মানসম্পন্ন নয়। ...বিশ্বের আর কোনো দেশে প্রাথমিক স্তরে ১১ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না' [খোলা কলম, প্রথম আলো, ০৭ নভেম্বর, ২০১২]।

বস্তুত মইনুলের এ বক্তব্যের সাথে দ্বিমত করবার অবকাশ কম। উল্লিখিত স্কুলগুলোর পরিবেশ-প্রতিবেশ-শিক্ষাদান প্রণালি শিক্ষকের গুণগত মানের মধ্যে সুবিশাল পার্থক্য রয়েছে। এখানে আমরা পাঠ্যসূচির ধরন, শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষাদানের প্রকৃতি ও চরিত্র এবং শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য ও মনন অনুযায়ী, আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাকে মোটা দাগে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করছি এবং তদনুসারে এর ভেতর ব্যবচ্ছেদে প্রবৃত্ত হতে যাচ্ছি।

পাঠকেন্দ্রিক এ উপদলগুলো হলো :

সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রাথমিক শিক্ষা;
মাদ্রাসাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা;
কিন্ডার গার্টেনভিত্তিক শিক্ষা;
ইংলিশ মিডিয়ামভিত্তিক শিক্ষা ও
কমিউনিটি বা এনজিও পরিচালিত শিক্ষা।

উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক শিক্ষার এই পঞ্চধারার মধ্যে এর কোনো কোনোটিতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নামে একটা কিম্ভূতকিমাকার পর্যায়ও চালু আছে, যা অপরিকল্পিত ও লক্ষ্যবর্জিত। এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট স্থানে আলোকপাত করা হবে। তবে ওই ধারাগুলোর সাথে একেবারেই সম্পর্কহীন, বিজ্ঞানবর্জিত, সম্পূর্ণভাবে ধর্মনির্ভর একধরনের প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ধারা ক'বছর আগ থেকে চালু করা হয়েছে। ধর্মীয় স্থান ও ভাবকে কেন্দ্র করে আবর্তিত এই শিক্ষাব্যবস্থা—কোন বিবেচনায়, কী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রবর্তিত হয়েছে, এর উত্তর খুঁজে পাওয়া ভার।

www.pathagar.com

উপাসনালয়ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

মসজিদ, মন্দির বা অন্য কোনো ধর্মীয় উপাসনালয়কে কেন্দ্র করে এই শিক্ষার আবর্তন ও বিকাশ। প্রার্থনালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধায়, এ ধরনের শিক্ষায় শিক্ষার্থীর ধর্মীয় পরিচয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ মন্দিরভিত্তিক শিক্ষায় মুসলিম শিক্ষক বা শিক্ষার্থীর প্রবেশাধিকার নেই। যেমন নেই মসজিদভিত্তিক শিক্ষাতে মুসলিম ব্যতীত অন্য কারো প্রবেশাধিকার। বিশেষ ধর্মালয়ে বিশেষ ধর্মাবলম্বীকে আবর্তন করে প্রদেয় এই শিক্ষা আমাদের সাধারণ 'শিক্ষা চেতনার' সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এ প্রক্রিয়া শিশুচিত্তের নরম মাটিতে একটা নির্দিষ্ট ধর্মের বীজ এমনভাবে রোপণ করে দিচ্ছে, যার প্রভাবে শিশুটি ধর্মান্ধ হয়ে পড়ছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

প্রশ্ন হলো, আমাদের প্রাথমিক বা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় এত ধারা, উপ-ধারা থাকার পরও, মন্দির-মসজিদসহ বিভিন্ন উপাসনালয়কে কেন্দ্র করে একটি ধর্মভিত্তিক আলাদা শাখা খোলার প্রয়োজন পড়ল কেন? এ ধরনের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানে বিদ্যমান অন্যান্য স্কুলগুলোই কি যথেষ্ট নয়? স্বীকার করছি, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলব্যাপী সরকার নিয়ন্ত্রিত স্কুলগুলোতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষারীতি চালু নেই; চালু নেই তো খুব প্রয়োজন থাকলে চালু করা যেত, ধর্মীয় বিভেদনীতিতে নয়—সর্বজনীন শিক্ষাক্রম পদ্ধতি অনুসরণ করে। শিশুকে ধর্মভিত্তিক বিভাজিত করে তার শিক্ষা প্রদান প্রক্রিয়া শিক্ষালয় থেকে বের করে এনে ধর্মালয়ের উপর প্রতিস্থাপিত করতে হবে কেন? এখানে যারা শিক্ষক হিসেবে কর্মরত, তারা প্রত্যেকেই নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত। তাদের মেধা নিয়ে সন্দেহ নেই, সন্দেহ কেবল দৃষ্টিভঙ্গি, পাঠক্রম, আর পাঠস্থানকে ঘিরে। শিক্ষালয় আর ধর্মালয়—উদ্দেশ্য এবং আবহের দিক থেকে কি অভিন্ন? একটা নির্দিষ্ট ধর্মীয় স্থানে, নির্দিষ্ট ধর্মের শিশুরা, ধর্মভিত্তিক পাঠক্রমের ছায়ায়, নির্দিষ্ট ধর্মাবলম্বী কর্তৃক কোন প্রক্রিয়ায়, কী শিখছে, কোন প্রকৃতিতে তার মানস তৈরি করা হচ্ছে—এটা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ না করলে উত্তরপ্রজন্মের মধ্যে মনুষ্যত্ব অপেক্ষা ধর্মীয় অন্ধত্ব বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

মন্দির কিংবা মসজিদভিত্তিক শিক্ষার সাথে যারা সংশ্লিষ্ট, শিক্ষক কিংবা শিক্ষার্থী—সবাই সমাজের অনগ্রসর শ্রেণী থেকে আগত। ওখানকার শিক্ষকগণ, অন্য কোনো চাকরি পান না বলেই মাসিক ২০০০ টাকা বেতনে নিত্য পাঠদানের কাজ নেন। এখানকার চাকরি টিকিয়ে রাখবার জন্য ভালো পাঠদানের চেয়েও কঠিন কাজ, শিক্ষার্থী ধরে রাখা। কচি বাচ্চারা, যেখানে

www.pathagar.com

খেলার মাঠ নেই, বিনোদনের সামান্য সুবিধা নেই, কেবল কিছু ধর্মীয় পাঠ নেবার জন্য এখানে নিয়মিত হতে চায় না। একদিন আসে তো দুদিন আসে না। শিক্ষার্থী কম হলে তো শিক্ষকের মাথায় বাড়ি। কারণ তিনি কেবল পাঠদাতাই নন, যেনতেনভাবে শিক্ষার্থী ধরে রেখে স্কুলটি টিকিয়ে রাখাও তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। ফলে স্কুলের মেঝেতে শিক্ষার্থী কমে গেলে, তাকে হন্যে হয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে, সোনামণি ডেকে শিষ্যদেরকে বিদ্যাকেন্দ্রে ফিরিয়ে আনতে হয়।

যে শিক্ষাধারা, সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্য শুভফল বয়ে আনার সম্ভাবনা নেই, যা শিশুকে মানুষ হতে না শিখিয়ে কট্টর হিন্দু বা মুসলিম হতে প্রণোদনা যোগায়, যে শিক্ষাক্রম চালিয়ে যেতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে চাকরি হারাবার ভয়ে সদা তটস্থ থাকতে হয়, অনিচ্ছুক শিশুকে যে শিক্ষালয়ে কায়দা-ফন্দি করে নিয়ে যেতে হয়, সেই অবৈজ্ঞানিক শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা উচিত কি না, তা ভেবে দেখা দরকার। প্রাচীন ভারতবর্ষের ভাববাদী দার্শনিক হিসেবে পরিচিত যাঁরা, তাঁরা নাকি বিদ্যাকে দুভাগ করে দেখতেন। পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা। পরাবিদ্যার অংশ ছিল ঈশ্বর, পরমাত্মা, পরলোক ইত্যাদি। আর অপরাবিদ্যার অংশ ছিল বস্তুবিজ্ঞান, পার্থিব বিষয় নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ। বস্তুত ওই দার্শনিকগণ নিজেদের কর্তৃত্ব-প্রভুত্ব টিকিয়ে রাখবার জন্য বিচার-বিশ্লেষণসমৃদ্ধ অপরাবিদ্যাকে নিকৃষ্ট বিদ্যা হিসেবে প্রচার করতেন এবং মানুষকে ধর্মের নামে বুঁদ করে রাখবার জন্যে পরাবিদ্যাকে আসল বা প্রকৃত বিদ্যা বলে প্রচার চালাতেন। আমাদের কচি শিশুদের মধ্যে কথিত সেই 'পরাবিদ্যা' প্রচলনের জোর তৎপরতা দেখে সন্দেহ জাগে, আমরা কি একুশ শতকের বাসিন্দা, নাকি প্রাচীনকালের বিবরে আছি?

বস্তুত দলের মধ্যে যদি উপ-দল থাকে, তারা যত সুশৃঙ্খল-সুবোধ-বাধ্যগত হোক, তাদেরকে এক সুতোয় গাঁথা সম্ভব হয় না। ভিন্ন পরিবেশের ভিন্ন চিন্তার কয়েকজন শিশুকে এক টেবিলে বসালে, কিছু সময়ের জন্য তারা অভিন্ন স্বরে কথা বলতে পারে, কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পর তাদের চেতনাপ্রবাহ নানাদিকে ছড়িয়ে পড়বেই। কচিমনের এই বহুমাত্রিক বিভাজন, নীরব মানসিক বিভেদ—এটা তো তাদের দ্বারা সৃষ্ট নয়, এর জন্য দায়ী আমরা, মানে যারা শিশুশিক্ষাকে নানান বাঁকে ঘুরিয়ে দিয়েছি, তারা।

পঞ্চপাণ্ডব ও আমাদের শিশুরা

মহাভারতের কল্যাণে 'পঞ্চপাণ্ডব' অভিধাটি অনেকেরই জানা। বিশ

www.pathagar.com

শতকের বাংলা কবিতাকে কেন্দ্র করে 'পঞ্চপাণ্ডব' শব্দটি বহু ব্যবহৃত হয়েছে। দুটো ক্ষেত্রেই এ অভিধাটি এসেছে কতিপয় সমিল বৈশিষ্ট্যের নিরিখে। আমাদের শিশুদের ক্ষেত্রে পঞ্চপাণ্ডব অভিধাটি ব্যবহার করা হয়তো যুক্তিপূর্ণ হবে না। শতবিভক্ত শিশুদেরকে একই মালায় গাঁথার জন্য অভিধাটি নিলাম। এই পাঁচজন, পাঁচ প্রকার বিদ্যালয়ে যায়, পাঁচ রকমের বই পড়ে, পাঁচ রকম পরিবেশে বড় হয়। এদের বাইরে, আরো একজন আছে, যে জন্ম থেকে শিক্ষাবঞ্চিত, বাকি পাঁচজন থেকে আলাদা, সে যেন কর্ণ, কুন্তীর সন্তান হয়েও সমাজ কর্তৃক অস্বীকৃত। এই কর্ণধর্মীরা বেড়ে উঠছে শ্রম বিক্রি করে—খেয়ে না খেয়ে, শোচনীয় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এই ছয় প্রকার শিশু, যারা কেবল বয়সসাদৃশ্যে সমিল, জন্মগত পরিবেশ-জীবনযাপন-প্রাত্যহিক বেড়ে ওঠা-শিক্ষাক্রম-চিন্তাচেতনায় ওদের মধ্যে অনৈক্যের পরিমাণ এত বেশি, যা ধর্ম-জাতি-গোত্র-স্থানিক বা কালিক মিলের কথা বলে অভিন্ন গ্রন্থিতে বাঁধা পুরোপুরি অসম্ভব। শিশুচিন্তায় অপার বৈষম্য জিইয়ে রেখে যারা শ্রেণিহীন সুষম সমাজের কথা বলেন, হয় তারা ফন্দিবাজ কিংবা জ্ঞানপাপী, নতুবা মূর্খ বা অকারণ বাকবিক্রেতা। তারা কি বোঝেন না, দুধে-জলে মিশ খাওয়ানো যায়, তবে তেলে-জলে তা করা যায় না?

এখানে একটি বিষয় অতি গুরুত্বর সাথে বলা দরকার যে, আমাদের প্রচলিত শিক্ষারীতিতে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদকাল পাঁচ বছর। আমাদের সর্বশেষ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে প্রস্তাব করা হয়েছে, 'প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ৫ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ৮ বছর অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত করা হবে।... ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে প্রাথমিক শিক্ষায় ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত চালু করার জন্য অনতিবিলম্বে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে :

প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার নতুন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ণ করা;

প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষকের জন্য শিক্ষাক্রম বিস্তারসহ শিখন-শেখানো কার্যক্রমের ওপর ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস করা।

প্রাথমিক শিক্ষার এই পুনর্বিন্যাসের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের সকল বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং শিক্ষকের সংখ্যা বাড়াতে হবে। যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে আট বছরব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ২০১৮-এর মধ্যে ছেলে-মেয়ে, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং জাতিসত্তা

www.pathagar.com

নির্বিশেষে পর্যায়ক্রমে বিভাগওয়ারী সারা দেশের সকল শিশুর জন্য নিশ্চিত করা হবে।' [পৃ-১২]

বস্তুত এখন পর্যন্ত, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপ্তিকাল যেহেতু পাঁচ বছরই রয়ে গেছে, তাই বর্তমান আলোচনায় উক্ত কাল ও পাঠসূচিকে বিবেচনায় রেখে প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হবে।

এবার আমরা প্রাগুপ্ত পঞ্চপাণ্ডবের শিক্ষা ও বেড়ে ওঠা এবং তদীয় সমবয়েসী কর্ণসংবাদ বিশ্লেষণ করে ওদের মানসবৈষম্যের স্বরূপটি দেখাবার চেষ্টা করব। এ পর্যায়ে শিক্ষাগুরুর বয়স বিবেচনাপূর্বক শিশুশিক্ষার ধরন-ধারণ বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

১. কিন্ডার গার্টেনভিত্তিক শিক্ষা : বাঙালি শিশুকে ইংরেজি বিদ্যায় দক্ষ করে তোলার ব্যর্থ প্রয়াস থেকে এ জাতীয় শিক্ষাধারার জন্ম। এ শিক্ষারীতির যিনি জনক, জার্মান মনীষী ফোডারিক ফ্রোয়েবল, শিশু মনস্তত্বের গভীর ও সুচিন্তিত দর্শন সামনে রেখে কিন্ডার গার্টেনভিত্তিক পঠন-পাঠনের সূচনা করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাপীঠের উদ্দেশ্য ছিল, শাসন বা চাপ প্রয়োগ অথবা পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে নয়, কচি শিশুকে শিক্ষাদান করতে হবে আনন্দচ্ছলে—খেলাধুলা কিংবা গল্পের মধ্য দিয়ে। জীবনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে, এ জাতীয় শিক্ষা শিশুকে তত্ত্ব বা তথ্য শেখাবে না, কেবল তার মনোবিকাশ সাধন করবে। তাকে ভাবতে শেখাবে, কল্পনাপ্রবণ হতে শেখাবে, নিজের চিন্তা জগৎকে সে তৈরি করবে নিজের মতো করে।

বাঙালিকুলের একাংশ, যারা ধনে-সনদে স্ফীত এবং মননে চতুর, তারা মহামতি ফ্রোয়েবলের দর্শনকে সামনে রেখে বিচিত্র স্লোগান এবং মনোলোভা প্রতিজ্ঞায় রঙ্গিন হয়ে কিন্ডার গার্টেনীয় শিক্ষার সূচনা করেছিলেন দেশের বড় বড় শহর ঘিরে। কয়েক বছরের মধ্যে ওদের শিক্ষাদানবিষয়ক আপাত অগ্রগতি এবং ধনস্ফীতি দেখে অন্যদের চোখ তো চড়কগাছ। এত স্বল্পসময়ে এত মুনাফা আর কোন কারবারে আছে? রিস্কলেস ব্যবসা, শিক্ষা নামক মহৎ শব্দটি সাথে জড়িত, কিঞ্চিৎ সম্মানও পাওয়া যায় আশপাশ থেকে। আর যায় কোথায়? হুজুগে বাঙালিকুল কিন্ডার গার্টেন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল। ব্যস মাত্র কয়েক বছরে, শহরের গলিতে গলিতে, গ্রামে-গঞ্জে ব্যাঙের ছাতার মতো এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান গজাতে লাগল। গালভরা অঙ্গীকার, ভিন্ন রকমের পোশাক-প্রদর্শনী, আর খানকয়েক ইংরেজি বই পাঠ্য করবার খবর প্রচার করলেই কেল্লাফতে। শিক্ষার্থীর অভাব হয় না কোথাও। বাঙালির সব ব্যাপারে যত অভাবই থাকুক, বাচ্চা-কাচ্চার অভাব আছে বলে দুর্নাম দিতে পারবে না কেউ।

www.pathagar.com

কিন্ডার গার্টেন যেহেতু পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এবং এতে ইংরেজি শেখাবার কথা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে প্রচার করা হয়, কাজেই ইংরেজিপ্রেমী বাঙালি ওদিকে হুমড়ি খেয়ে ধাবমান হয়। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের ঝকঝকে ইংরেজি নাম, পাঠ্যসূচিতে ইংরেজি বইয়ের আধিক্য, একেকটা বিষয়ে 'বাড়ির কাজ'-এর চাপ, বাচ্চাদের গায়ে চাপানো বিদেশি ঘরানার পোশাক দেখে মধ্যবিত্ত বাঙালি ভাবে, সন্তানকে সাহেব বানাবার স্বপ্ন সার্থক করতে হলে ওই জাতীয় বিদ্যাপীঠের বিকল্প নেই। টাকা যা-ই লাগুক, সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়। আগে চাই সন্তানের ভবিষ্যৎ পথ নির্মাণের ভিত্তি, পরে হবে টাকার হিসেব।

পশ্চিমের প্রায় সব মা-ই কর্মজীবী। সন্তানকে বুকে আগলে রেখে বড় করবার সুযোগ তাদের কম। নিজে যত্ন নিয়ে পড়াবার ফুরসৎও নেই তাদের। তাছাড়া সেখানে একান্নবর্তী পরিবারের কোনো অস্তিত্ব নেই। তাই সন্তান একটু বড় হওয়ার পর ওখানকার মা-বাবা, অনেকটা বাধ্য হয়ে ওদের শিক্ষার পুরো ভার সঁপে দেয় প্রতিষ্ঠানের কাছে। আড়াই-তিন বছরের শিশু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যায়, যত না শেখার জন্য, তারচেয়ে অনেক বেশি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ আর সমবয়সীদের সাথে মিলেমিশে আনন্দ বা খেলাধুলা করবার জন্য। ওইসব কচি শিশুদেরকে বিভিন্ন দলে উপ-দলে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেকটা দলকে সাধারণভাবে বলা হয় 'প্লে-গ্রুপ।' ওদের প্রধান লক্ষ্য পড়া নয়, পারস্পরিক জানাশোনা-খেলাধুলা বা মেলামেশার মাধ্যমে চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটানো, প্রত্যেকের ভেতরে স্বকীয়তাবোধের উদ্বোধন ঘটানো।

পাশ্চাত্য দেশীয় এ দর্শনটি শোচনীয় খণ্ডিত বা বিকৃত হয়ে যথেচ্ছভাবে অনুসৃত হচ্ছে বঙ্গীয় ভূখণ্ডে। বস্তুত আমাদের অধিকাংশ বঙ্গীয় মাতার সময়ের অভাব নেই। সন্তানকে সময় দিতে না পারার মতো ঝামেলাযুক্ত ব্যস্ততা নেই। তবু আমাদের শহুরে নব্য মাতাগণ, সন্তান একটু বড় হওয়ামাত্র তাদের শিক্ষা বিষয়ে অস্থির হয়ে ওঠেন এবং যত শিগগির সন্তানকে ভর্তি করে দেন পাশ্চাত্যদর্শী বিদ্যাপীঠে। এসব বিদ্যাপীঠের প্লে-গ্রুপে 'প্লে'র ছিটেফোটা নেই দেখে তারা অখুশি হন না। বরং সন্তানের উপর অদ্ভুতুড়ে ইংরেজি-বাংলা-চিত্রাঙ্কনের সার্বক্ষণিক চাপ দেখে তারা ভেতরে ভেতরে হৃষ্ট হন এবং ভাবেন 'চাপের মধ্যে থাকলে সোনামণির বাদরামি বা চঞ্চলতা একটু একটু করে কমবে; সে ক্রমশ শান্তশিষ্ট হয়ে ওঠবে।'

বস্তুত আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাক-প্রাথমিক স্তর নামে স্বীকৃত ও কাঠামোবদ্ধ কোনো স্তর নেই। এ স্তর সরকার কর্তৃক বিধিবদ্ধ নয়, বিধায়

www.pathagar.com

অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা নিয়ন্ত্রণহীন ও বিশৃঙ্খল। ১৯৭৪ সালে খুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের অধ্যায় ৬-তে 'প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছিল, 'বিশ্বের বহু উন্নত দেশে জন্মের কয়েক মাস পর হতে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষায়তনের ব্যবস্থা আছে। এই শিক্ষায়তনগুলো দু প্রকার হতে পারে, যথা : প্রথম পর্যায়ে শিশুভবন—জন্মের কয়েক মাস পর হতে তিন বছর পর্যন্ত শিশুদের জন্য, এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে শিশু উদ্যান—তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সের শিশুদের জন্য। এই উভয় পর্যায়ে তত্ত্বাবধান ও শিক্ষাদানের জন্য নারীরাই উপযোগী। এর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিকার, যিনি স্নেহ-মমতা দিয়ে শিশুর মনে নিরাপত্তার ভাব জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হবেন এবং তার দুরন্তপনাকে বাঞ্ছিত খাতে প্রবাহিত করতে পারবেন।'

শিশুভবন তৈরির উদ্দেশ্য সম্পর্কে কমিশন মন্তব্য করেছিল, 'ক. পরবর্তী জীবনে শিশুর আদর্শ ও ব্যক্তিত্ব গঠনের ভিত্তি স্থাপন করা; খ. খেলাধুলা এবং আনন্দদায়ক পরিবেশের মাধ্যমে শিশুর প্রয়োজনীয় অভ্যাস সৃষ্টি করা; গ. শিশুর শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক পরিপুষ্টি সাধন করা এবং ঘ. ভবিষ্যতে তাকে সুসমঞ্জস ও সুশৃঙ্খল সামাজিক জীবনযাপনের জন্য যথাবিহিত সহায়তা করা; এ ছাড়া প্রাথমিক স্কুলে প্রবেশের পূর্বে শিশুদের পঠনপ্রস্তুতি ও সংখ্যা পরিচিতি এবং ভালোমন্দ বিচারের যোগ্যতা অর্জন করতে শিশুদের সাহায্য করা।' বস্তুত কুদরত-ই-খুদা প্রণীত 'প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা' নীতিমালা আমাদের দেশে অনুসৃত হয়নি। অন্য কোনো বিধিবদ্ধ, নির্দিষ্ট ছক বিশিষ্ট নীতিমালাও প্রণীত হয়নি। ফলে বঙ্গদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাটি চলছে শোচনীয় অরাজকতার ভেতর দিয়ে, যার যার মতো, যেনতেন প্রকারে। প্লে, নার্সারি, কেজি ক্লাসে কী পড়ানো হবে, ক'টি বই বা কার ইংরেজি বই পাঠ্য করা হবে, সে সম্পর্কিত কোনো তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাড়া অন্য কারো কানে দেয়া হয় না। পুরোপুরি স্বেচ্ছাচারী মনোবৃত্তি নিয়ে, শিশুমনস্তত্ত্ব বা তার গ্রহণ ক্ষমতা বিবেচনা না করে প্লে, নার্সারি বা অন্য কোনো শিশু ক্লাসে এমন সব ভারী ভারী ইংরেজি বই পাঠ্য করা হয়, যা সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উঁচু ক্লাসের ইংরেজি বই অপেক্ষাও বেশি কঠিন।

প্লে গ্রুপের আরো দুই ক্লাস পর, অর্থাৎ কিন্ডার গার্টেনের যেটি চতুর্থ ক্লাস, সরকারি বিদ্যাপীঠের বিবেচনায় সেটি প্রথম ক্লাস। কিন্ডার গার্টেনীয় শিক্ষার ওই তিন বছরে শিশুটি কী শেখে, এরচেয়েও বড় প্রশ্ন ওখানে সে কী কী হারায়? তার অভিভাবক ওখানে অনেক টাকা ব্যয় করে, সেটা দৃশ্যমান

www.pathagar.com

এবং পরিমাপযোগ্য, কিন্তু প্রবল পড়ার চাপে শিশুটি যে মানসিকভাবে ন্যুব্জ হয়ে যায়, অস্থিরতায় আক্রান্ত হয়—সে খবর কে রাখে? ওখানকার শিশুরা দু-চারটা ইংরেজি শব্দ শেখে, কথায় কথায় 'ইয়েস', 'সরি' বলতে শেখে, তাদের সেই বিদ্যা চৈতন্যালোকিত নয়, তা চন্দ্রালোকিত, ফলে এর স্বকীয়তা বা স্থায়িত্ব—কোনোটাই নেই। কীভাবে থাকবে? সেখানকার পাঠসূচি কি বিজ্ঞানসম্মত? পড়াবার ধরন, পড়িয়েদের যোগ্যতা কি মানসম্মত? শিশু ক্লাসে কি বয়সোপযোগী পাঠদান করা হয়? শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ কি স্বাস্থ্যসম্মত? শিক্ষালয়ের উপযুক্ত? এসব প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর কেবল একটাই—না, না এবং না।

একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দুধ না দিয়ে যদি মাংস খাওয়ানো হয়, সে যেমন তা হজম করতে পারবে না, বরং ভয়ঙ্কর পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হবে, তেমনি তিন চার বছরের শিশুকে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কঠিন কঠিন ইংরেজি শেখালে, সে প্রবল মানসিক পীড়ায় আক্রান্ত হবেই হবে। এ পীড়া সহজে দেখা যায় না, তাই আমাদের মধ্যবিত্ত বাপ-মা সন্তানের গায়ে প্যান্ট-শার্ট-জুতোমোজা-গামছার মতো ঝুলানো টাই-সুদৃশ্য কার্ফ এবং কাঁধে অগুনতি ইংরেজি বই আর খাতার সমাহার দেখে তৃপ্তির ঢেকুর তোলেন; একবারও ভাবেন না, যে বোঝা শিশুর কাঁধে চাপানো হয়েছে, তা বইতে সে সক্ষম কি না। অভিভাবকদের অজ্ঞতা বা অসচেতনতার সুযোগ নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ তো তক্কে তক্কে থাকে। তারা জানে, যে স্কুলে যত বেশি ইংরেজি বই পাঠ্য করা হবে, বেশি বেশি বাড়ির কাজ দিয়ে শিশুকে ব্যস্ত রাখা হবে, অঙ্কন-সঙ্গীত-আবৃত্তি-অভিনয় ইত্যাদি সর্বপ্রকার বিষয়ে শিশুকে বিশারদ হিসেবে গড়ে তোলার দীপ্ত ঘোষণা দেয়া হবে, সেই বিদ্যাপীঠের ভর্তি ফি ও মাসিক বেতন যা-ই হোক, শিক্ষার্থীর অভাব কখনো হবে না।

কিন্ডার গার্টেনগুলোতে, যেখানে প্লে গ্রুপে দেদারসে ভর্তি করা হয়, এর অধিকাংশে 'প্লে'র জন্য বিন্দুমাত্র আয়োজন বা স্থান নেই। বিল্ডিং বা টিনের ঘর, বিদ্যাদানের জন্য যেখানেই স্থান নির্বাচন করা হোক, এর আশেপাশে খোলা জায়গা কোথাও নেই। শ্রেণীকক্ষগুলো শিক্ষার্থীতে ঠাসা, পা ফেলার জায়গার অভাব। দম বন্ধ হয়ে আসা শিশুগুলো যেই কোলাহল শুরু করে, শিক্ষক অমনি কঠিন গলায় ধমক দেন, শাসান। বিদঘুটে প্রশ্ন করে শিশুকে চুপ করিয়ে দেন। আর আমরা কে না জানি, শিশু দৈত্য-দানবকে যত ভয় পায়, এর চেয়ে বেশি ভয় পায় তার শিক্ষককে এবং শিক্ষকের কথাকে তারা অভ্রান্ত, অখণ্ডনীয় বলে মানে।

www.pathagar.com

এ ব্যাপারে কয়েকটি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অবতারণা করব। আমি বিশ্বাস করি, বিষয়গুলো ব্যক্তিগত হলেও এর সাথে সমষ্টির যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে।

অ. আমার মেয়ে তখন কে জি ক্লাসে পড়ে, জেলা শহরের সবচেয়ে নামি কিন্ডার গার্টেনে (আমার ইচ্ছেয় নয়, সেখানে ভর্তি হয়েছে কর্ত্রীর ইচ্ছেতে)। তার পড়াশোনার ধরন দেখে অবাক হই, আতঙ্ক বোধ করি, কখনো কৌতুক অনুভব করি। যাই করি, চুপচাপ করি। কারণ, নিশ্চিত বুঝি, ওই জাতীয় শিক্ষার বিরুদ্ধে কিছু বললে প্রথম ঝাড়ি খেতে হবে ঘর থেকে, বাইরে থেকে জুটতে থাকবে অজস্র সমালোচনা-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। নিজের বিদ্যাবুদ্ধি সম্পর্কে নিজের ধারণা যা-ই হোক, এতে বাইর কিংবা ঘর, কারো তেমন আস্থা নেই।

একদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে মেয়ে বলল, বাবা, শিং-মাগুর মাছের ইংরেজি কী?

উত্তর দিলাম, জানি না। পাল্টা প্রশ্ন করলাম, এমন শব্দের ইংরেজি জিজ্ঞেস করছো কেন?

—স্কুল থেকে পড়া দিয়েছে।

আমি ডিকশনারি ঘেটে শব্দদ্বয়ের ইংরেজি রূপ উদ্ধার করলাম। মনে মনে লজ্জা পেলাম খুব। কেজি ক্লাসের পড়া সমাধান করতে ব্যর্থ হলাম? কৌতূহলবশত ফোন করলাম সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের সিনিয়র শিক্ষককে। না, তিনিও শিং-মাগুরের ইংরেজি কী—তাৎক্ষণিকভাবে বলতে পারলেন না। এবার ফোন দিলাম একজন তরুণ প্রভাষককে। ফলাফল মিলল একই। ভেতরে ভেতরে খুশি হলাম খুব। ওদের অজ্ঞতা, আমার লজ্জা ও অজ্ঞতাকে নিমিষে প্রশমিত করে দিল। কিন্তু মেয়ের কাছে আমার লজ্জা-অজ্ঞতাকে ঢাকব কীভাবে? আমি বিশ্বাস করি, না-জানার মধ্যে লজ্জা নেই। সব মানুষ সবকিছু, এমন কি আপাত সহজ বিষয়ের অনেক কিছু অনেক সময়ই জানে না। কিন্তু সে জানা-অজানা-শেখার মধ্যে একটা স্বাভাবিক সূত্র থাকা উচিত। যেসব অপ্রচলিত ইংরেজি ওই বিষয়ের তুখোড় অধ্যাপকরাও জানেন না, তা পাঁচ বছরের শিশুকে কেন মুখস্থ করাতে হবে, এর মাজেজা বুঝে উঠা কঠিন। এর নাম কি শিক্ষা? নাকি শিক্ষার নামে কুশিক্ষা?

আ. আমার মেয়ে তখন কেজি টুয়ের শিক্ষার্থী। একদিন তার বাংলা বই দেখে তো চোখ চড়কগাছ। ভুল বানান, অশুদ্ধ বাক্য ও আজগুবি ভাব বিন্যাসভরা এ কেমন বই পাঠ্য করা হয়েছে?

www.pathagar.com

বাংলা বইটির নাম 'সবুজ সাথী'। রচয়িতার নাম প্রিন্সিপ্যাল (হায়, বানানের কী ছিড়ি) আব্দুল আউয়াল ভূঁঞা। বইটিতে ছড়া পাওয়া গেল ছয়টি। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নয় একটিও। আমাদের জাতীয় কবির 'ভোর হল' ছড়ার একটি পঙ্‌ক্তি লেখা হয়েছে 'ঐ দেখ যুঁই শাখে।' বস্তুত সঠিক বানান হবে 'জুঁই'। আমাদের পল্লীকবির কপাল খুব খারাপ। তাঁর নাম লেখা হয়েছে 'জসিম উদ্দীন'; বিখ্যাত কবির নামের বিকৃতি দেখে সহসা মনে হলো, এখানে 'বিশ্বকবি'র উপস্থিতি না থেকে ভালোই হয়েছে। ভুল বানানে উপস্থাপিত হওয়ার চেয়ে, অনুপস্থিতি ঢের ভালো।

বইটিতে অখ্যাত একজন, নাহিদ হাসান—তার নিজের লেখা যাচ্ছেতাই—অদ্ভুত দুটি ছড়া সেঁটে দেয়া হয়েছে। তার ছড়ায় না আছে ছন্দ-মাত্রার সমন্বয়, না আছে সাহিত্য। একটি ছড়ার দুটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করছি : 'আকাশ ভরা রঙিন ঘুড়ি/ দেখতে বেজায় লাগছে ভারী।' অর্থাৎ আকাশের রঙিন ঘুড়ি দেখতে বেজায় ওজনদার লাগছে। এর মানে কী হতে পারে, কে জানে; বইয়ে কয়েকটি বাহারি বাক্যের রূপ এ-রকম : 'বলদ গরু লাঙ্গল টানে'; 'শাঁখিদের মৃগ আছে'; 'একটা মেয়ে ফুটফুটে চাঁদের মত' ইত্যাদি ইত্যাদি। বানানের ক্ষেত্রে হৈমন্তী'কে লেখা হয়েছে হৈমন্তি, তুলাকে তূলা, ধোঁয়াকে ধূঁয়া, কাতলাকে ক্যাতলা আরো কত কী। ভুলের মহোৎসবভরা এমন নিম্নমানের বই, একটা অভিজাত কিন্ডার গার্টেনে কীভাবে প্রবেশাধিকার পেল, সেটা ভাববার বিষয় বটে।

ই. মেয়ের জন্য একব্যাগ খাতা এনে খাতার উপর তার নাম-ধাম ইত্যাদি লেখে দিলাম। দুদিন পর মেয়ে গজরাতে গজরাতে বলল, তুমি না পার ইংরেজি, না পার বাংলা লেখতে। কলেজে পড়াও কীভাবে? আমি উৎসুক হয়ে বললাম, কেন, কী হয়েছে?

মেয়ে আমার দিকে খাতা বাড়িয়ে দিল। দেখলাম, তার শিক্ষক আমার লেখা দুটো বানান 'অঙ্ক' ও 'শ্রেণি' লাল কালিতে কেটে দিয়ে শুদ্ধ করেছেন এভাবে, অংক ও শ্রেণী। আমি মেয়েকে যত বোঝাই, আমার বানানই সঠিক—সে ততই রেগে বলে, তুমি কি আমার ম্যাডামের চেয়ে বেশি জানো? ম্যাডাম বই দেখিয়ে বলেছেন যে, তোমার লেখা বানান দুটো অশুদ্ধ।

একে তো ম্যাডাম বলেছেন; তার উপর বইও সাক্ষী যে, আমি অশুদ্ধ। অগত্যা কী আর করা; চুপ করে যাওয়া বিনা গত্যন্তর কী?

হ্যাঁ, আমরা সবাই জানি, কিন্ডার গার্টেনে বই পাঠ্য করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট

www.pathagar.com

কোনো নীতিমালা নেই। স্কুল কর্তৃপক্ষ নিজেদের ইচ্ছেমতো যার-তার বই পাঠ্য করে নেন। এক্ষেত্রে, বেশিরভাগ সময় বইয়ের মানকে চাপিয়ে যায় লেখক বা প্রকাশনীর তদ্বির। প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের স্বার্থে অন্ধ হয়ে শত শত, হাজার হাজার শিশুকে জিম্মি করে বাজে বইয়ের নিম্নমানের পাঠ নিতে বাধ্য করছে ওদেরকে। কিন্ডার গার্টেনগুলোর "অধিকাংশ বইপুস্তক বিদেশে প্রকাশিত কিংবা বিদেশি অনুকরণে রচিত। এতে বাহ্যিক চাকচিক্য আছে। মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত তাতে আকৃষ্ট হন। ইংরেজি কিছু পাঠ শিখে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে অনেকটা 'এডভান্সড' করা হয় বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। আসলে ৩ থেকে ৫/৬ বছরের শিশুর জন্য এসব শিক্ষার কোনো আবেদন আছে কি না, তাদের সুস্থ মানস গঠনে তা কোনো কাজে আসবে কি না, তা বোধহয় স্কুল কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক-পিতামাতা কেউই আমরা ভেবে দেখি না।... পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশে আমাদের জানামতে শিশুদেরকে ভালোভাবে মাতৃভাষা না শিখিয়ে ইংরেজি বা বিদেশি কোনো ভাষায় লেখাপড়া করতে দেওয়া হয় না, এটি কোনো সুস্থ্য মানসিকতার লক্ষণ নয়, শিক্ষা বিজ্ঞান তা অনুমোদন করে না।" [বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষানীতি : ড. মমতাজউদ্দিন পাটোয়ারী, পৃ- ১৬]

আমাদের কিন্ডার গার্টেনগুলোতে কে পড়ান? তারা কি শিশুশিক্ষা দানে দক্ষ? ইংরেজি ভাষায় প্রশিক্ষিত? শিশু মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তারা কি অভিজ্ঞ? শিশুকে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাবার কৌশল তারা কি জানেন? এসব প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর—না, না এবং না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই কবে বলেছিলেন, 'ইংরেজি ভাষাটা অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা। শব্দবিন্যাস, পদবিন্যাস সম্বন্ধে আমাদের ভাষার সহিত তাহার কোনো প্রকার মিল নাই। তাহার পরে আবার ভাববিন্যাস এবং বিষয়-প্রসঙ্গও বিদেশি। আগাগোড়া কিছুই পরিচিত নহে, সুতরাং ধারণা জন্মিবার পূর্বেই মুখস্থ আরম্ভ করিতে হয়। তাহাতে না চিবাইয়া গিলিয়া খাইবার ফল হয়। ... .আবার নীচের ক্লাসে যে-সকল মাস্টার পড়ায় তাহারা কেহ এন্ট্রেন্স পাস, কেহ বা এন্ট্রেন্স ফেল, ইংরেজি ভাষা ভাব আচার ব্যবহার এবং সাহিত্য তাহাদের নিকট কখনোই সুপরিচিত নহে। তাহারাই ইংরেজির সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় সংঘটন করাইয়া থাকে। তাহারা না জানে ভালো বাংলা, না জানে ভালো ইংরেজি। কেবল তাহাদের একটা সুবিধা এই যে, শিশুদিগকে শিখানো অপেক্ষা ভুলানো ঢের সহজ এবং তাহাতে তাহারা সম্পূর্ণ কৃতকার্যতা লাভ করে।' (শিক্ষা, পৃ-২৭৯-৮০, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী সম্পাদিত)।

www.pathagar.com

কিন্ডার গার্টেনের যিনি প্রধান, তার পদবির নাম প্রিন্সিপাল। (হেডমাস্টার নয় কেন?) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তিনি হন প্রতিষ্ঠানের মালিক অথবা মালিক পক্ষের ঘনিষ্ঠ কেউ। তার কোনো নির্দিষ্ট সনদের প্রয়োজন পড়ে না। আইএ, বি এ, এমএ—একটা হলেই হলো। তবে তার অধীনে যারা চাকরি করবেন, তাদেরকে অবশ্যই বড় সনদধারী হতে হবে। তবে সেসব সনদের যথার্থ মহিমা থাকার প্রয়োজন নেই। সনদের স্ফীতি থাকলেই হলো, জ্যোতি নয়। আর মহিমান্বিত বড় সনদধারীরা কিন্ডার গার্টেনে আসবেন কেন? তাদের জন্য অন্য চাকরি আছে না?

সাধারণত তিন শ্রেণির লোকজন চাকরি করতে কিন্ডার গার্টেনে আসেন। এক. উচ্চশিক্ষিত বেকার, যারা এখানে পড়ান বটে, তবে চোখ থাকে অন্য চাকরির দিকে; দুই. উপায়ান্তরহীন বেকার, যাদের অন্য চাকরি পাবার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে; তিন. অভিজাত শ্রেণির একাংশ, যাদের কাছে অর্থ গৌণ, কিন্তু একটা ভদ্রগোছের সামাজিক আইডেনটিটি খুবই প্রয়োজন। প্রথম অংশ কিন্ডার গার্টেনে আসেন পরবর্তী চাকরির সিঁড়ি প্রস্তুত করতে। দ্বিতীয় শ্রেণি আসেন বাধ্য হয়ে। এদের চোখ মাসিক বেতনের দিকে নিবদ্ধ থাকে না। তারা চেয়ে থাকেন টিউশনির দিকে। এরা চাকরিকে ব্যবহার করেন টিউশনি জোগারের মই হিসেবে। তৃতীয় শ্রেণি আসেন 'একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত আছি'—এ রকম কিছু বলতে পারার গর্বিত ভিত তৈরি করতে। বস্তুত বেকার বা অভিজাত, সবাই কিন্ডার গার্টেনে চাকরি নেন সবিশেষ প্রয়োজনেই। "তাদের এই প্রয়োজনটাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন মালিকপক্ষ। এমন উদাহরণ বিরল নয় যে, দেশে অনেক কিন্ডার গার্টেন আছে—যেখানে প্রতি ছাত্রের মাসিক বেতন আর শিক্ষকের মাসিক সম্মানি প্রায় সমান সমান। যারা এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্মদাতা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা শিক্ষাপ্রসারক নন, শিক্ষা ব্যবসায়ী। বেকারগ্রস্ত দেশে অতি সস্তায় শ্রম আর মেধা কিনে এ রকমের ব্যবসায়ীরা স্বল্প সময়ের মধ্যে 'আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ' হয়ে যাচ্ছে।" (শিক্ষা অশিক্ষা কুশিক্ষা : বিধান মিত্র, পৃষ্ঠা-০৮)

তবে হ্যাঁ, স্বীকার করতেই হবে, দেশের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা কিন্ডার গার্টেনের শিক্ষাক্রম অনেক বেশি সুশৃঙ্খল। প্রতিটা শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থী সংখ্যা সীমিত। ছাত্রছাত্রী পাওয়ার ক্ষেত্রে এক প্রতিষ্ঠানকে পাশের আরেক প্রতিষ্ঠানের সাথে কড়া প্রতিযোগিতা করতে হয় বিধায়, তারা নিজেদেকে প্রতিনিয়ত নতুন ধাঁচে সাজাবার চেষ্টা করে যায়। তবে অপ্রিয় সত্য এই যে, প্রতিযোগিতালিপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের অনন্যতা প্রমাণ করবার

www.pathagar.com

জন্য এমন সব বই পাঠ্য করে, যার কাঠিন্য বহনে শিশুরা পুরোপুরি অক্ষম। এসব বইয়ের ভারী পড়া বাধ্য হয়ে শিশুরা মুখস্থ করে বটে, তবে তাদের পড়ার আনন্দটুকু সবার অলক্ষে নিঃশেষ হয়ে যায়। সে পড়ে ভয়ে বা দায়ে পড়ে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে নয়। আগ্রহবর্জিত, আনন্দহীন এমন শিক্ষা গলধঃকরণের ফলে আমাদের অধিকাংশ শিশুর অবস্থা হয় নিম্নরূপ :

সোনামণির সঙ্গী সদা খাতা-কলম বই
ফড়িং-পাখি-গোলাপ-নদী দেখার সময় কই?
দেখা হয় না তৃণ-গুল্ম, সবুজ নিবিড় বন
ঘাসের উপর শিশির বিন্দু, ভ্রমর উড়ার ক্ষণ।
চেনা হয় না গোল্লাছুট আর কানামাছি খেলা
মনের ভেতর শুকনো জমি, মাথায় বিদ্যা মেলা।
রং-বেরঙের বিদ্যার চাপে নিরানন্দে দোলে,
শিশু মনের উচ্ছলতা কখন গেছে ভুলে।
ধীরে ধীরে শরীর শুকায়, ব্যামো এসে ডাকে
দেহের ব্যাধি সবাই দেখে, মনেরটা কে রাখে?
(শেয়াল সিংহের রাজত্বে : বিধান মিত্র, পৃ. ০৭)।

২. ইংলিশ মিডিয়ামভিত্তিক শিক্ষা : এ দেশে ইংরেজ রাজত্ব কায়েমের পর, শাসকগোষ্ঠীর নৈকট্য বা কৃপা লাভের আশায় প্রধানত উচ্চবিত্তশ্রেণির মাঝে ইংরেজি শিক্ষাপ্রীতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। ধনিক ও শিক্ষিত সমাজের একাংশ, তারাও যে ইংরেজদের তুলনায় কম 'ইংরেজি-দক্ষ' নয়, তা প্রমাণের জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা শুরু করেছিলেন। শাসকশ্রেণির কাতারে উঠার অসম্ভব অভিপ্রায় নিয়ে তখন অনেকেই মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করতে শুরু করেন এবং ইংরেজি ভাষা চর্চায় নিবিড়ভাবে ব্রতী হন। এদেরই একজন, মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, পরবর্তীকালে নিজের ভুল বুঝতে পারলেও, অন্যরা সেই মোহজাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। সেই মোহগ্রস্তদের উত্তর প্রজন্ম, ইংরেজ রাজত্বর্জিত বঙ্গদেশে এখনও ইংরেজি ভাবে প্রবল গদগদ—যারা আপাদমস্তকে বিশ্বাস করেন, জীবনে কেউকেটা গোছের কিছু একটা হতে হলে ইংরেজি শিক্ষার বিকল্প নেই। এইসব অভিভাবকের সন্তানদের সম্পর্কে তীর্যক কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, "আমরা জানি, অনেকের ঘরে বালকবালিকা সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত হইতেছে। তাহারা আয়ার হাতে মানুষ হয়, বিকৃত হিন্দুস্থানি শেখে, বাংলা ভুলিয়া যায় এবং বাঙ্গালির ছেলে

www.pathagar.com

বাংলাসমাজ হইতে যে শত সহস্র ভাবসূত্রে আজন্মকাল বিচিত্র রস আকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হয় সেই-সকল সজাতীয় নাড়ির যোগ হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হয়—অথচ ইংরেজি সমাজের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ থাকে না। তাহারা অরণ্য হইতে উৎপাটিত হইয়া বিলাতি টিনের টবের মধ্যে বড় হইতেছে। আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি, এই শ্রেণির একটি ছেলে দূর হইতে কয়েকজন দেশীভাবাপন্ন আত্মীয়কে দেখিয়া তাহার মাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছে, 'Mamma Mamma, look, lots of Babus are coming.' বাঙ্গালির ছেলের এমন দুর্গতি আর কী হইতে পারে।" (শিক্ষা সমস্যা, পৃ. ৩১০, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী সম্পাদিত)।

আমরাও বিশ্বাস করি যে, বর্তমান বিশ্বায়নের কালে, 'মিলাবে মিলিবে'র যুগে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত ভাষা ইংরেজিকে পাশ কাটিয়ে থাকবার উপায় নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-শিল্পকলার বৈশ্বিক নির্যাস আহরণ করবার জন্য ইংরেজি শেখায় সবাইকে অবশ্যই মনোযোগী হতে হবে। প্রশ্ন হলো, আমরা যে ইংরেজি শিখব, সেটা কখন, কীভাবে, কী পদ্ধতিতে শিখব?

আমাদের সকল স্কুলে, এমনকি সরকার-নিয়ন্ত্রিত প্রাথমিক বিদ্যালয়েও তৃতীয় শ্রেণি থেকে ইংরেজি বিষয়টি আবশ্যিক হিসেবে বিবেচিত। আর কিন্ডার গার্টেনগুলোতে প্লে নার্সারি ক্লাস থেকেই ইংরেজির ভারী বোঝা চাপানো হয়। আমাদের ধারণা, যেভাবেই হোক দু-চারটা ইংরেজি বলতে বা লিখতে পারলেই উপরে উঠার সিঁড়ি একদম সহজ হয়ে যাবে। অথচ শিশু পর্যায়ে পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশেই মাতৃভাষাকে পাশ কাটিয়ে বিদেশি ভাষা-শেখায় গুরুত্ব দেয়া হয় না। আমরা একবারও ভাবি না যে, নিজের ভাষা-সংস্কৃতি দূরে রেখে শিশুমনে যদি ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির বীজ বপন করা হয়, এর পরিণাম কখনোই শুভ হবে না।

ইংরেজরা এ দেশ ছেড়েছে বহুকাল হয়ে গেছে। তবে তাদের প্রতি ভক্তি বা মোহাচ্ছন্নতা বাঙালির আদৌ কমেনি। এখনও নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মতো বহু বাঙালি আছেন, যারা স্বজাতিকে কষে গাল দিয়ে ইংরেজ বা তাদের ভাষার মহিমা কীর্তনে সতত গদগদ ভূমিকা পালন করে যান। এখনও উচ্চবিত্ত সমাজে, এমনকি মধ্যবিত্তের একাংশও ইংরেজি ভাষাকে শাসকের ভাষা জ্ঞান করে সন্তানকে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করবার জন্য হন্যে হয়ে ঘোরেন। বাংলা ভাষার জন্য বায়ান্নে প্রাণদানের পর, একাত্তরে জাতীয়তাবোধের ভিত্তিতে স্বাধীন হওয়ার পর, এখনও আমরা ভিনদেশি ভাষার প্রতি কোন যুক্তিতে মোহগ্রস্ত হয়ে আছি, ব্যাপারটা গভীর পর্যালোচনার দাবি রাখে।

www.pathagar.com

এক-দুই দশক আগেও গুটিকয় বড় শহরে 'ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল'-এর দেখা পাওয়া যেত। সেখানে পড়ত সীমিত সংখ্যক কেউকেটা লোকের সন্তানরা। তারা পড়ত এ দেশে, তবে মননে-চিন্তনে ধারণ করত পশ্চিমের অনুরণন। হাল আমলে, বড় শহরের গলিতে গলিতে, এমনকি মফস্বল শহরেরও একাধিক স্থানে এ জাতীয় অসংখ্য স্কুল গড়ে ওঠছে। ওই সব স্কুলগামী শিশুরা, নজরকাড়া পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে যখন হাঁটে, দেখতে বেশ ভালোই লাগে। তবে তাদের কাঁধে ঝুলানো ব্যাগের অভ্যন্তরে রাখা বই-খাতার ওজন এবং বইয়ের ভেতরে ভারী বিদ্যার স্বরূপ দেখে প্রশ্ন জাগে মনে, এমন বোঝা বহনে তারা কি সত্যিই সক্ষম?

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে সাধারণত দুই ধরন বা ক্যাটেগরিতে পাঠ দান করা হয়; এক. এ দেশীয় পাঠ্যসূচিকে ইংরেজি ভার্সন বা অনুবাদের মাধ্যমে পড়ানো হয়; দুই. ইউরোপ-আমেরিকার সিলেবাস অনুযায়ী ওই দেশেরই মূল বই পড়ানো হয়। প্রথম আঙ্গিকে পড়া অপেক্ষাকৃত সহজ, দ্বিতীয়টা সুকঠিন। আর সুকঠিন বলেই পরেরটায় প্রাপ্তিযোগের সম্ভাবনা নাকি বেশি।

বড় শহরের নামি-দামি স্কুলগুলোতে ভর্তি ফি এবং মাসিক বেতনের পরিমাণ এত বেশি যে, সেখানে বড় অঙ্কের মাইনে দিয়ে বড় ও বাঘা শিক্ষক যোগাড় করতে অসুবিধে হয় না। যারা ইংরেজি বিদ্যায় সত্যিকারের পারদর্শী, উচ্চবেতন ও টিউশনির ব্যাপক সুবিধার কথা বিবেচনা করে তারা অনেকেই সার্টিফিকেটের উচ্চতা বিস্মৃত হয়ে ওইসব স্কুলে যান বাচ্চা পড়াতে। পড়িয়ে আনন্দ পান আর না পান, মাসিক প্রাপ্তি তো কম হয় না। কারবারি বিশ্বে অর্থই যেখানে সবকিছুর নিয়ামক, যেখানে অর্থের জন্য নামি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে অনেক শিক্ষক কাজ নেন আপাত-উজ্জ্বল বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানে, সেখানে দ্যুতিময় সনদ থাকা সত্ত্বে কে কোথায় কীসে মেধা ও শ্রম বিনিয়োগ করছেন, সেটা নিয়ে গীবত করা উচিত নয়।

ইংরেজি প্রবাহের যুগে, চড়া ভর্তি ফি ও মাসিক উচ্চবেতন থাকা সত্ত্বেও মফস্বলি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীর কিন্তু অভাব হচ্ছে না। যাদের হাতে পয়সা আছে, সেটা যেভাবেই উপার্জিত হোক না কেন, তারা অনেকেই সন্তানকে পাঠাচ্ছেন ইংরেজি স্কুলে, বুকের মধ্যে লাল-নীল স্বপ্ন নিয়ে। কিন্তু হায়, সেখানে ইংরেজি শেখাবার মতো যোগ্য শিক্ষক কোথায়?

এ জাতীয় স্কুলের বিশাল অংশ, অনভিজ্ঞ শিক্ষকের মাধ্যমে জোড়াতালি দিয়ে চলে। পাঠগ্রহণ-পাঠপর্যালোচনার চেয়ে পাঠ প্রদানে বেশি মনোযোগ দেয়া হয়। ফলে পাঠ-সমাধানের জন্য রাখতে হয় চড়া দামের 'প্রাইভেট

www.pathagar.com

টিউটর'। অভিভাবককুলের অনেকে, সন্তানের মুখে টুকটাক ইংরেজি শুনে খুশি হয়ে ভাবেন, নিজে যা পারিনি—সন্তানটি তা করতে পারছে। ও কে আরো সুবিধা দেয়া দরকার। অবশ্য কোনো কোনো অভিভাবক দেরিতে হলেও বুঝতে পারেন, ওই স্কুলে গিয়ে তার সন্তান ইংরেজি তো শিখছেই না, বরং ক্রমশ ভুলে যাচ্ছে বাংলা ভাষার পঠন-পাঠন। তারা তখন সন্তানের স্কুল বদলাবার জন্য এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকেন। কিন্তু কোথায় যাবেন? তার স্বপ্ন-অভিপ্রায় বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পিত পাঠদান কেন্দ্র কোথায় আছে?

আমাদের মফস্বলীয় ইংরেজি পাঠশালাগুলোর অধিকাংশ, এমন সব শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত, যারা নিজেরাই ইংরেজিতে অদক্ষ। শ্রেণিকক্ষে তারা কেবল আপন মনে পড়িয়ে যান, বোঝান না কিছুই। ছোট ছোট বাচ্চারা সেই পড়ার কতটুকু অনুধাবন করতে পারল, সেদিকে কেউ মনোযোগ দেন না। আর বাচ্চারা, তাদের ঘাড়ে কয়টা মাথা আছে যে, শিক্ষককে প্রশ্ন করতে যাবে তারা? পড়া তারা না বুঝলেও ভয়ে চুপচাপ বসে থাকে শ্রেণিকক্ষে। পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়াবর্জিত এমন চাপিয়ে দেয়া ভারী শিক্ষাক্রম ধারণ করতে গিয়ে শিশুমনের কী ক্ষতি হচ্ছে, এর হিসেব নির্ণয় করা সহজ নয়। এ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীকে স্মরণ করা যেতে পারে, "আমাদের সমাজে এমন অনেক মা আছেন, যাঁরা শিশুসন্তানকে ক্রমান্বয়ে গোরুর দুধ গেলানোটাই শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার ও বলবৃদ্ধির সর্বপ্রধান উপায় মনে করেন। গোদুগ্ধ অবশ্য অতিশয় উপাদেয় পদার্থ, কিন্তু তার উপকারিতা যে ভোক্তার জীর্ণ করবার শক্তির উপর নির্ভর করে, এ জ্ঞান ও-শ্রেণির মাতৃকুলের নেই। তাঁদের বিশ্বাস, ও বস্তু পেটে গেলেই উপকার হবে। কাজেই শিশু যদি তা গিলতে আপত্তি করে, তাহলে সে যে ব্যাদড়া ছেলে, সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। অতএব তখন তাকে ধরে বেঁধে জোরজবরদস্তি দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। শেষটায় সে যখন এই দুগ্ধপানক্রিয়া হতে অব্যাহতি লাভ করবার জন্য নাড়তে, হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করে তখন স্নেহময়ী মাতা বলেন, 'আমার মাথা খাও, মরা মুখ দেখো... এই এক ঢোক, আর এক ঢোক, আর এক ঢোক ইত্যাদি।' মাতার উদ্দেশ্য যে খুব সাধু, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, উক্ত বলা-কওয়ার ফলে মা শুধু ছেলের যকৃতের মাথা খান এবং ঢোকের পর ঢোকে তার মরা মুখ দেখবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে চলেন। আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষা পদ্ধতিটাও ওই একই ধরনের। এর ফলে কত ছেলের সুস্থ সবল মন যে ইনফ্যান্টাইল লিভারে গতাসু হচ্ছে, তা বলা কঠিন। কেননা দেহের মৃত্যুর রেজিস্টারি রাখা

www.pathagar.com

হয়, আত্মার মৃত্যুর হয় না।" (প্রবন্ধ সংগ্রহ, বইপড়া : প্রমথ চৌধুরী, পৃ-১১২)।

শিশুশিক্ষা—একমাত্র মাতৃভাষাতেই চালু করা উচিত, এ প্রত্যয় ও বিশ্বাসে আজীবন সমর্পিত ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি শিশুশিক্ষার উপযোগী অনেকগুলো গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ অভিমত পোষণ করেছিলেন, 'জনশিক্ষার ব্যবস্থা মাতৃভাষার মাধ্যমেই হতে হবে।' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে, ১৮৯১ সালে, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জ্ঞান মাতৃভাষার মাধ্যমে সঞ্চারিত না হলে জাতি হিসাবে আমাদের গভীর ও ব্যাপক সংস্কৃতি অর্জন করা সম্ভব নয়।' রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার সাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'শিক্ষায় মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ, জগতে এই সর্বজন-স্বীকৃত নিরতিশয় সহজ কথাটা বহুকাল পূর্বেই একদিন বলেছিলাম, আজও তার পুনরাবৃত্ত করবো।'

কেবল শিশুশিক্ষার মাধ্যম নয়, উচ্চশিক্ষাতেও বাংলার ব্যাপক যাতায়াত কামনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'শিক্ষার বাহন' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, 'আমাদের এই ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে? ভরসা করিয়া এইটুকু কোনদিন বলিতে পারিব না যে, উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে? পশ্চিম হইতে যাহা কিছু শিখিবার আছে, জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল, তার প্রধান কারণ, সেই শিক্ষাকে তাহারা দেশী ভাষার আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে। অথচ জাপানি ভাষার ধারণ-শক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশি নয়। নতুন কথা সৃষ্টি করিবার শক্তি আমাদের ভাষায় অপরিসীম।—আমি জানি তর্ক এই উঠিবে, 'তুমি বাংলা ভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিতে চাও, কিন্তু বাংলা ভাষায় উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই? নাই সে কথা মানি, কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কি উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে, শৌখিন লোকে শখ করিয়া তার কেয়ারি করিবে, কিংবা সে আগাছা নয় যে মাঠে বাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে।... বাংলার উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয়, তবে প্রতিকারের একমাত্র উপায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা।'

কেউ হয়তো বলবেন, বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরীর সেকেলের চিন্তা আজকের দিনে খাটবে না। বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির জয়োৎসবের মঞ্চে ইংরেজি বিদ্যে ব্যতিরেকে ভবিষ্যৎ আছে না কি? তাদের উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

সবিনয় নিবেদন, পৃথিবীর বহু দেশে, যেমন চীন-জাপান-জার্মানের শিশুশিক্ষাতে বিদেশি ভাষার স্থান নেই। তর্ক উঠতে পারে, ওরা উন্নত দেশ। তাদের ইংরেজির দ্বারস্থ না হলেও চলে। অন্যদিকে আমরা গরিব-দুখি জাতি। দু-চার কথা ইংরেজি না জানলে, স্বদেশ কিংবা বিদেশে চাকরি জুটাব কী করে?

হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই ইংরেজি শিখব। শুধু ইংরেজি কেন, ফ্রেঞ্চ-জর্মন অনেক ভাষাই শিখব। তবে তা শিখব মাতৃভাষা ভালোভাবে আত্মস্থ করার পর। প্রাথমিক শিক্ষায় একেবারেই নয়, সে পাঠ শুরু হবে শিক্ষাক্রমের দ্বিতীয় ধাপে, ষষ্ঠ বা সপ্তম শ্রেণি থেকে। বিদেশি ভাষার যে পাঠ আমরা নেব, তা নেব আনন্দ ও উপলব্ধি দিয়ে, কোনোক্রমেই ডাহা মুখস্থের মধ্য দিয়ে নয়। নিজের ভাষায় বিকশিত হবার পর নজর দেব অন্যের ভাষা ও সংস্কৃতির দিকে। যদি তা না করে, কেবল মুখিয়ে থাকি অন্য ভাষা-সংস্কৃতির দিকে, তা হলে আমাদের অবস্থা হয়তো এমন হতে পারে, 'সকল ঘাস ধান হয় না। পৃথিবীতে ঘাসই প্রায় সমস্ত, ধান অল্পই। ঘাসজাতির মধ্যে কুশতৃণ গায়ের জোরে ধান্য হইবার চেষ্টা করিয়াছিল—বোধহয় সামান্য ঘাস হইয়া না থাকিবার জন্য, পরের প্রতি একান্ত মনোনিবেশ করিয়া জীবনকে সার্থক করিবার জন্য তাহার মধ্যে অনেক উত্তেজনা জন্মিয়াছিল—তবু সে ধান্য হইল না। কিন্তু সর্বদা পরের প্রতি তাহার তীক্ষ্ণ লক্ষ্য নিবিষ্ট করিবার একাগ্র চেষ্টা কিরূপ, তাহা পরই বুঝিতেছে। মোটের উপর এ কথা বলা যাইতে পারে যে, এরূপ উগ্র পরপরায়ণতা বিধাতার অভিপ্রায় নহে। ইহা অপেক্ষা সাধারণ তৃণের খ্যাতিহীন অথচ স্নিগ্ধসুন্দর বিনম্রকোমল নিষ্ফলতা ভালো।' (পনেরো আনা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, শিশুপর্যায়ে কেবল মাতৃভাষা শিখে আমাদের শিশুরা কি খ্যাতিহীন অথচ স্নিগ্ধসুন্দর তৃণ থাকবে? নাকি আধা আধা ইংরেজি শিখে ঘাড়ভাঙা কুশতৃণে পরিণত হতে থাকবে?

৩. সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রাথমিক শিক্ষা : আমাদের দেশে 'প্রাথমিক শিক্ষা' বলতে সাধারণত সরকার নিয়ন্ত্রিত স্কুলসমূহে ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত, এই পাঁচ বছরকাল ব্যাপ্ত শিক্ষাকে ধরে নেয়া হয়। এ শিক্ষা শহর থেকে গ্রাম, দ্বীপ থেকে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল—সর্বত্র বিস্তৃত। ইদানীং শহর বা উপশহর, যেখানে কিন্ডার গার্টেনের আপত উজ্জ্বল উপস্থিতি রয়েছে, সেখানে সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গুরুত্ব ভয়াবহভাবে কমে যাচ্ছে, কেবল

www.pathagar.com

স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বল্প সংখ্যক শিশু নিয়ে এগুলো নিজের নিষ্প্রভ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখছে।

দেশের লাঞ্ছিত বঞ্চিত জনগণ, যাদের সিংহভাগের বসবাস গ্রামে, কিংবা যারা শহরে থাকলেও বিত্ত-বৈভবের দিক থেকে অনার্য, যাদের শিরা-ধমনীতে ধর্মীয়ভাব উত্তাল নয়, বিধায় মাদ্রাসামুখী হতে চায় না—প্রধানত তাদের সন্তানরা, অনেকটা বাধ্য হয়ে ভর্তি হয় সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রাথমিক স্কুলে। এ শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক, বইও পাওয়া যায় বিনে পয়সায়, পড়াশোনার চাপও তেমন নেই, ফলে গ্রাম বা শহরের প্রায় সব শিশু মনের আনন্দে যাতায়াত শুরু করে এ জাতীয় স্কুলে। এদের একাংশ, কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে, হঠাৎ একদিন স্কুল ত্যাগ করে ফেলে, যত না স্বেচ্ছায়—তারও বেশি পিতামাতার চাপে। এসব পিতামাতা শিক্ষার দূরাগত ফলে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন না; অথবা অভাব তাদেরকে বাধ্য করে সন্তানকে স্কুল ছাড়াতে; এই দুর্ভাগা শিশুরা, অতি অল্প বয়সে ঘরে-মাঠে-হোটেলে-ফুটপাতে শ্রম বিক্রিতে লেগে যায়, নিজের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা করবার জন্য নিজের শিক্ষাজীবন অকালে বিসর্জন দেয়। আর বাকি শিশুরা, যারা রয়ে যায় স্কুলে—মনের আনন্দে নয়—অভিভাবকের চাপে পড়ে স্কুলজীবন চালিয়ে যেতে থাকে।

আমাদের শিশুশিক্ষা বিকাশে—শিক্ষার্থীর সংখ্যাগত আধিক্য, কার্যক্রমের স্থানিক ব্যাপ্তি, প্রাতিষ্ঠানিক পরিসর, সব দিক থেকে অপরাপর ধারা অপেক্ষা সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ও অবদান অনেক বেশি। দেশের তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি শিক্ষার্থী এ ধারার সাথে যুক্ত বিধায়, 'শিশুশিক্ষা'র উন্নতি-অবনতি মূলত এ ধারাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। 'বাংলাদেশ' বলতে যেমন গ্রামকেন্দ্রিক ভূখণ্ডকে বোঝায়, তেমনি প্রাথমিক শিক্ষা বলতে, মোটা দাগে, গ্রামীণ পরিবেশে দীনহীন-শ্রীবর্জিত সরকারি পৃষ্ঠপোষতায় পরিচালিত শিশু শিক্ষাকে বোঝায়।

সরকার নিয়ন্ত্রিত এ জাতীয় শিক্ষার হালহকিকত কেমন? এর এক কথায় উত্তর হতে পারে, ঠিক যেন সরকারের মতন। আমাদের সরকার গরিব, বিধায় তার শিক্ষা কার্যক্রমে বৈভবের দ্যুতি আশা করে লাভ নেই। এ দ্যুতি আসবে কেমন করে? আমাদের সাধ থাকলেও সাধ্য তো বড্ড সীমিত। উন্নত দেশের মতো, এমনকি পাশের দেশ ভারত-শ্রীলঙ্কার মতোও, শিক্ষাখাতে আমরা পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করতে পারি না। ভালো শস্য উৎপাদন করবার জন্য যেমন চাই উর্বর জমি, ভালো বীজ, সার ও কীটনাশকের সময়ানুগ ব্যবহার-সর্বোপরি

www.pathagar.com

উত্তম পরিচর্যা, তেমনি শিক্ষার উত্তম ফল পেতে হলে অর্থ-পরিকল্পনা-শ্রম এবং শিক্ষকদের আত্মিক নিবেদনের বিকল্প নেই।

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সিংহভাগেই অবকাঠামোগত সমস্যা প্রবল। সেখানে না আছে ন্যূনতম সুবিধাযুক্ত ঘর, না আছে খেলার মাঠ, না আছে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, কিংবা পড়াশোনা করবার মতো খোলামেলা পরিবেশ। বেশিরভাগ স্কুলের দেহ মাত্র একটা ঘরেই আবদ্ধ। ঘরের একপাশে শিক্ষকদের বসার জায়গা, অন্যদিকে ছোট ছোট, কোথাও বা খোলা ক্লাসরুম। ক্লাসরুমের চেহারা দেখলে মনে হয়, এগুলো বুঝি গরিব গেরস্থের জীর্ণ ঘর, ঠাসাঠাসি করে কোনোভাবে কাল কাটাতে পারলেই হলো। কচি শিশু, যারা মুক্ত পরিবেশে হৈ-হুল্লোর করতে অভ্যস্ত, স্কুলের বদ্ধ খাঁচায় এসে তাদের দম বন্ধ হবার উপক্রম। সহজাত কারণে তারা এ রকম বন্দিত্বের নিগড় ভাঙতে চায়, চলা ও বলার স্বাধীনতা চায়; শিক্ষকগণ এটাকে ভাবেন উচ্ছৃঙ্খলতা এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে দ্বিধাবোধ করেন না। শাসনপিষ্ট সেই শিশুমন, স্বাভাবিক উচ্ছলতা হারিয়ে ক্রমে ক্রমে নির্জীব হতে থাকে এবং এক সময় পড়াশোনাকে জ্ঞান করে বোঝা হিসেবে। বোঝা সে টেনে যায়, অভিভাবকের চাপে টেনে যেতে বাধ্য হয়, এবং বুঝতেই পারে না, কেউ বোঝায়ও না যে, ওই বোঝার মধ্যে রং-বেরঙের কত কী আনন্দদায়ক উপাদান ছিল।

এক্ষেত্রে শিক্ষককে কতটুকু দোষ দেয়া যাবে? একটা ছোট্ট কক্ষের মধ্যে অগণিত শিশুকে তারা সামলাবেন কী করে? কীভাবে শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন? কখন মনোনিবেশ করবেন পাঠদানে? দেশের জনসংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে স্কুলগামী শিশুর হার। এ প্রেক্ষিতে, স্কুলের শ্রেণিকক্ষের আয়তন রয়ে যাচ্ছে আগের মতোই, যেমন অস্বাস্থ্যকর, তেমনি অপরিসর। অননুকূল পরিবেশে, শিক্ষাদানের ফলবান প্রক্রিয়া কতটুকু আশা করা যায়?

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রায় সবগুলো শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ ছিল, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর আনুপাতিক হার হবে ১ ঃ ৩০ বা এর কাছাকাছি। প্রতিবারই আমরা দেখেছি, সর্বশেষ ২০০৯ সালে কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন কমিশন অনুসারেও দেখছি, সুপারিশকৃত ওইসব সুভাষিত কথা বইয়ের পাতাতেই থেকে যায়, এর বাস্তব প্রয়োগ কোথাও ঘটে না। বস্তুত পরিকল্পনা পেশ করা সহজ, তা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা খুব কঠিন। আমাদের গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলো, যা শিক্ষার্থীতে ঠাসা, এর অধিকাংশ চলে মাত্র দু-চারজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে। সেখানে কবে, কীভাবে ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত ৩০ঃ১-এ উন্নীত করা হবে, এটা কল্পনায় আনাও কঠিন।

www.pathagar.com

তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, প্রত্যাশিত এমন অনুপাত একদিন হয়েই গেল, তখন চার-পাঁচ শত শিক্ষার্থী বিশিষ্ট স্কুলের জন্য শ্রেণিকক্ষের সংস্থান হবে কীভাবে? শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ঠিক করার জন্য যথেচ্ছভাবে শিক্ষক নিয়োগ দিলেই হলো, কাজটা খুব কঠিন নয়। কিন্তু হাজার হাজার স্কুলের জন্য নতুন নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা, আমাদের মতো গরিব দেশের জন্যে অসম্ভব কাজ বৈ কি।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-নিয়োগের যোগ্যতার মাপকাঠি সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্ন আছে। আমাদের শিক্ষা কমিশনগুলোর প্রায় প্রতিটিই অভিমত দিয়েছে, এ পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মেয়েদেরকেই অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছেও। প্রতিটি নিয়োগে, একশো পদের মধ্যে ষাটটি পদে মেয়েদেরকে নেয়া হচ্ছে। ওই নিয়োগের ক্ষেত্রে মেয়েদের আধিক্য নিয়ে কোথাও কোনো বিতর্ক নেই। যত বিতর্কের জন্ম, তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার শিথিলতা নিয়ে। একই পদে আবেদন করতে হলে পুরুষকে গ্রাজুয়েট হতে হবে, আর মেয়েরা কেবল মাধ্যমিক স্কুল সনদধারী হলেই চলবে, নারী-পুরুষের সমতা বিধানের যুগে এটা অদ্ভুত আইন নয় কি?

আমাদের মেয়েরা যখন শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে ছিল, গ্রামের পর গ্রাম খুঁজেও সনদধারী মেয়ে পাওয়া যেত না, তখন না হয় এ আইনের গ্রহণযোগ্যতা ছিল। কিন্তু এখন, ঘরে ঘরে গ্রাজুয়েট মেয়ের অভাব নেই। সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী অসংখ্য মেয়ে ছোটখাটো চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। এ অবস্থায়, সেই পুরনো নিয়মটি বহাল রাখার আদৌ কি প্রয়োজন আছে? তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেই, থাকুক না এ নিয়ম, নিয়োগ পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় কৃশ উন সনদধারীরা এমনিতেই বাদ পড়ে যাবে, টিকে থাকবে কেবল উচ্চ সনদপ্রাপ্তরা। তাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন, আমাদের ধূসর বঙ্কিম সমাজব্যবস্থায় সব সময় যে প্রকৃত মেধাবীরাই চাকরি পায়, এমন কথা কি হলফ করে বলা যাবে? দেশের অন্যান্য চাকরি-নিয়োগে, যেখানে সনদের উচ্চতা ও প্রকৃতিকে প্রাধান্য দেয়া হয়, সেখানে—অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সনদকে যথাযথ বিবেচনায় না আনা, কতটুকু যৌক্তিক সিদ্ধান্ত, তা ভেবে দেখা উচিত।

আমাদের গ্রাম-বাংলার স্কুলগুলোতে, যেখানে উন সনদধারী শিক্ষকদের ছড়াছড়ি, সেখানে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তাদের অধিকাংশ চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণির অঙ্ক-ইংরেজি ক্লাস নিতে অস্বস্তি বোধ করেন। তারা বাড়িতে নোট-গাইডের সহায়তা নেন, তাতেও যখন না কুলায়, ওই সব বই নিয়ে শ্রেণিকক্ষে

www.pathagar.com

যান এবং ভাসাভাসা প্রক্রিয়ায় পাঠ দান সমাপ্ত করে আসেন। তাদের দানকৃত বিদ্যা—শিশুরা শুনল কি শুনল না, অনুধাবন করতে পারল কি পারল না, সেটি খোঁজ করার প্রবণতা কজন শিক্ষকের আছে? এ প্রক্রিয়ায় পাঠদান কতটুকু গ্রহণযোগ্য ও ফলপ্রসূ হতে পারে, তা শিক্ষাসংক্রান্ত কর্তাব্যক্তিদের পর্যালোচনা করা দরকার।

প্রাথমিক শিক্ষাধারায় অধিক হারে শিক্ষিকা নিয়োগ করা হোক—এটা বর্তমান প্রেক্ষিতে যত না যুক্তির কথা—এর চেয়ে অনেক বেশি আবেগি সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্ত না হয় মেনেই নিলাম, কিন্তু পর্যাপ্ত সংখ্যক স্নাতক-স্নাতকোত্তরধারী মেয়েপ্রার্থী পাওয়ার পরও, সর্বনিম্ন সনদধারী, যাদেরকে অফিস আদালতে কেবল চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারি হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়ে থাকে, তাদেরকে শিক্ষা দানের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে সংশ্লিষ্ট না করলেই কি নয়? একজন এসএসসি পাস শিক্ষিকা, তিনি যত মেধাবীই হোন, তার জ্ঞানের ব্যাপ্তি বা পাঠদান প্রক্রিয়ার গভীরতা কোনোভাবেই সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারীর সমমানসম্পন্ন হওয়ার কথা নয়। কয়েক বছর পড়াশোনা করে অর্জিত যে কোনো ডিগ্রি, তা কি কেবল কাগজ মাত্র? এর সাথে জ্ঞান-প্রজ্ঞা-মননশীলতা-অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সামান্য সম্পর্কও নেই? সনদ যদি যোগ্যতার মাপকাঠি বলে বিবেচিত হয়, তাহলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীর ন্যূনতম যোগ্যতা সম্পর্কে নতুন করে ভাবা দরকার।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, প্রাথমিক শিক্ষা হলো পরবর্তী সকল শিক্ষার ভিত্তিমূল। এর ভিত দুর্বল হলে পুরো শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় দুর্বলতার ছাপ পড়ার সম্ভাবনা থাকে। উন্নত দেশগুলোতে, অপরাপর শিক্ষা অপেক্ষা প্রাথমিক শিক্ষার সময়কালকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়, অপরাপর শিক্ষা খাত অপেক্ষা এখানে বেশি বিনিয়োগ করা হয় । শিশুর জ্ঞানতৃষ্ণা-মননশীলতা-মানসিক দৃঢ়তা-অনুসন্ধিৎসা কিংবা চারিত্রিক সততা-অসততা, সকল সু-কু বৈশিষ্ট্য এ সময়টাতেই উপ্ত হয়। এ সময়ের শিক্ষারীতি বা শিক্ষকের মধ্যে যদি গলদ থাকে, তবে শিশুর সঠিক বিকাশ পদে পদে বাধাগ্রস্ত হবে। আমাদের দেশে, অপ্রিয় হলেও সত্যি কথা যে, সার্বিক শিশুশিক্ষা—পরিবারের চৌহদ্দিতে যেমন, তেমনি রাষ্ট্র কর্তৃকও অবহেলিত, অবজ্ঞাসঞ্জাত। আমরা মুখে বলি, 'আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ' অথচ ওই শিশুদের যথাযথ বিকাশের ক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপ না নিয়ে চুপটি করে বসে থাকি, আর মনে মনে তার আলোকিত জীবন প্রত্যাশা করে যাই—এ যেন আমড়া গাছ থেকে আম চাওয়ার মতো হাস্যকর বাসনা।

www.pathagar.com

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি কোন রীতিতে, কী প্রেক্ষিতে, কোন দর্শনের উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়—বুঝে ওঠা মুশকিল। বিভিন্ন শ্রেণির বই, বিশেষত বাংলা বইটি পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, পুস্তক প্রণয়ন কমিটি যেন লেখার মান অপেক্ষা লেখকের নামকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ তারা প্রথমে লেখক নির্বাচন করেন, তারপর ওই লেখকের কোনো একটা লেখা খুঁজে বের করেন। ফলে দেখা যায়, কোনো শ্রেণির বই পরিবর্তিত হলেও, কবি বা লেখক হিসেবে ওই আগের জনেরাই থেকে যান। এতে শিশুরা নতুন লেখা পায় বটে, কিন্তু নতুন কবি-লেখকের সাথে পরিচিত হতে পারে না।

আরো একটা ব্যাপার; শিশু শ্রেণির বিভিন্ন বইয়ে এমন সব বিষয়ের বর্ণনা করা হয় বা ছবি দেয়া হয়, যেমন গরু-ছাগল-মুরগি পালন, মাছধরা, চাষবাস করা, বাসন মাজা ইত্যাদি—বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, বই প্রণেতারা ধরেই নেন, এ সব বই কেবল গ্রাম ও শহরের দরিদ্র শিশুরাই পড়বে। মাকে তারা রান্নাবান্নার কাজে সাহায্য করবে। মাঠে গিয়ে কৃষক বাবাকে ভাত দিয়ে আসবে, ভাইবোন এক সাথে বসে পুতুলের বিয়ে দেবে। তারা কানামাছি বা গোল্লাছুট খেলবে, নদী আর বিলে মাছ ধরতে যাবে। শিশু মনকে উদ্দীপ্ত বা স্বপ্ন দেখাবার জন্য বা তার কল্পনাশক্তিকে প্রসারিত করবার জন্য তেমন কোনো মসলা নেই এসব বইয়ে। এগুলো পড়ে শিশুরা প্রতি বছর ক্লাস ডিঙ্গায় বটে, তবে মনের সৃষ্টিশীলতার প্রসার খুব একটা হয় না। আমাদের শিক্ষকরাও মনে করেন, ভালো ছাত্র মানে ভালো নম্বরপ্রাপ্তি, পড়ার বাইরে অন্যদিকে মন না দেয়া। তারা নিজেরা যেমন জ্ঞান অন্বেষণে বিমুখ, তেমনি তারা শিষ্যদেরকে পুস্তকি বিদ্যার বাইরে নিয়ে যেতে অনিচ্ছুক।

বাস্তবিকপক্ষে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার উচ্চতর পর্যায়ে, খুব ক্ষীণমাত্রার হলেও—বৈশ্বিক ছোঁয়া অদৃশ্যমান নয়। তবে প্রাথমিক শিক্ষার আপাদমস্তক, 'যথা পূর্বং তথা পরং', এতে যুগধর্ম বা বিশ্বায়ন তত্ত্বের কোনো রং-ই লাগেনি। শিক্ষাবিশ্লেষক সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় 'আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার পত্তন ও সম্প্রসারণ পরিকল্পনার মূলে ত্রুটি আছে মনে হয়। দেশের শতাব্দী-সঞ্চিত নিরক্ষরতা দূরীকরণের সংকল্প নিয়ে এই বিদ্যালয়গুলোর সৃষ্টি। সেই সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এগুলো তাদের অস্তিত্বের প্রাথমিক শর্ত অবশ্যই পূরণ করেছে, করছে। মনে হয়, জাতির শিক্ষার বিরাটতর দায়িত্ব এবং ভূমিকার কথা সর্বদা স্মরণে রাখা হয়নি। দায়সারাভাবে দেশের নিরক্ষরতা দূর করলেই এর কাজ শেষ হয় না, প্রতিটি শিশুর ভবিষ্যৎ শিক্ষার বুনিয়াদ রচনার দায়িত্বও এদের, একথা এখন আমরা মাঝেমাঝে অনুভব করি, মুখের ভাষায়

www.pathagar.com

তাকে প্রকাশ করি, কিন্তু এই শিক্ষা ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের সঙ্গে ব্যবহারে তাকে প্রতিফলিত করি না। তাঁর স্কুলকে গোয়াল বলে নাক উঁচু আভিজাত্য দেখাই। তাকেও রাখাল বালকের চেয়ে বেশি সম্মান সব সময় দিই না। ... ...সর্বদা সঙ্কুচিত, ম্রিয়মাণ, অবক্ষয়িত, আত্মবিশ্বাসের শেষ স্তরে উপনীত এই শিক্ষক যন্ত্রের মতো ক্লাসে আসেন, বাঁধাবুলি আওড়ান, পাতার পর পাতা পড়ান, কিন্তু সেই অনুযায়ী অল্পই শেখাতে পারেন। ছাত্রদের মন থেকে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে সেখানে জ্ঞানের আলো জ্বেলে দেবার মতো আগুন এইসব দারিদ্র্য-পীড়িত শ্রমমলিন শিক্ষকের নেই। তাই তারা শুধুই শিক্ষকতা করেন। নেতৃত্ব গ্রহণ করতে, ছাত্রের মনে সাহস, সদাচার ও নেতৃত্বের বীজ অঙ্কুরিত করতে তারা পারেন না' (শিক্ষা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, পৃ-১৪)।

৪. মাদ্রাসাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা : বঙ্গীয় ভূখণ্ডে মাদ্রাসাভিত্তিক শিক্ষার জনক মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দশকে লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়ে তিনি প্রথম মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এ জাতীয় শিক্ষা, তখনকার প্রেক্ষাপটে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অংশ হিসেবে বিবেচিত হতো না। মুসলমান সমাজে, ধর্মকে কেন্দ্র করে মসজিদের বাইরে যে শিক্ষা প্রদান করা হতো, মোটা দাগে তাকেই মাদ্রাসা শিক্ষা বলা হতো। তখন প্রধানত 'শেখদের খানকাগুলো এবং উলেমার আবাসস্থল বিদ্যাশিক্ষা কেন্দ্রে উন্নীত হয়। বাংলায় নির্মিত শত শত মসজিদ সংলগ্ন স্থানে এভাবেই মক্তব ও মাদ্রাসাগুলো গড়ে ওঠে।' (বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড : ড. এম. রহিম, পৃ-৩১৬)।

পরবর্তীকালে, ১৭৮০ সালে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিং-এর সময় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অংশ হিসেবে কলকাতায় আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ৮৬ বছর পর, ১৮৬৬ সালে, পুরোপুরি ইসলামী চেতনার আলোকে ভারতের দেওবন্দে প্রতিষ্ঠিত হয় দারুল উলুম দেওবন্দ, যা বর্তমানে প্রচলিত সকল মাদ্রাসার আদি ও পথিকৃৎ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত। দেওবন্দ-অনুসারী মাদ্রাসা, যা বর্তমানে কওমি মাদ্রাসায় রূপান্তরিত—এর পাঠ্যসূচি মূল প্রতিষ্ঠানেরই অনুরূপ প্রায়, সেখানে সাধারণ শিক্ষার কোনো বিষয় যেমন– বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক ইত্যাদির স্থান নেই। এ শিক্ষা—প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মূল ধারার সাথে সম্পর্কিত নয়, বিধায় এটিকে বিয়োজিত রেখে কেবল সরকার-নিয়ন্ত্রিত মাদ্রাসা শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

মাদ্রাসা শিক্ষার প্রাথমিক পর্বে আছে ইবতেদায়ি স্তর। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত, পাঁচ বছরে মোট ৩৪-৩৬টি বই পড়ানো হয়। এসব বইয়ের

www.pathagar.com

বেশির ভাগই ধর্মীয় আবেগসঞ্জাত। পাঠ্যক্রমে দেশ-সমাজ-বিশ্ববাস্তবতা-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় চরমভাবে অবজ্ঞেয়। এ জাতীয় শিক্ষা শিশুমনে জ্ঞানতৃষ্ণা জাগাতে সক্ষম নয়; তার সৃষ্টিশীলতা-মননশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়। মাদ্রাসার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, তাদের প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ব পরিসর থেকে দূরে সরিয়ে, কেবল যেন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বৃত্তাবদ্ধ করে রাখছেন। অথচ আমরা কে না জানি, মাদ্রাসার আদলে গড়া মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, অক্সফোর্ড ইসলামিক সেন্টার, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়, লক্ষ্ণৌর দারুম-উলুম নাদুয়াতুল উলামা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান শিক্ষাদান ও গবেষণা কর্মের জন্য বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত। মাদ্রাসায় প্রদেয় প্রথাগত শিক্ষা সম্পর্কে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মুহাম্মদ আজিজুল বলেছিলেন 'মুসলমানরা আজকের মতো পশ্চাৎপদ থাকত না যদি মাদ্রাসা শিক্ষাকে সংস্কার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে একে একীভূত করে ফেলা হতো। মাদ্রাসা শিক্ষার অকার্যতা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও নতুন অবস্থায় এই শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে' (রিফ্লেকশন অব দি বেঙ্গল রেনেসাঁস : সফিউদ্দিন জোয়ার্দার, পৃ-৪৯)।

নাদুয়াতুল উলামার মাসিক গবেষণাপত্র 'আলবাস-আল ইসলাম'-এর প্রচ্ছদের বাঁ পাশে লেখা থাকে,

> "সা' আরুনাল ওয়াহিদ ইলাল ইসলামে মিন/ যাদিদ্ আ'লাল মানাহিজে বাইলাল/ কাদিমিস ছালেহ ওয়াল যাদিনিন নাফে'হ।"
>
> অনুবাদ : আমাদের একটাই প্রচারণা যে, আমরা ইসলামে নতুন সংযোজন করব, প্রাচীন যা আমাদের প্রয়োজন এবং আধুনিক যা আমাদের উপকারে আসবে তার সমন্বয়ে।

আমাদের মাদ্রাসার কর্তাব্যক্তিরা বোধহয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ফেলে পরকালকেন্দ্রিক ভাবে বিভোর। তাই তাদের শিক্ষাক্রম, জ্ঞান আহরণ অপেক্ষা বেহেস্তপ্রাপ্তিতে বেশি সচেষ্ট। বাংলাদেশকে একটি বিজ্ঞানমুখী আধুনিক জাতিরাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে হলে, দেশের প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষায় অবশ্যই সংস্কার সাধন করতে হবে। ২০০৯ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'মাদ্‌রাসা শিক্ষায় ইসলাম ধর্ম যথাযথ শেখানো হবে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জীবনধারণ সংক্রান্ত ও বিভিন্ন জাগতিক কাজকর্মে পারদর্শী হয়ে ওঠা ও উৎকর্ষ সাধন করার জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যথার্থ জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা করা হবে। সাধারণ বা ইংরেজি মাধ্যমে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে

www.pathagar.com

প্রতিযোগিতায় তারা যেন সমানভাবে অংশ নিতে পারে সেই লক্ষ্যে মাদরাসা শিক্ষা ঢেলে সাজাতে হবে।' এবং 'শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে অন্যান্য ধারার সঙ্গে মাদরাসা শিক্ষায় অভিন্ন বিষয়সমূহ অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির মাধ্যমে বাধ্যতামূলকবাবে পড়ানো হবে। (অধ্যায় ৬, পৃ-২৭) এ প্রেক্ষিতে কমিশন আরও সুপারিশ করেছে, 'ইবতেদায়ি নির্দিষ্ট শ্রেণির শিক্ষাক্রম অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়সমূহ, অর্থাৎ বাংলা, ইংরেজি, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, গণিত, সামাজিক পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি, তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হবে।' (পৃ- ২৭)।

বস্তুত শিক্ষা কমিশনের সর্বশেষ রিপোর্ট থেকেই অনুধাবিত হয় যে, সমপর্যায়ের অন্যান্য শিক্ষাধরন থেকে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা যথেষ্ট ভিন্ন এবং যুগের প্রেক্ষিতে অনগ্রসর। মাদ্রাসা শিক্ষাক্রম নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন, এমন একজন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ এ প্রসঙ্গে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, 'মাদ্রাসা শিক্ষিতদেরকে আধুনিক জ্ঞান, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি, আধুনিক সমস্যার সঙ্গে পরিচিতকরণের জন্য অরিয়েন্টেশন মাদ্রাসা বা আধুনিকীকরণ মাদ্রাসার প্রয়োজন। এ মাদ্রাসাগুলোর লক্ষ্য হবে মাদ্রাসা শিক্ষিতদেরকে ভাব প্রকাশে, চলনে-বলনে, আচার-আচরণে, ভদ্রতা, শিষ্টাচার, পারস্পরিক যোগাযোগ ইত্যাদিতে পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের সমস্তরে নিয়ে আসা।... মাদ্রাসা শিক্ষিতদের নিজস্ব মেধা দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রয়োগ এবং নিজেদের ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির জন্যও আধুনিকতার সাথে পরিচিতি প্রয়োজন।' (মাদ্রাসা শিক্ষা ঃ এ জেড এম শামসুল আলম, পৃ-১০)

প্রচলিত মাদ্রাসা, যার সিংহভাগ শিক্ষার্থী গরিব ঘর থেকে আগত, কিংবা ধনীর সন্তান হলেও যাদের মধ্যে ইহকাল অপেক্ষা পরকালিন ভাবনা প্রবল, এই 'অভাবী এবং অধ্যাত্মবাদী' ধারা থেকে উক্ত শিক্ষাকে বের করে আনতে হবে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, যেখানে হিন্দু জাতীয়তাবাদ বেশ উগ্র ভূমিকায় দৃশ্যমান, সেখানে—বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষাকে এমনভাবে ঢেলে সাজানো হয়েছে, যার প্রভাবে অনেক প্রতিষ্ঠানে হিন্দু ও মুসলিম ছাত্রের আনুপাতিক হার ক্রমশ সমান হয়ে ওঠছে। ওখানে যদি নির্দিষ্ট একটা ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষাক্রম পরিচালিত হতো, তাহলে দুটি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের সমহারিক সমন্বয় কখনোই সম্ভব হতো না।

পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসায় আলিম স্তর পর্যন্ত যে পাঠ্যসূচি, তা সাধারণ শিক্ষারই অনুরূপ, পার্থক্য কেবল একটিমাত্র ধর্মীয় বিষয়ে। ওখান থেকে

www.pathagar.com

আলিম স্তর উত্তীর্ণদের ৮৫ শতাংশ পরবর্তীকালে সাধারণ শিক্ষার স্রোতে চলে যায় এবং নতুন ধারার সাথে মিশে যেতে তাদের তেমন অসুবিধে হয় না। বাকি ১৫ শতাংশ উচ্চতর ইসলামী শিক্ষায় থেকে যায়। সেখানকার মাদ্রাসাগুলোতে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক বাধা যেমন নেই, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রটিও সব ধর্মানুসারীদের জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত। পশ্চিমবঙ্গ যদি তাদের মাদ্রাসা শিক্ষায় অভূতপূর্ব আধুনিকীকরণ, সহনশীল উদার সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে আমরা পারব না কেন?

৫. কমিউনিটি কিংবা এনজিও পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষা : জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ এর ১২ পৃষ্ঠায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব বেসরকারি বা এনজিও খাতে হস্তান্তর করা যাবে না। কোনো ব্যক্তি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা কোনো এনজিও প্রাথমিক শিক্ষাদানকল্পে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাতে চাইলে তা যথাযথকর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান পালন করে করতে হবে।' এবং 'সাংবিধানিক তাগিদে বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে সমগ্র দেশে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত বিষয়সমূহে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করা হবে।... নির্ধারিত বিষয়সমূহ ছাড়া অন্যান্য নিজস্ব কিংবা অতিরিক্ত বিষয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা অধিদপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে বিভিন্ন ধারায় সন্নিবেশ করা যাবে।'

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখা গেছে, ব্র্যাক বা অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অর্থানুকূল্যে বিভিন্ন শহর, গ্রামে-গঞ্জে-বস্তিতে কমিউনিটি বা এনজিও চালিত স্কুলের ব্যাপক বিকাশ ঘটছে। সমস্যা হলো, এনজিও চালিত স্কুলে শিক্ষকদের মাসিক বেতন-ভাতা যথেষ্ট কম, বিধায় এখানে উপায়ান্তরহীন যুবক-যুবতী ব্যতীত স্বতঃস্ফূর্তভাবে চাকরি করতে কেউ ইচ্ছুক হয় না এবং অন্য কোনো ছোটখাটো চাকরি পাওয়া মাত্র, তারা এ চাকরি পরিত্যাগ করে চলে যায়। তাছাড়া এ ধরনের স্কুলের শিক্ষার্থীরা নিতান্ত দরিদ্র পরিবার থেকে আগত, তাই এখানে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর পরিমাণ খুব বেশি। মোটকথা এনজিও পরিচালিত স্কুলের শিক্ষাদান প্রক্রিয়া বা শিশুশিক্ষার পরিবেশ কিংবা এর মনোনীত নিজস্ব পাঠ্যক্রম—কোনোটিই উচ্চমানসম্পন্ন নয়। তাই এ জাতীয় স্কুলের বিকাশ যত কম হয়, জাতির জন্য তা ততই মঙ্গল।

www.pathagar.com

শিক্ষাসংক্রান্ত সমাধানযোগ্য কতিপয় সমস্যা

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক অনেক সমস্যা আছে, যেমন অবকাঠামোগত সমস্যা, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশগত সমস্যা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আনুপাতিক হারের অসমতা ইত্যাদি; বাংলাদেশের মতো দরিদ্র ও জনবহুল দেশে এ সব সমস্যার সমাধান করা আদৌ সম্ভব কি না, সে প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। তবে এ শিক্ষাধারায় এমন কতগুলো সমস্যা দেখা যায়, যা দূর করা, একটু সতর্ক-সচেতন ও কঠোর হলেই সম্ভব। অবশ্য এ জাতীয় সমস্যা, নিচ থেকে উপর—আমাদের পুরো শিক্ষাব্যবস্থাতেই পরিদৃশ্যমান। যেহেতু এসব সমস্যার কারণে বেশি ক্ষতি হয় শিশুদের, তাদের শিক্ষাগ্রহণ ও মানসিক বিকাশ পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়, তাই শিশুশিক্ষা অংশেই উক্ত সমস্যাসমূহ উপস্থাপন করা হলো।

এক. বানানরীতির জটিলতা : বাংলা ভাষায় লেখা, স্কুল-কলেজের পাঠ্য বইগুলোতে একই শব্দের নানাবিধ বানানরীতির স্বেচ্ছাচারিতা দেখে অবাক হতে হয়। আমাদের এমন পাঠ্য বইও আছে, যেখানে একই শব্দ নূতন, নতুন, নোতুন—এই তিন রকম বানানে পাওয়া যায়। অতি পরিচিত কৃষি যন্ত্রটি লাঙল, লাঙ্গল, কখনো বা লাংগল—এই তিন ধরনে দেখা যায়। বানানটি যেভাবেই লেখা হোক, তাতে যন্ত্রটির ধার আদৌ বাড়ে না, ফলে কৃষকের সুবিধা হয় না কিছুই, তবে শিক্ষার্থী—বিশেষ করে কোমলমতি শিশু-মনস্তত্ত্বের কী পরিমাণ ক্ষতি হয়, এর পরিমাপ করা কঠিন। একই বইয়ে পাখি বা পাখী, বাড়ি বা বাড়ী কিংবা অহঙ্কার বা অহংকার, বানানের বিচিত্র রূপ দেখে শিশুরা খটকায় পড়ে যায় এবং বাংলা (বা বাঙলা) বানান সম্পর্কে বিশৃঙ্খল ধারণায় অনুজ্ঞাত হয়। অনেকেই ভাবতে থাকে, বাংলা বানানে বুঝি নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই, বেশকিছু বানান, নির্দিষ্ট রীতি ব্যতিরেকে, যে কোনোভাবে লেখা যাবে।

বাংলা সাহিত্য চর্চার আদি ও মধ্য পর্যায়ে, এমনকি আধুনিক বলে কথিত সময়কালের প্রারম্ভেও, বানানরীতির স্বেচ্ছাচারিতা শোচনীয়ভাবে প্রকটিত

www.pathagar.com

ছিল। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের আশায়, বাংলা ভাষার সর্বত্র অভিন্ন বানানরীতি প্রচলনকল্পে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে বানান সংস্কার কমিটি গঠিত হয় (১৯৩৫) এবং পর্যাপ্ত গবেষণা-পর্যালোচনার পর 'বাংলা বানানের নিয়ম' নামের একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। সে সময় ওই পুস্তিকায় অনুসৃত কতিপয় বানানরীতি সম্পর্কে অনেকেই যৌক্তিক-অযৌক্তিক অনেক প্রশ্ন তুলেছিলেন। এসব প্রশ্নের সর্বতো গ্রহণযোগ্য মীমাংসা পাওয়া না গেলেও, তখনকার শিক্ষিত সমাজ এবং লেখককুলের সিংহভাগ, ওই বানানরীতিকে যথেষ্ট আমলে নিয়েছিলেন এবং ওই রীতি বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তবে অস্বীকার করবার উপায় নেই, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রবর্তিত বানানরীতিতে একই শব্দের বিকল্প বানানকে শুদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করায়, পরবর্তীকালে তা বাংলা বানানে যথেষ্ট বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত নিয়মে বলা হয়েছিল, যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ-কার থাকে, তাহলে এর তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ-কার, বিকল্পে ই-কার ব্যবহার করা যাবে। অর্থাৎ সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ 'হস্তী'র তদ্ভব রূপ 'হাতী' বা 'হাতি' এ দু'রকম বানানই শুদ্ধ বলে পরিগণিত হবে। তেমনি 'কুম্ভীর'জাত শব্দ 'কুমীর' বা 'কুমির', 'পক্ষী'জাত বলে 'পাখী' বা 'পাখি' দু'ভাবেই লেখা যাবে। মুশকিল হলো শিশুরা যখন দেখে, তার একই বইয়ে একই বানান 'বাড়ি' বা 'বাড়ী', 'শীষ' বা 'শিষ' ভিন্ন জায়গায় ভিন্নভাবে লেখা আছে, তখন তার মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মে যে, বাংলা বানানে ই-কার, ঈ-কার ব্যবহারে বোধহয় কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। শুধু শিশুরাই বা কেন, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া বহু ছাত্রের মুখে, কতিপয় শিক্ষকের মুখেও এ রকম অদ্ভুত কথা হরহামেশাই শুনতে পাই। 'সঙ্গত' বা 'সংগত', 'ভয়ংকর' বা 'ভয়ঙ্কর' প্রভৃতি বানানের দ্বৈত রূপ দেখে 'অঙ্ক' হয়ে যাচ্ছে 'অংক', 'বঙ্গ' হয়ে যাচ্ছে 'বংগ'। বস্তুত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক একই বানানের বিকল্প রূপের স্বীকৃতি বাংলায় প্রচলিত অগণিত শব্দের দ্বৈতসত্তাকে অহেতুক বৈধতা দান করেছে।

বানান সংক্রান্ত জটিলতা, বিশৃঙ্খলা, স্বেচ্ছাচারিতা দূর করবার জন্য এবং বাংলা বানানকে অভিন্ন ও প্রমিতকরণের লক্ষ্যে 'বাংলা একাডেমী' একটা চমৎকার উদ্যোগ নেয় ১৯৯২ সালে। তারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রবর্তিত বানানরীতি পরিবর্তন-পরিমার্জন করে একটা 'প্রমিত রীতি' দাঁড় করাতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বাংলা বানানকে অভিন্ন কাঠামোয়

www.pathagar.com

নিয়ে আসার ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানটিও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি। এর কারণ বহুবিধ। যেমন তারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রণীত 'সন্ধিতে ঙ-স্থানে অনুস্বার' নিয়মটিকে অক্ষুণ্ন রেখে 'সঙ্গীত' 'সংগীত', 'সংখ্যা' 'সঙ্খ্যা' দু' রকম বানানকেই শুদ্ধতার সনদ প্রদান করেছে। ফলে 'বাঙ্গালি' 'বাঙালি' বা 'বাংগালি'—বানান সংক্রান্ত জটিলতা প্রত্যাশিত মাত্রায় হ্রাস পায়নি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, একই বানানের বিকল্প রূপকে উদারভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। বাংলা একাডেমী একই নিয়মের অধীন অনেক বানানকে 'ব্যতিক্রম' অ্যাখ্যা দিয়ে তাদের প্রবর্তিত নিয়ম অনুসরণ করবার ফরমান জারি করেছে এবং লক্ষণীয় ঝামেলা বাঁধিয়েছে নিজেদের প্রতিষ্ঠানের নামের বানান নিয়ে। তারা বলেছে, সকল অ-তৎসম শব্দে কেবল ই-কার বসবে। কিন্তু 'বাংলা একাডেমী'র 'একাডেমী' শব্দে ব্যতিক্রমীভাবে কেবল 'ঈ'-কার হবে। প্রবাদে আছে উত্তম মানুষ নাকি 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়।' এক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর আচরণ স্ব-বিরোধিতায় দুষ্ট।

বাংলা একাডেমী বলেছে, স্ত্রীবাচক সকল অ-তৎসম শব্দে 'ই-কার' বসবে। তবে 'পরী' 'গাভী' বানানে 'ঈ'-কার দেয়া যেতে পারে। ওই 'দেয়া যেতে পারে'র মানে কী? মানে, ও-দুটো বানান 'ই-কার' বা ঈ-কার দিয়ে লেখলে অশুদ্ধ হিসেবে গণ্য হবে না। একাডেমীর মতে, বিদেশি শব্দে -sh, -sion, -tion ইত্যাদি থাকলে ওই শব্দের বাংলা বানানে 'শ' বসবে, অন্যথায় সবক্ষেত্রে কেবল 'স' বসবে। তবে 'পুলিশ' শব্দটিতে ব্যতিক্রমরূপে 'শ' বসবে। আবার বিদেশি শব্দে 'ষ'কে পুরোপুরি পরিত্যাজ্য ঘোষণা করার পরও একাডেমী পরামর্শ দিয়েছে, "'খ্রীষ্ট' বিদেশি শব্দ হলেও, এটি যেহেতু বাংলায় আত্তীকৃত শব্দ এবং এর উচ্চারণ তৎসম কৃষ্টি, তুষ্ট ইত্যাদির মতো, তাই 'খ্রিষ্ট' শব্দটি 'ষ' দিয়ে লেখাই বিধেয়।" আযান, ওযু, নামায, রমযান, মুয়াযযিন প্রভৃতি শব্দে কেউ ইচ্ছে করলে 'য' এর পরিবর্তে 'জ'-ও ব্যবহার করতে পারেন। অর্থাৎ বাংলা একাডেমী এসব বহুল প্রচলিত বানানের ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট বিধান না রেখে, বহু শব্দকে 'ব্যতিক্রমী' অ্যাখ্যা দিয়ে নিজেদের গড়া নিয়মের নিজেরাই ব্যত্যয় ঘটিয়ে, বানান লেখার স্বেচ্ছাচারিতাকে সচেতনভাবে জিইয়ে রেখেছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলা একাডেমীর পণ্ডিত-বিশেষজ্ঞকর্তৃক বানানরীতি প্রণীত হওয়ার পরও আমাদের 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড' নিজেরা কেন নতুন একটা বানানরীতি চালু করতে গেল, তা বুঝে ওঠা মুশকিল। একই দেশে, বেশকিছু ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী দু'টি বানানরীতি

www.pathagar.com

(বাংলা একাডেমীর রীতি ও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড রীতি) দেখে প্রখ্যাত লেখক বিনয় মুখোপাধ্যায়ের (যাযাবর) কথা মনে পড়ে যায়, "দু'জন ইংরেজ একত্র হলে গড়ে একটা ক্লাব, দু'জন স্কচ একত্র হলে খোলে একটা ব্যাংক, দু'জন জাপানি করে একটা সিক্রেট সোসাইটি। দু'জন বাঙ্গালি একত্র হলে করে কী? করে দলাদলি এবং বোধহয় একটু বেশি মাত্রায়ই করে।" (এবং তা করে বলেই বাংলা নববর্ষ দুই বাংলায় ভিন্ন ভিন্ন দিনে পালিত হয়, ইংরেজি ক্যালেন্ডারে এটা কল্পনা করা যায়?)

মজার ব্যাপার হলো, বাংলা একাডেমী তাদের প্রণীত বানানরীতি অনুসরণ করবার জন্য দেশের সকল লেখক, সাংবাদিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, সংবাদপত্র, সরকারি-বেসরকারি অফিসকে অনুরোধ করেছে। অন্যদিকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড তাদের বানানরীতি কেবল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত পাঠ্যপুস্তকে অনুসরণ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অর্থাৎ উল্লিখিত দুটো প্রতিষ্ঠান নিজেদের গড়া বানানরীতি, নিজেদের বলয়ে প্রচার ও প্রসার ঘটাতে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ? ওই দুই প্রতিষ্ঠান, বেশকিছু বানান নিয়ে মত-সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। এ অবস্থায় আমরা, মানে সাধারণ লোকজন কতিপয় শব্দের বানান-শুদ্ধতা নিয়ে বড্ড বিপাকবোধ করছি।

১. বাংলা একাডেমী বলেছে, সন্ধিতে প্রথম পদের শেষে ম থাকলে, ক-বর্গের পূর্বে ম স্থানে অনুস্বার বিকল্পে ঙ লেখা যাবে, যেমন অহংকার, বা অহঙ্কার। কিন্তু জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বলছে, এক্ষেত্রে কেবল ং ব্যবহার করে 'অহংকার', সংগত, সংঘাত ইত্যাদি লেখতে হবে।

২. বাংলা একাডেমী বলেছে, পরী, গাভী ইত্যাদি শব্দে 'ঈ-কার' ব্যবহার করা যেতে পারে (অর্থাৎ 'ই-কারও ব্যবহার করা যেতে পারে)। কিন্তু জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বলেছে, এ-ক্ষেত্রে কেবল 'ঈ' কার ব্যবহার করতে হবে।

৩. আযান-ওযু-নামায-যোহর প্রভৃতি বানান লেখার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী য বা জ দুটো অক্ষরকেই শুদ্ধ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বলেছে, এক্ষেত্রে কেবল য ব্যবহার করতে হবে।

৪. বাংলা একাডেমী বলেছে, 'খ্রিষ্ট' বানান ষ দিয়ে লেখতে হবে। অন্যদিকে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বলেছে এ বানানে অবশ্যই 'স' বসাতে হবে।

www.pathagar.com

এ তো গেল একই বানান নিয়ে দুই প্রতিষ্ঠানের মতদ্বৈধতার কথা। একই বানান নিয়ে একই প্রতিষ্ঠান কী পরিমাণ স্ব-বিরোধী হতে পারে, এর প্রমাণ পাই বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক জিয়াউল হাসানের একটি বিশ্লেষণধর্মী লেখাতে। তিনি দেখিয়েছেন, বাংলা একাডেমী 'ক্ষেত,' খ্রিষ্ট,' 'একাডেমী' প্রভৃতি বানান তাদের বিধান মেনে লেখার আহ্বান জানিয়ে নিজেদের প্রণীত ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে 'খেত', 'খ্রিস্ট' 'একাডেমি' বা অ্যাকাডেমি—বানানের রূপকেও শুদ্ধতার সনদ প্রদান করেছে। (এনসিটিবি'র বানানরীতি বনাম বাংলা একাডেমীর প্রমিত বানান, স্বাক্ষর বুলেটিন, ২০৪ সংখ্যা)। মোল্লা নাসিরউদ্দীন নাকি তার কাছে বিচারপ্রার্থীদেরকে ঠাণ্ডা করবার জন্য বলেছিলেন, দুই আর দুই মিলে চার হয়, এটা যেমন সঠিক—তেমনি দুই আর দুই মিলে পাঁচ হয়, এটাও সঠিক। 'দুটোই সঠিক হয় কীভাবে, সঠিক হবে যে কোনো একটা' উপস্থিত একজনের এমন প্রশ্নের জবাবে মোল্লা সাহেব বলেছিলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার কথাও সঠিক।' তো একই বানানের একাধিক রূপই যদি সঠিক হয়, তাহলে মোল্লা নাসিরের শঠতাকে নিন্দা করব কেন?

এনসিটিবি প্রণীত নতুন বইয়ে, আজীবন দেখা 'শ্রেণী' বানানের 'শ্রেণিচ্যুতি' দেখে চোখে খুব অস্বস্তি লাগে। একটা ঘটনা সবাই কমবেশি জানি, রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা গ্রন্থটি ছাপাবার কাজ যখন চলছিল, কবি হঠাৎ উপলব্ধি করেন 'সঞ্চয়িতা' শব্দটি ব্যাকরণগতভাবে শুদ্ধ নয়। প্রকাশকের সাথে যোগাযোগ করে তিনি যখন জানতে পারেন, বই-তৈরির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে, তখন তিনি 'সঞ্চয়িতা' নামটি শুধরাবার উদ্যোগ নেননি। অর্থাৎ কিছু কিছু ভুল আছে, যা না শুধরালেও ভাষার সতীত্ব নষ্ট হয়ে যায় না। 'শ্রেণী' যে শব্দটি শতশত বছর ধরে আমাদের চোখে গ্রথিত হয়ে গেছে, ব্যাকরণগত পাণ্ডিত্যের সূত্র ধরে এ-কে নিয়ে টানাটানি না করলে কি চলত না? ইংরেজি ভাষায় কত শব্দ আছে, যেগুলো ব্যাকরণগতভাবে অশুদ্ধ। কই তারা তো ওই সব শব্দের শুদ্ধতা বা সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলছে না। বহুল প্রচলিত বানানের ব্যবচ্ছেদ ঘটাচ্ছে না। গ্রহণযোগ্য বিষয়ে খোঁচা দিয়ে তাকে বিতর্কিত করে তোলা—এটা কি আমাদের চিরায়ত অভ্যাসে পরিণত হতে যাচ্ছে?

নতুন পাঠ্যপুস্তকে 'গরু' বানানটি 'গোরু' রূপে দেখলাম। শব্দটি দেখে আবারও মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের কথা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার কমিটির একজন সভ্য কবিগুরুর কাছে প্রস্তাব করেছিলেন, 'গরু' যেহেতু 'গো' শব্দজাত, তাই মূলের স্বকীয়তা ধরে রাখতে 'গরু' না লেখে 'গোরু' লেখলে কেমন হয়? উত্তরে রবীন্দ্রনাথ হেসে বলেছিলেন, প্রস্তাবটা

www.pathagar.com

খারাপ নয়। গ-এর সাথে ও-কার যুক্ত করলে বাংলাদেশের হালকা-কৃশ গরুগুলোকে স্বাস্থ্যহীন মনে হবে না। রবীন্দ্রনাথের তীর্যক রসিকতার কারণে সেদিন গরু'তে ও-কার প্রযুক্ত হয়নি। এবার হয়েছে, পাঠ্যপুস্তক বোর্ড যুগান্তকারী কাজ করেছে বটে। (বস্তুত 'গোরু বানানের নতুনত্বের কারণ সম্পর্কে প্রতিদিনই নানাজন নানারকম প্রশ্ন করছে। ব্যাকরণের সূত্র যা-ই বলুক, পাবলিক মনে করছে, এ রকমটি করা ঠিক হয়নি)। শঙ্কার ব্যাপার হলো, ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকজন স্বল্পপ্রাণ-দীর্ঘপ্রাণ বর্ণ যেমন, তেমনি উ-কার, ও-কার ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারে না। তাদের মুখে 'গুরু' আর 'গোরু' উচ্চারণ, সকল ভেদরেখা অতিক্রম করে কখন যে অভিন্ন রূপ ধারণ করে ফেলবে, কে জানে।

বস্তুত বানান সম্পর্কে জ্ঞানী-গুণী-পণ্ডিত-পণ্ডিতমূর্খের এই শোচনীয় বিরোধ-মতদ্বৈধতা আমাদের শিশুতোষ বইয়ে না ছড়ালেই কি নয়? একই শব্দের একাধিক বানান রূপ দেখে শিশুরা বিভ্রান্ত হয়, সংশয়গ্রস্ত হয়। বানানরীতি সম্পর্কে বিবমিষায় আক্রান্ত হয়। কাজেই তত্ত্ববিতর্কের ধোঁয়াশা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে শিশুতোষ বইয়ে অভিন্ন বানানরীতি অনুসরণ করা উচিত।

দুই. গাইড বই-নোট বই : সরকার ঘোষিত শিক্ষা আইনে প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সকল বিষয়ের নোটবই ও গাইড বইকে নিষিদ্ধ করার কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে। নতুন শিক্ষানীতিতে (২০০৯) বলা হয়েছে, 'প্রচলিত পদ্ধতিতে মূলত মুখস্থ করা বিদ্যা মূল্যায়িত হয়। এটি প্রকৃত মূল্যায়ন হতে পারে না। আসলে মুখস্থ বিদ্যা নয় বরং বিষয়বস্তুকে কতটুকু আত্মস্থ করা হয়েছে, তার মূল্যায়ন করা গেলেই শিক্ষার প্রকৃত মূল্যায়ন করা যাবে।' (পৃ-৫৯) এ প্রেক্ষিতে আরো বলা হয়েছে, 'গাইড বই, নোট বই, প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং প্রভৃতির ফলে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়া ও শিক্ষার মান অর্জন বিশেষ বিঘ্নিত হচ্ছে। এগুলো বন্ধ করার উদ্যোগ নিতে হবে। একদিকে যারা গাইড বই ও নোট বই তৈরি ও সরবরাহ করে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন এবং অন্যদিকে বিদ্যালয় ও কলেজে শিক্ষাদান আরো কার্যকর ও আকর্ষণীয় করার ব্যবস্থা করতে হবে। (পৃ-৬১)

বস্তুত সরকার ঘোষিত নোট-গাইড বই নিষিদ্ধকরণের আইন যেন কাজির গোয়ালের গরুর মতো, যা কেবল কেতাবে আছে, বাস্তবে এর দেখা পাওয়া যায় না। কে না জানে, হাল জমানায় শিক্ষা এখন 'টেক্সট বুক'-এ নেই, এটা

www.pathagar.com

বন্দি হয়ে পড়েছে নোট-গাইডে, আর টিউটর বা কোচিং সেন্টার প্রদত্ত নোটের ভেতরে। যে টেক্সট বইগুলো, সরকারের তরফ থেকে বিনে পয়সায় পাওয়া যায়, শিক্ষার্থীরা দারুণ আগ্রহ নিয়ে সেগুলো সংগ্রহ করে। তবে অধিকাংশ শিক্ষার্থী তা পড়ে না, যত্ন করে রেখে দেয়। কারণ ওসব বইয়ে প্রশ্নের উত্তর কষ্ট করে বের করতে হয়। অথচ গাইড-নোটে, প্রশ্ন হোক না সৃজনশীল বা অন্য যে কোনো পদ্ধতিতে, সকল প্রশ্নের উত্তর সহজভাবে পাওয়া যায়। কাজেই সহজপ্রাপ্ত সমাধান ফেলে, কে যায় কষ্ট করে কেষ্ট মেলাতে? ছবির মধ্যে যদি অতি সহজে প্রার্থিত দেবতার দেখা পাওয়া যায়, তাহলে ক'জন যায় বাউল-সন্ন্যাসী হয়ে পথে ঘুরে ঘুরে ঈশ্বর খোঁজতে?

নোট বই শিক্ষা জগৎকে কোন শোচনীয় দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এর সর্বনাশা চিত্রটি প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের লেখাতে। (সে-সময় পশ্চিম বাংলায় গাইড বইয়ের প্রচলন শুরু হয়নি, বিধায় তাঁর লেখায় গাইড বই প্রসঙ্গটি আসেনি; তবে তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্যে বাজারি নোট বই বিষয়ে যে মতামত দেয়া হয়েছে, তা আমাদের দেশে প্রচলিত নোট, গাইড বই সম্পর্কে সমভাবে প্রযোজ্য।) চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে, 'বিয়ের চেয়ে বাজনা বেশি, ব্যাধির চেয়ে আধি বড়, এই প্রবাদ বাক্যগুলি যখন প্রথম চালু হয়, তখন মনে হয়, একদিক থেকে আজকের অবস্থা ছিল না। থাকলে, বইয়ের চেয়ে নোট বড় এমনতরো একটি কথা, এদের পাশাপাশি কোনোমতে নিজের জন্য একটু ঠাঁই করে নিত।'

'লেখাপড়ার মাঠে নোট বইয়ের চোরকাঁটা আজকের নয়, বরাবরের।... এখন তৃতীয় শ্রেণিতে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে সরকার বাহাদুর ছাত্রের এক হাতে একটি কিশলয়, আরেক হাতে দোকানদার গুরুভার একটি নোটবই তুলে দেন। এবং এই নোটের জোয়াল সমগ্র শিক্ষাজীবনে ছাত্রের কাঁধ থেকে নামে না। বিএ, এমএ ক্লাসের ছাত্রদের জন্য টাইপ করা নোটের চলন অনেকদিনের। এখন আবার কোনো কোনো বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ছাপানো বইও বেরিয়েছে, শুনতে পাই এই ছাত্র পাস করে যখন অধ্যাপনা করেন, তখনও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তিনি ছাত্রজীবনের নোটগুলির বাইরে যান না। তাই বলা যায়, এখন ছাত্র শিক্ষক উভয়পক্ষই নোটের ভিতর দিয়ে শিক্ষা-ভুবনকে দেখেন।' [শিক্ষা অশিক্ষা কুশিক্ষা, পৃ-১৩৮]।

আমাদের দেশে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত, সকল নোট-গাইড নিষিদ্ধকরণের সরকারি আইন থাকা সত্ত্বেও, বাজারে এসব বইয়ের ছড়াছড়ি কেন? সরকার কি জানে না, এসব বই কোথায়, কীভাবে উৎপাদিত হয়? এ উৎপাদন

www.pathagar.com

প্রক্রিয়ার সাথে কারা কারা যুক্ত? উৎপাদিত ফসল কোথায় বিক্রি করা হচ্ছে? বস্তুত এসব প্রশ্নের উত্তর আমজনতাও জানে; কারণ, ওই উৎপাদনকারীরা নিজের পরিচয়, ঠিকানা গোপন না করে সদর্পে এ কাজ করে যাচ্ছে। রাজধানী থেকে মফস্বলি বাজার, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া—সর্বত্র ওদের সরব-সক্রিয় উপস্থিতি। আইন ভঙ্গের দায়ে তারা কখনো গ্রেপ্তার হয়েছে, জেলে গিয়েছে বা জরিমানার সম্মুখীন হয়েছে, এমন খবর বিরল। যে আইন কেবল কাগজে সীমাবদ্ধ, ধূসর-মলিন, বাস্তবে প্রয়োগবিহীন, সে আইন থাকা না থাকা সমান কথা নয়?

ক'দিন আগের একটা পরিসংখ্যান থেকে জানা গেল, স্কুল-পাঠ্য টেক্সট বই ছাপাতে যে অর্থ বিনিয়োগ করা হয়, এর সাড়ে তিন গুণ বেশি বিনিয়োগ করা হচ্ছে নোট-গাইড বই প্রকাশের ক্ষেত্রে। শহর বা গ্রামের অধিকাংশ লাইব্রেরির সামনের 'স্পেস' অপেক্ষা পেছনটা অনেক বড়। ওই পেছনের অংশটা গাইড-নোটে ঠাসা। ক্রেতার চাহিদা অনুসারে ওখান থেকে বই সরবরাহ করা হয়। সেখানে কত অভিজ্ঞ শিক্ষকের (?) কত বিচিত্র রকমের বই যে আছে, না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

কথা হলো স্কুল পড়ুয়া শিশুরা, নিজেরা কি নোট-গাইড বই চেনে? তারা কি জানে যে, ওসব বইয়ে 'রেডিমেট' উত্তর পাওয়া যায়? নিশ্চয়ই নয়। তাহলে ওই সব ক্ষতিকর বই তাদেরকে চেনায় কে? অভিভাবক বা শিক্ষকবৃন্দ নয়? আমাদের দেশের অধিকাংশ অভিভাবক অশিক্ষিত। পঠনপাঠন বিষয়ে সন্তানকে সাহায্য করতে বা তার পড়া তৈরি করে দিতে তারা অসমর্থ। কাজেই তারা শিশুসন্তানের পাঠ-সমস্যার সহজ সমাধান খোঁজেন গাইড কিংবা নোট বইয়ে। অন্যদিকে অধিকাংশ শিক্ষক, এক্ষেত্রে প্রেরণাদাতার ভূমিকা পালন করেন। দেশে তো এমন শিক্ষকের অভাব নেই, যারা নিজেরাই নোট বই, গাইড বইয়ের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। তাছাড়া অনেক ডাক্তার যেমন বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত হয়ে নির্দিষ্ট ওষুধ কোম্পানির স্বার্থ দেখেন, কর্পোরেট যুগে শিক্ষকরাই বা পিছিয়ে থাকবেন কেন? তারাও নোট-গাইড বইয়ের প্রকাশনী থেকে অবস্থান অনুসারে নুন খান, বিনিময়ে ওদের পক্ষে গুণ গেয়ে যান।

বইয়ের দোকানে বা শিক্ষার্থীদের হাতে লোভনীয় গ্যারান্টিযুক্ত নানা বর্ণের বাহারি নোট-গাইড বই দেখে রীতিমতো অবাক হতে হয়। কোনো বইয়ে শতভাগ সাফল্যের নিশ্চয়তা দেয়া আছে। কোনোটাতে আছে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ গড়ে দেবার অঙ্গীকার। কিছু বইয়ে রঙিন হরফে লেখা থাকে 'শুধুমাত্র 'এ প্লাস' প্রত্যাশীদের জন্য।' সরকার বা শিক্ষা মন্ত্রণালয় মুখস্থবিদ্যার ধারা

www.pathagar.com

থেকে কিংবা নোট বই, গাইড বই থেকে শিক্ষার্থীকে বিমুখ করবার জন্য যত চেষ্টাই করুক, যত আইনি হুমকিই দিক বা নতুন শিক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগ করুক—ও-সব বই যথাসময়ে স্বমহিমায় হাজির হয়ে যাচ্ছে এবং শিক্ষার্থীর মগজে নতুনভাবে অবস্থান নিয়ে নিচ্ছে। এসব 'রেডিমেড' বই পড়ে পড়ে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা নামক বৈতরণী পার হচ্ছে এবং বলা যায় ভালো রেজাল্টসহ পার হচ্ছে। ওদের আপাত উজ্জ্বল রেজাল্ট দেখে ঘর কিংবা বাইরের লোকজন তো মহাখুশি। পত্রিকার পাতাগুলোও আনন্দে গদগদ; ব্যবসায়িক বিবেচনা মাথায় রেখে বর্তমান বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেকটি পত্রিকা নিজেরাই পরিণত হয়েছে নোট কিংবা গাইড বইয়ে। বিভিন্ন পাঠ্য বইয়ের প্রশ্ন এবং উত্তরের ডালা সাজিয়ে, ভালো নম্বরপ্রাপ্তির সহজ উপায় বাতলে দিয়ে, পরীক্ষার আগে আগে 'সাজেশন' ছাপিয়ে পত্রিকাগুলো স্বধর্ম বিসর্জন দিয়েছে এবং কোমলমতি শিক্ষার্থীদেরকে মূল বইয়ের ভেতর থেকে টেনে আনছে নিজেদের শিক্ষাসায়রে। না পত্রিকা, না সুধীজন কিংবা শিক্ষাবিদ—কেউ ভাবছেন না যে, মুখস্থ মানে আত্মস্থ নয়, পরীক্ষায় ভালো করা মানে মেধার ভালো বিকাশ নয়। মেধা বিকাশের জন্য পাঠ্য বই যেমন, তেমনি চারপাশ সম্পর্কে সচেতন হতে হয়। কিন্তু গাইড বই, নোট বই শিক্ষার্থীদের চিন্তাজগৎকে আড়াল করে দিয়ে ওদেরকে কূপমণ্ডূক করে তুলছে, ওদেরকে কেবল নম্বরার্থী বানাচ্ছে এবং ওদের চিন্তার স্বকীয়তাকে ধীরে ধীরে নষ্ট করে ফেলছে।

শিশুচিত্তকে সমৃদ্ধ করতে হলে তার ভেতরের জগৎকে জাগাতে হবে, তার অন্তঃসত্তায় আগ্রহের বীজ রোপণ করে দিতে হবে। গাইড-নোট, যা সকল প্রশ্নের সমাধান দিয়ে শিশুকে চিন্তাচর্চা থেকে বিরত রাখছে, অথবা তার চিন্তনপ্রক্রিয়াকে সীমিত পরিসরে বন্দি করে রাখছে, এর মূলোৎপাটন করতে না পারলে আমরা কেবল সনদধারী প্রজন্ম পাব, যাদের ভেতর-বাইরে থাকবে না চিন্তার মৌলিকতা, বোধের স্বকীয়তা। অর্থাৎ আমাদের সন্তানরা কেবল কাগুজে সনদে সজ্জিত হবে, দূরে থাকবে জ্ঞানের আলো থেকে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি রবীন্দ্রনাথকে :

পাখিটা মরিল। কোন কালে যে কেউ তা ঠাহর করিতে পারে নাই।
নিন্দুক লক্ষ্মীছাড়া রটাইল, "পাখি মরিয়াছে।"
ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, "ভাগিনা, একি কথা শুনি?"
ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পুরো হইয়াছে।"
রাজা শুধাইলেন, "ওকি আর লাফায়?"
ভাগিনা বলিল, "আরে রাম;"

www.pathagar.com

"আর কি ওড়ে?" —"না।"

"আর কি গান গায়?" —"না।"

"দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়?" —"না।"

রাজা বলিলেন, "একবার পাখিটাকে আন দেখি।"

পাখি আসিল, সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়-সওয়ার আসিল। রাজা পাখিটাকে টিপিলেন। সে 'হাঁ' করিল না, 'হুঁ' করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্‌খস্ গজ্‌গজ্ করিতে লাগিল।"

বস্তুত গাইড-নোটবই নির্ভর আনন্দবর্জিত মুখস্থবিদ্যা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রবীন্দ্রনাথ কথিত ওই পাখির মতো নিষ্প্রাণ কিংবা মেধাহীন মানুষে পরিণত করছে।

তিন. প্রাইভেট এবং কোচিং : একটা উদ্ধৃতি সহযোগে লেখাটা শুরু করা যাক, "রোজ ভোরে ছ'টা নাগাদ, আমার বাড়ির নিচের রাস্তাটা একঝাঁক কচিকণ্ঠের কলকোলাহলে মুখরিত হয়ে ওঠে। আমার ঝুল-বারান্দা থেকে উঁকি মারলে দেখতে পাই, অন্তত সাত-আটটা ছেলেমেয়ে ...চলেছে, ভোর না হতেই, টিউশনি পড়তে। এদের মা জননীরা আরো ভোরে উঠে হরলিকস বা কর্নফ্লেক্স খাইয়ে দিয়েছেন। ...এরা সবাই, এবং অন্যান্য সব নগর-শহরে-গ্রামে, এমন ভোরে, আরও অনেকে টিউশনি পড়তে যায়, একা কিংবা দল বেঁধে।" (লেখা পড়া করে যে : সুধীর চক্রবর্তী, পৃ-৮১)। এটা পশ্চিম বাংলার একটা শহরের, প্রায় এক যুগ আগের চিত্র। বর্তমানে সে চিত্র নিশ্চিতভাবে বদলে গেছে, দলের সদস্য সংখ্যা যেমন, তেমনি বেড়েছে ওই কর্মের ব্যাপ্তি।

ছোট-বড় সব শহর, এমনকি গ্রামাঞ্চলেও হরহামেশাই দেখা যায়, শিক্ষকের বাসায় একদল শিক্ষার্থী গাদাগাদি করে বসে প্রাইভেট পড়ছে, আর একদল বাইরে অপেক্ষা করছে কখন ভেতরের ওরা বেরোবে, আর নিজেরা যাবে ভেতরে। সংশ্লিষ্ট টিউটর, তিনি যদি হন কোনো প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, তাহলে কর্মকালীন সময়ের কিছু অংশ বিরতি দিয়ে ভোর থেকে মধ্যরাত অবধি শিক্ষাদান করে যান। আর তিনি যদি অন্য কোথাও চাকরি না করেন, যদি থাকেন নিখাদ চাকরিবর্জিত, তাহলে তার বিরতিকাল, নিজের ইচ্ছের উপর নির্ভর করে থাকে। বস্তুত আমাদের প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিকক্ষগুলোতে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি আশাপ্রদ নয়, তবে তারা ঝাঁক বেঁধে প্রাইভেট পড়তে গিয়ে শিক্ষকের বাসাকে 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই' ধ্বনিতে মুখরিত করে রাখে।

www.pathagar.com

অন্যদিকে দেখতে পাই, কোনো কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বা অন্য কোনো সুদৃশ্য ঘরে, স্কুল সময়ের বাইরে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে খুব সকালে, বিকেলে বা সন্ধ্যায় যেন নতুন একটা স্কুল বসেছে। অগণিত শিক্ষার্থী, ঠাসাঠাসি করে বসে শ্রেণিকক্ষের চেয়ে অধিক মনোযোগী হয়ে পাঠগ্রহণ করছে, এবং পাঠান্তে প্রায় প্রতিদিনই পরীক্ষায় বসছে। শতকরা হারের নিরিখে, শ্রেণিকক্ষ অপেক্ষা এখানে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি অনেক বেশি, অনুপস্থিত নেই বললেই চলে এবং যে শিক্ষকগণ সাধারণ শ্রেণিকক্ষে নীরস ও নির্জীব, যন্ত্রের মতো কথা বলে যান, এখানে তারা খুবই প্রাণবন্ত, পাঠদানে অনেক বেশি যত্নশীল। এখানে তারা হেসে হেসে কথা বলেন, শিক্ষার্থীর সমস্যাগুলো মন দিয়ে শোনেন, প্রতি বিষয়ের নোট কিংবা সাজেশন দেন। একই যুবক, স্ত্রী আর প্রেমিকার কাছে যেমন ভিন্নরূপে আবির্ভূত, এখানকার শিক্ষকরাও তেমনি, চাকুরির প্রতিষ্ঠানে একরকম, আর কোচিং সেন্টারে একেবারে আলাদা রকম।

ক'বছর আগেও গ্রামের শিশুরা প্রাইভেট বা কোচিং সেন্টার এ-শব্দদ্বয়ের সাথে পরিচিত ছিল না। প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী শিশু, যারা বৃত্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হতো, তাদের কেউ কেউ নিতান্ত নিরুপায় হলে দু-চারটে অঙ্ক কিংবা ইংরেজির জন্য শিক্ষকের শরণাপন্ন হতো। কিন্তু এখন শহুরে হাওয়ায় গ্রাম গিয়েছে ভেসে; তাই গ্রামে-গঞ্জে, শহরের অলিতে গলিতে সমান তালে আকর্ষণীয় মোড়কে নাম ও মোবাইল নম্বরসহ দেখা যায়, 'এখানে দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে... শ্রেণি পর্যন্ত অতি যত্ন সহকারে পড়ানো হয়।' 'অমনোযোগী শিশুদেরকে গ্যারান্টিসহ পড়ানো হয়।' ' সন্তান আপনার, তাকে মানুষ করবার দায়িত্ব আমাদের।' 'অভাবনীয় সাফল্যে.....বর্ষে পদার্পণ।' ' কোচিং জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাম ... ...।' 'হ্যান্ডনোটসহ সকল বিষয় পড়ানোর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান...।' ' আমরা কথায় নয় কাজে বিশ্বাসী, আমাদের গত... বছরের ফলাফল দেখুন, সঠিক সিদ্ধান্ত নিন।' 'আপনার শিশুকে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় সফল দেখতে চাইলে ভর্তি করুন...প্রতিষ্ঠানে।' 'আদর-স্নেহ দিয়ে পড়ানো হয়'। 'সৃজনশীল পদ্ধতির যথার্থ প্রয়োগসহ পড়ানো হয়'– ইত্যাদি ইত্যাদি। বস্তুত আমাদের অধিকাংশ অভিভাবক অসচেতন, পড়াশোনার ধরন-গড়ন সম্পর্কে অজ্ঞ। তাই তারা প্রাইভেট টিউটর বা কোচিং সেন্টারের মনোলোভা বিজ্ঞাপনে প্রভাবিত হয়ে সন্তানকে ওইদিকে ঠেলে দেন, তা কিন্তু নয়—দেন তার নিজের অভীপ্সা থেকে, চারপাশ ভালো করে যাচাই-বাছাই করে। বাঙালির মেধা কম থাকতে পারে, তাই বলে তারা কম চালাক, এমনটি ধারণা করবার কারণ নেই।

www.pathagar.com

আমাদের শিশুরা কেন যায় কোচিং সেন্টারে বা গৃহশিক্ষকের কাছে? এর আপাত কারণ হতে পারে চারটি : ১. অনেক শিশুর পিতামাতা পুরোপুরি অশিক্ষিত। সন্তানকে পাঠ নির্দেশনা দেয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। ওইসব পিতামাতা নিতান্ত বাধ্য হয়ে নিজের সন্তানকে পাঠান প্রাইভেট টিউটর বা কোচিং সেন্টারে। সেখানে তারা কী পড়ে, কেমন পড়ে, সেটা জানবার সুযোগ কম—অবশ্য জানার ব্যাপারে সনিষ্ঠও নন তারা। সন্তানের জন্যে চেষ্টা করেই তাদের তৃপ্তি, সংসার চালাতে কষ্ট হলেও 'পড়ার জন্য ব্যয়' করতে দ্বিধা করেন না তারা।

২. অনেক পিতামাতা, যারা নিজেরা শিক্ষিত এবং ধনগর্বে স্ফীত, তারা সন্তানের অধিক সাফল্য সুনিশ্চিত করবার জন্য তাকে পাঠান কোচিং সেন্টারে বা প্রাইভেট টিউটরের কাছে। তারা নিজেরা শিক্ষিত হলেও সন্তানকে দেবার মতো সময় তাদের হাতে নেই। তারা বিদ্যা কিনতে টাকা ঢালতে দ্বিধাহীন। একাধিক টিউটর, কোচিং সেন্টার, যেখানে যতো টাকা লাগুক, সন্তানের ভালো রেজাল্ট তাদের চাই-ই চাই। এ কাজে সন্তানের পিতার ভূমিকা যত না সক্রিয়, এর বহুগুণ সক্রিয় তার মায়ের ভূমিকা।

৩. আমাদের দেশে এমন শিক্ষক বিরল নয়, যারা শিশুকে বাধ্য করেন প্রাইভেট পড়তে, কিংবা নিজেদের গড়া কোচিং সেন্টারে যেতে। গ্রামে, গঞ্জে, শহরে—বহু শিক্ষককে দেখেছি, যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিক্ষার্থীকে বলে দেন, 'আমার সাবজেক্টে ভালো নম্বর পেতে চাও? তাহলে প্রাইভেট পড়তে এসো।' কিংবা 'আমাদের কোচিং সেন্টারে না পড়লে ভালো রেজাল্ট আশা করো কীভাবে?' নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, আর্ট টিচারের সাথে যোগাযোগ না রাখলে, পরীক্ষার খাতায় আঁকা যত ভালোই হোক, নম্বর তেমন পাওয়া যায় না। 'অঙ্কন' জিনিসটা জীবন সাজাবার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ না হোক, শিশুদের পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণে এর ভূমিকা অপরিসীম। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় ভালো রেজাল্টের বড় নিয়ামকের নাম 'যোগাযোগ।' সে যোগাযোগ রক্ষিত হয় প্রাইভেট বা কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে।

৪. 'আগে একটা ক্লাসে চল্লিশ জন ছাত্রছাত্রী থাকত। মাস্টার মশাইরা তাদের খবরদারি করতে পারতেন। এখন প্রতি সেকশনে আশি থেকে একশো স্টুডেন্ট। মফস্বলে বা কলোনি অঞ্চলে কোনো কোনো স্কুলে দেড়শো থেকে দুশো ছাত্র বা ছাত্রী এক সেকশনে। ভাবা যায়? ছাত্র শিক্ষকের বাঞ্ছিত অনুপাত এতে কি থাকছে? কাজেই লাগবে টিউটর, কারণ ক্লাসরুমে পড়িয়ে পুরো

www.pathagar.com

সিলেবাস শেষ করা সম্ভব নয়। সব অঙ্ক শেখানোর কল্পনাও অবান্তর' (লেখাপড়া করে যে : সুধীর চক্রবর্তী, পৃ-১২২)। অগত্যা প্রাইভেট পড়া বা কোচিং সেন্টারে না গিয়ে উপায় কী?

আমাদের শিক্ষকগণ, যদি শ্রেণিকক্ষে ভালো পড়াতেন, শিক্ষার্থীর প্রতি যত্নবান হতেন, তথা শিক্ষাদানে নিখাদ সমর্পিত থাকতেন, তাহলে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট বা কোচিংয়ের শরণাপন্ন হতে হতো না। তাদেরকে গাইড বই, নোট বইয়ের দ্বারস্থ হতে হতো না। কিন্তু কারবারি যুগে, তা-ও আবার আপাদমস্তক দুর্নীতিতে নিমজ্জিত একটি দেশে, যেখানে দুধে পানি, চালে কাঁকর, চিনিতে লবণ মেশানো প্রায় অভ্যাসগত বিষয় হয়ে গেছে, সেখানে ওই সমাজেরই একটা অংশ, শিক্ষকদের কাছ থেকে সাধু প্রত্যাশা জানিয়ে লাভ কী? সবাই যখন বৈধ-অবৈধ সব উপায়ে বাড়তি ইনকামে মরিয়া, তখন শিক্ষককুলের অনৈতিকতাকে বড়জোর 'দোষ' বলা যেতে পারে, একে ধিক্কার জানানো সঙ্গত হবে না।

খুব দূর-অতীতের কথা না হয় বাদই দিলাম, দুই তিন দশক আগের কথাই যদি বলি, তখনকার একজন শিক্ষকের সামাজিক দায়বদ্ধতা, আর তাঁর প্রতি সমকালীন ছাত্র বা সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি—কালগত ব্যবধানে দুটো পক্ষের মধ্যে নীতিগত পরিবর্তন হয়েছে কার বেশি? একটা উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে উত্তরটি খুঁজে নেয়ার চেষ্টা করি, 'একজন শিক্ষকের ভাবসম্পদ পঁচিশ বছর আগে যা ছিল, এখন তা নেই। তিনি তখন জানতেন, সমাজে তাঁর জীবন্ত ভূমিকা ছিল, যেমন আর কারও ছিল না। তিনি মানুষ গড়ার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি জাতীয় শক্তির ভিত্তি স্থাপন করতেন এবং সেই ভিত্তির উপর ভবিষ্যতে প্রাসাদ ইত্যাদি নির্মিত হতে পারত। একজন শিক্ষক এখনও মোটামুটি সেই একই কাজ করেন, কিন্তু সেই বোধ নিয়ে করেন না।... তাঁর শ্রম যেহেতু প্রেমের নয়, অধিকাংশই পণ্ডশ্রম। তিনি ক্লাসে যান এবং পড়ান। কিন্তু খুব কমই শেখাতে পারেন। কেননা, শেখাতে গেলে, যাদের শেখাবেন তাদের গ্রহণ করবার মতো মনোভাব আগে থাকা প্রয়োজন।... শিক্ষক কথা বলেন,... ছাত্র কথাগুলো শোনে, কিন্তু তার মনে কোনও ছাপ পড়ে না। ক্লাসে বাধ্য হয়ে ছাত্রশিক্ষক মিলিত হন এবং তারপরই পশ্চাদপসরণ করতে শুরু করেন। এবং পশ্চাদপসরণের সময় তাঁরা তাঁদের মিলনের কোনও চিহ্ন রেখে যান না। পরস্পরের কাছে তাঁরা অজ্ঞাত, প্রায় অজ্ঞেয় থেকে যান' (শিক্ষা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা : সুনীল চট্টোপাধ্যায়, পৃ-১৪৪)।

www.pathagar.com

চার. গ্রন্থাগারের অভাব : উন্নত দেশগুলোতে গ্রন্থাগারবিহীন বিদ্যালয় কল্পনা করা কঠিন। বিদ্যালয়গামী শিশুরা কেবল পাঠ্যপুস্তকে ডুবে থাকবে, শিক্ষার নির্দিষ্ট বৃত্তে আবদ্ধজীবন নিয়ে পড়ে থাকবে, এমন ধারণা আধুনিক শিক্ষা মনস্তত্ত্বে পুরোপুরি অচল। গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরির গুরুত্ব সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর অভিমত প্রণিধানযোগ্য : 'আমার মনে হয়, এদেশে লাইব্রেরির সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয়, এবং স্কুল কলেজের চাইতে কিছু বেশি। এ কথা শুনে অনেকে চমকে উঠবেন, কেউ কেউ আবার হেসেও উঠবেন। কিন্তু আমি জানি, আমি রসিকতাও করছিনে, অদ্ভুত কথাও বলছিনে।.....আমার বিশ্বাস, শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত।...আমি লাইব্রেরিকে স্কুল কলেজের উপরে স্থান দিই এ কারণে যে, এ স্থলে লোকে স্বেচ্ছায়, স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বশিক্ষিত হবার সুযোগ পায়। প্রতি লোক তার স্বীয় শক্তি ও রুচি অনুসারে নিজের মনকে নিজের চেষ্টায় আত্মার রাজ্যে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।.....আমাদের শিক্ষার বর্তমান অবস্থায় লাইব্রেরি হচ্ছে এক রকম মনের হাসপাতাল' (বইপড়া, প্রবন্ধসংগ্রহ, পৃ-১২২-১১৩)।

বস্তুত শিশুর মেধা-মননকে সমৃদ্ধ-শানিত-পরিশীলিত করবার জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থায় তাকে প্রচুর পরিমাণে গল্প কিংবা উদ্দীপনমূলক বই পড়তে দেয়া হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষারই বাড়তি অনুষঙ্গ হিসেবে এ ধরনের বই সরবরাহ করে। কে কোন বই, কতটুকু পড়ল—তাও যাচাই-বাছাই করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে কোনো শিশু শিক্ষালয়ে গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব নেই। যদি বিরলভাবে কোথাও থেকেও থাকে, সেখানে ওইসব বই নিয়ম করে পড়াবার রীতি গড়ে ওঠেনি, বরং স্কুলপাঠ্য বই ছাড়া অন্য বই পড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদেরকে প্রবলভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার এই দীনহীন রূপ দেখে আক্ষেপ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ :

'বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক, তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোন মতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু মনের বিকাশলাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে, কিন্তু আহারটি রীতিমত হজম করিবার জন্য হাওয়ার দরকার। তেমনি একটি শিক্ষা পুস্তককে রীতিমত হজম করিতে অনেকগুলি অপাঠ্য পুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। ইহাতে আনন্দের সহিত পড়িতে পারিবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গ্রহণ শক্তি,

www.pathagar.com

ধারণা শক্তি, চিন্তা শক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে ফললাভ করে।'

আমরা সচেতনভাবে শিশুর কাছ থেকে অপাঠ্য পুস্তককে দূরে রাখি। আমরা অনেকেই ভাবি, অপাঠ্য বই পড়লে শিশুরা বুঝি নষ্ট হয়ে যাবে। ও-সব বই নিয়ে পড়ে থাকলে, সে পরীক্ষায় ভালো করতে পারবে না। আমাদের কাছে পরীক্ষার ফলই আসল, শিশুর মনশ্চক্ষু—যা দেখা যায় না, বোঝা যায় না—এর বিকাশ অবিকাশ একেবারেই মূল্যহীন। বস্তুত শিশুর আনন্দময় পাঠের পরিসর সীমাবদ্ধ করে, তার উপর কেবল পাঠ্যপুস্তক চাপিয়ে দিয়ে আমরা তার চিন্তার পথকে যেমন সরু ও চিকন করে রাখছি, তেমনি তার সহজাত মননশীলতাকে বন্দি করছি একটা নির্দিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ বৃত্তে।

পাঁচ. তথ্য বা ইতিহাস বিভ্রান্তি : কচি শিশুরা সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করে বইয়ের কথা। শিক্ষকের কথা। আমি বহু শিশুকে বইয়ে লেখা, বা শিক্ষক পরিবেশিত ভুল তথ্য আঁকড়ে ধরে তর্ক করতে শুনেছি, 'বইয়ে আছে এ-রকম (কিংবা স্যার বলেছেন এ-রকম); আর তুমি বলছো ও-রকম। তুমি কি বই বা স্যারের চেয়ে বেশি জানো?'

শিশুর দোষ কী? তার কাছে ছাপার অক্ষরের মূল্য অপরিসীম। বই পরিবেশিত তথ্যকে সে অভ্রান্ত অখণ্ডনীয় বলে জানে এবং মানে। ওই বই যদি তাকে ভুল তথ্য দেয়, কিংবা বিভ্রান্তিকর ইতিহাস শেখায়, তাহলে তার কী করার আছে? বাজারের কিছু বই, যা যথাযথ কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিবন্ধিত নয়, অনেক শিশুবিদ্যালয়ে সে ধরনের বই বিচ্ছিন্নভাবে পাঠ্য করা হয়। ওসব বইয়ে তথ্যবিভ্রান্তির শেষ নেই। কিন্ডার গার্টেন, মাদ্রাসা বা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, যেখানে সরকারি নজরধারি অপেক্ষাকৃত কম, সেখানে বিকৃত তথ্য সংবলিত বই পাঠ্য করতে প্রায়ই দেখা যায়। বিস্ময়কর কাণ্ড এই যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার হাত বদলের সাথে সাথে আমাদের রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত বা নির্বাচিত অনেক বইয়ের অনেক তথ্য ব্যাপকভাবে বদলে দেয়া হয়। একই বিষয়ে, সময়ান্তরে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য পরিবেশন করা হলে, শিশু মনোজগতে কী বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে, তা কখনো কি ভেবে দেখেছি আমরা? সত্যকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু সত্য সত্যই—এতে কালি লাগিয়ে মিথ্যে হিসেবে চালানো, কিংবা কোনো মিথ্যেকে ঢাক ঢোল পিটিয়ে সত্য বলে উপস্থাপন করা ক্ষমাহীন অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। অথচ সেই অপরাধ আমরা সজ্ঞানে এবং সযত্নে দিনের পর দিন করে যাচ্ছি। ইতিহাস নিয়ে শোচনীয় মিথ্যেচার করছি। আমাদের শিশুতোষ বইগুলোকে, এই সত্যমিথ্যা বা

www.pathagar.com

আলো-আঁধারির খেলা থেকে মুক্ত করতে না পারলে 'মুক্তবুদ্ধির শিশু' তথা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে 'মুক্তবুদ্ধির মানুষ' হিসেবে গড়ে তোলা আদৌ কি সম্ভব?

কাজেই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যদি কূপমণ্ডূক বানাতে না চাই, যদি তাদেরকে সত্যান্বেষী মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই, তাদের অন্তরে আলোর দ্যুতি দেখতে চাই, তাহলে নিজেদের মূঢ়তা ত্যাগ করে ওদের সামনে এক এবং অখণ্ড 'সত্য'কে তুলে ধরতে হবে। মনে রাখতে হবে, ইতিহাস কারো দাস নয়—সে সম্পূর্ণ স্বাধীন, তার চলার পথ খুবই ঋজু, সমতল। ইতিহাসকে ক্ষণিকের জন্য বদলে দেয়া যায়, অনন্তকাল চেপে রাখা যায় না। আমাদের পাঠ্যপুস্তকে যাতে কোনো প্রকার তথ্য বিভ্রান্তি বা ইতিহাস বিকৃতি স্থান না পায়, বিষয়টি গুরুত্বসহ বিবেচনায় রাখা উচিত।

ছয়. সর্বজনীন বিষয়ে ধর্মীয় প্রসঙ্গের অবতারণা : শিশু বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণি থেকে 'ধর্মীয় শিক্ষা' বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হয়। শিক্ষার্থীর নিজ ধর্ম অনুসারে একটা আলাদা বই পাঠ্য করা আছে। ওই বই থাকার পরও, সকলের জন্য বাধ্যতামূলক এমন বইয়েও, কোনো একটা নির্দিষ্ট ধর্মের মাহাত্ম্য বিষয়ক গল্প-অ্যাখ্যান পাঠ্য করতে দেখা যায়। কিন্তু কেন?

কোমলমতি শিশুমাত্রই নিজ ধর্মের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। নিজ ধর্ম ছাড়া তাকে সর্বধর্মের সমন্বয়ী শিক্ষা পাঠ দান করা যেতে পারে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমাদের শিশুতোষ বইয়ে সর্বধর্মের সমন্বয়ীরূপ উপস্থাপন করা হয় না। বরং অবশ্যপাঠ্য কোনো কোনো বইয়ে একটা নির্দিষ্ট ধর্মকে বিশেষ মহিমায় উপস্থাপন করা হয়। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মমতাজউদ্দিন পাটোয়ারীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : 'ধর্ম শিক্ষার আলাদা বিষয় থাকার পরও আবশ্যকীয় বাংলা এবং পরিবেশ পরিচিতিতে প্রধানত একটিমাত্র ধর্মের ইতিহাস, ধর্মীয় প্রবক্তাদের প্রসঙ্গে যখন বারবার গল্প ও রচনাবলি পড়ানো হয় তখন অন্য ধর্মাবলম্বী শিশুদের জন্য তা বিব্রতকর হয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়া এসব বিষয়ে পরীক্ষার যথার্থ উত্তর প্রদানে তাদেরকেও বাধ্য করা হয়। যেহেতু দেশে দেশে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং উপজাতীয় জনগোষ্ঠী রয়েছে, তাই আবশ্যকীয় পাঠ্যসূচিতে একটা নির্দিষ্ট ধর্মকে উপস্থাপন করে অন্য ধর্মাবলম্বী এবং জাতিগোষ্ঠীর ধর্ম জাতিগত বিশ্বাস ও বোধের ওপর যাতে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন' [বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা নীতি, পৃ-৯৪]।

www.pathagar.com

সাত. ত্রুটিযুক্ত পাঠ্যবই : যুগ যুগ ধরে প্রচলিত একটি প্রবাদ, 'মানুষ মাত্রই ভুল হয়।' কথাটি মোটেই অসত্য নয়, এজন্য যে—চৈতন্যচালিত মানুষ, তিনি যতই মহাজ্ঞানী বা মহাযোগী হোন, তার প্রজ্ঞা সবসময় সঠিকভাবে সাড়া দেয় না। মানুষ যেহেতু যন্ত্র নয়, ইন্দ্রিয়নির্ভর, ফলে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, কোথাও না কোথাও ভুল তার হয়েই যায়। অবশ্য এ ভুল হয় ব্যক্তি মানুষের, সমষ্টিরও হয়, তবে তা খুবই কম। সমষ্টি-মানুষের উন ভুল হবার কারণ, এখানে একজন বা দুজন ভুল করলে, বাকিরা তা শুধরে দিতে পারে। এজন্য কোনো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আলোতে আসার আগে সমষ্টির একাধিক ধাপ দ্বারা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নেয়া হয় এবং নির্ভুলতার নিশ্চিত পর্যায়ে আসার পর তাকে উন্মুক্ত করা হয় জনসমক্ষে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত ও সম্পাদিত গ্রন্থগুলো দেশের বরেণ্য বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা বারবার পরীক্ষিত হয়ে হয়ে, বিশেষ ছাড়পত্র পাবার পর শিক্ষার্থীদের হাতে আসে। তারপরও এসব বইয়ে অল্প বিস্তর ভুলের দেখা মেলে, যা ধর্তব্যযুক্ত বিষয় বলে গণ্য নয়। কিন্তু মাঝেমধ্যে এসব বইও এমন অন্তহীন ভুল নিয়ে প্রকাশিত হয়, যা দেখলে বাকহীন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। ২০১৩ সালে প্রকাশিত, পঞ্চম শ্রেণির বাংলা বইয়ের নানারকম ভুলের মহোৎসব দেখে মনের ভেতরে প্রশ্ন জাগে, এটা কি বইয়ে লিখিত দেশখ্যাত বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক রচিত এবং এনসিটিবি দ্বারা পরীক্ষিত? প্রশ্নটির উত্তর জানার জন্য ওই বই নিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটা নিবন্ধ হুবহু তুলে ধরা যাক,

"জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পঞ্চম শ্রেণির 'আমার বাংলা বই'টির আদ্যোপান্ত পড়লাম। বইটিতে ছড়া-কবিতা-গল্প-নাটিকা-নিবন্ধ মিলে মোট তেইশটি রচনা স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে দশটি ছড়া বা কবিতা, একটি গল্প এবং একটি নাটিকা—মোট বারোটি রচনার সাথে লেখকের নাম প্রযুক্ত আছে। বাকি এগারোটিতে রচয়িতার নাম বর্ণিত হয়নি। যে চারজন প্রখ্যাত ব্যক্তি বইটির সংকলন রচনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন, আমরা ধরে নিতে পারি, বাকি ওই এগারোটি রচনা তাঁদেরই হাত থেকে এসেছে। এগুলো হয় তাঁরা নিজেরা লিখেছেন বা অন্য কারো দ্বারা লিখিয়েছেন। এবং এ গুরু কাজটি করতে গিয়ে তাঁরা এমন সব ভুল, এলেবেলে, পারম্পর্যহীন বাক্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করেছেন, যা শিশুচিত্তে প্রবল ঝাঁকুনি দেয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বইয়ের তৃতীয় রচনাটির নাম 'সুন্দরবনের প্রাণী' (পৃ-১০); এর শুরুতেই পারম্পর্যহীন কথার সূত্রপাত : 'বিশ্বে কোনো কোনো প্রাণীর সঙ্গে জড়িয়ে

www.pathagar.com

থাকে দেশের নাম বা জায়গার নাম। যেমন, ক্যাঙ্গারু বললেই অস্ট্রেলিয়ার কথা মনে হবে। সিংহ বললেই মনে হবে আফ্রিকার কথা। তেমনি বাঘ বা টাইগার শুনলেই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের কথা স্মরণ হবেই। এর অর্থ—পৃথিবীর অন্য কোথাও টাইগার বা বাঘের দেখা যদি মেলেও, তবু বাংলাদেশের টাইগারের কোনো তুলনা নেই।' পাঠক, লক্ষ্য করুন, শুরুতে বলা হয়েছে, কোনো কোনো প্রাণীর নামের সাথে জায়গা বা দেশের নাম জড়িয়ে আছে। যেমন, ক্যাঙ্গারু-অস্ট্রেলিয়া, সিংহ-আফ্রিকা। সেক্ষেত্রে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সাথে বাংলাদেশের নাম জড়িত হওয়ার কথা। কিন্তু তা না বলে যে বাক্যটি জুড়ে দেয়া হয়েছে, তা পূর্ববর্তী অংশের সাথে সম্পূর্ণ পারম্পর্যহীন এবং নিখাদ অর্থহীন কথা।

এর একটু পরেই আছে অসংলগ্ন, গাঁজাখুরি তথ্য, 'ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে অর্থাৎ শ'তিনেক বছর আগে'—পাঠক, ইংরেজ আমলের প্রথম দিক, অর্থাৎ ১৭৫৭ কিংবা এর পরের এক দুই বছর, তা আজ থেকে শ'তিনেক বছর আগে কী করে হয়, একবার ভেবে দেখুন তো (এ সরল হিসেবটি করতে পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন হয় না); এরপর আছে, 'বিখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ভ্রাতা নলিনীভূষণ রায় ১৮৮৫ সালে সুন্দরবনে শেষ গণ্ডার দেখেছিলেন বলে জানা যায়।' এর মানে নলিনীবাবুর গণ্ডারদর্শনের পরপরই সুন্দরবনে গণ্ডারের আর কোনো অস্তিত্ব থাকেনি, বিধায় ওই প্রাণীটি আর কেউ-ই দেখতে পায়নি। এটা খুবই সাধারণ—শিশুসুলভ, সরলীকৃত তথ্য নয়?

'এখন বাংলাদেশে শকুন প্রায় দেখাই যাচ্ছে না'—এ রকম বাক্যের পরপরই বলা হয়েছে, 'মানুষের যা ক্ষতিকর, সেইসব আবর্জনা শকুন খেয়ে ফেলে এবং সে কারণেই আমাদের চারদিকের পরিমণ্ডল বসবাসের যোগ্য রয়েছে। আমরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছি না।' পাঠক, যে প্রাণীটি প্রায় দেখাই যায় না, তারই কল্যাণে আমরা স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করতে পারছি, কথাটা খুব গোলমেলে হয়ে গেল না? এরচেয়ে আরও গোলমেলে বাক্য খেয়াল করুন, 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার নামটি পৃথিবীতে সবাই জানে, এবং জানে যে, এই টাইগার বেঙ্গলে অর্থাৎ বাংলাদেশেই একমাত্র দেখা যায়। যদি বাঘই না থাকে, তো রয়্যাল বেঙ্গল থাকবে কীভাবে?' শেষ বাক্যটির মানে কী? একটি তুলনীয় বাক্য দেখা যাক, 'যদি পানিই না থাকে, তো মাছ থাকবে কীভাবে?' এখানে বুঝানো হয়েছে, মাছের বেঁচে থাকাটা পানির উপর নির্ভরশীল। সেক্ষেত্রে বাঘ এবং রয়্যাল বেঙ্গলের

www.pathagar.com

পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কথা বলা, যাচ্ছেতাই কথা নয়? বাঘ এবং রয়্যাল বেঙ্গল কি আলাদা আলাদা প্রাণী, যার একটি না বাঁচলে অন্যটি বাঁচবে না? পাঠক, 'সুন্দরবনের প্রাণী' বিষয়ে ইতি টানবার আগে এখানকার 'পাঠ শিখি' অংশের (পৃ-১৩) একটা কাঁচা বাক্য তুলে দিচ্ছি : স্মরণে রাখা—বইয়ের পড়া স্মরণে রাখার জন্য ভোর বেলায় উঠে পড়তে হয়। (এর মানে কি অন্য সময়ে পড়লে বইয়ের পড়া স্মরণে থাকবে না?)।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পারম্পর্যহীন অন্য একটি রচনার নাম 'স্মরণীয় যাঁরা চিরদিন।' (পৃ-৯১) সেখানে বাঙালির স্বাধীনতা লাভ সম্পর্কে বলা হয়েছে 'এই বিজয়কে পাবার আগে দেশবাসীকে করে যেতে হয় এক তীব্র মুক্তিযুদ্ধ (মুক্তিযুদ্ধের আগে তীব্র বিশেষণটি বেমানান নয়?)। আমাদের সাহসী বীর মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছে শত্রুসেনাদের সঙ্গে' (এখানে সঙ্গে নয়, হওয়া উচিত বিরুদ্ধে)। পরের দুটি এলেবেলে বাক্য লক্ষ করুন : জনগণ 'শত্রুসেনাদের দখলে থাকা আমাদের জন্মভূমিতে কোনো রকমে জীবন-যাপন করতে করতে তারা অপেক্ষা করেছে। সশস্ত্র যুদ্ধে আমাদের মুক্তিসেনারা প্রাণ দেন। (সবাই কি প্রাণ দিয়েছেন?) আর দেশের ভেতরে অবরুদ্ধ জীবনযাপন (আগের বাক্যে জীবন-যাপন) করতে করতে প্রাণ দেন এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ।'

পাকিস্তানি সেনাদের পৈশাচিকতার বর্ণনা দিতে গিয়ে এলোমেলো শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, (পৃ-৯২) তারা 'গভীর রাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢাকার নিরস্ত্র, ঘুমন্ত মানুষের ওপর।—নির্বিচারে হত্যা করে নিদ্রিত লোক-সকলকে। সেই হত্যাকাণ্ড চালিয়েই যেতে থাকে বিরামহীন। চালিয়ে যেতে থাকে পরবর্তী নয় মাস ধরে।' (বাক্যের কী ছিরি?)। 'বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন এম. মনিরুজ্জামান। প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ শুনে তিনি পবিত্র কোরান পড়া শুরু করেন। এই কোরান পাঠরত মানুষটিকেই টেনে হিঁচড়ে নিচে নামায় পাকিস্তানি সেনারা।' বস্তুত এ ধরনের বর্ণনা আমাদের শহিদ বুদ্ধিজীবীদের দেশপ্রেমের মহিমাকে অনেকাংশে নিষ্প্রভ করে দেয়। রচনার পরবর্তী অংশে গোবিন্দচন্দ্র দেব, শহীদ সাবের প্রমুখের হত্যাকাণ্ড বর্ণনা করার পর, যেন খেই হারিয়ে পূর্ববর্তী কথাকে অকারণে পুনরাবৃত্ত করা হয়, (পৃ-৯৩) 'পঁচিশে মার্চ এক ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞের সূচনা ঘটায় তারা। ষোলই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় অর্জন পর্যন্ত সময় ধরে তারা এই হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যেতেই থাকে।'

এবার নজর দেই 'ভাবুক ছেলেটি' নামক গল্পের দিকে (পৃ-৮১)। 'দশ-এগারো বছরের ছেলেটি তেমন দুরন্ত নয়। পড়াশুনায় সে ভালো, খেলাধুলাও

www.pathagar.com

করে। বাড়ির কাজকর্ম তেমন করতে হয় না; তবু বাবা-মায়ের সাথে সাথেও থাকে। তবে সময় পেলেই গাছ-গাছালি পর্যবেক্ষণ করে। রোদ বৃষ্টির ব্যাপারটাও দেখে সে।' পাঠক, বাক্যগুলো লক্ষ করুন, এমন বিস্তৃতকিমাকার বাক্য, 'তবু' 'তবে' এর অকারণ ব্যবহার এবং শেষ বাক্যটির হাস্যকর প্রয়োগ দেখে মাথা ধরে যায় না? এর একটু পরে আছে, (পৃ-৮২) 'ছেলের কথা শুনে মা হাসেন। বাবা কিন্তু হাসলেও ছেলের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেন। ওর বাবা ম্যাজিস্ট্রেট হলেও আগে যে স্কুল শিক্ষক ছিলেন। ছেলেটি কিন্তু বড় হতে থাকে।' এসব বাক্যের মধ্যে অর্থগত পারম্পর্য এবং ব্যাকরণগত শুদ্ধতা যেমন নেই, তেমনি নেই দু'বার 'কিন্তু' ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা।

সেই ভাবুক ছেলেটি, নাম স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, বাঙালি বিধায় তাঁকে যথাযথ বেতন দেয়া হতো না—এ তথ্য জানিয়ে লেখা হয়েছে, 'এর প্রতিবাদে তিনি দীর্ঘ তিন বছর বেতন না নিয়ে কর্তব্য পালন করেন। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার তাঁকে স্বীকৃতি দিয়ে সকল বকেয়া পরিশোধ করে চাকরিতে স্থায়ী করে। তখন থেকেই তিনি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু হয়ে ওঠেন।' ব্যাপারটা বুঝি এমন যে, সকল বকেয়া পাওয়ার পর এবং চাকরিতে স্থায়ী হওয়ার পর তিনি 'বিজ্ঞানী' হয়ে ওঠেন? চাকরি স্থায়ী এবং বকেয়া প্রাপ্তির সাথে 'বিজ্ঞানী' হয়ে ওঠার কী সম্পর্ক আছে, বুঝে ওঠা মুশকিল।

'বীরের রক্তে প্রতিষ্ঠিত দেশ' শীর্ষক নিবন্ধের সর্বশেষ বাক্যটি এরকম, (পৃ-৩২) 'বীরের পুত-পবিত্র রক্তস্রোত আর মাতার অশ্রুধারায় স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে বাংলাদেশের।' অর্থাৎ বাংলাদেশ, যেন কোনো দেশ বা ভূখণ্ড নয়, বাংলাদেশ মানে একটা স্বাধীন জাতি। হাঃ হাঃ হাঃ; 'কাঁকনমালা আর কাঞ্চনমালা' গল্পের কয়েকটি বাক্য এ রকম : 'দুঃখের দিন দুঃখে দুঃখে যেতে থাকে কাঞ্চনমালার' (পৃ-৫২)। 'রাজার শরীর থেকে সুচ খোলার জন্য একজনের দরকার ছিল রানি কাঞ্চনমালার।...নদীর ঘাটে গেছেন রানি, সঙ্গে তার কী করে থাকে টাকাকড়ি (পৃ-৫২)।' আরও একটি বিদঘুটে বাক্য, 'যেতে যেতে পথে কাঞ্চনমালা চোখের জল ফেলতে ফেলতে দুঃখের সব কথা সেই মানুষকে না বলে পারেন না' (পৃ-৫৪)।

এ রকম অসংখ্য অর্থহীন বাক্যের সমবায়ে রচিত হয়েছে পঞ্চম শ্রেণির 'আমার বাংলা বই'। আরও ক'টি উদাহরণ 'এক বন্ধুরই এক বিশাল গাড়িতে একদিন চড়ে বসলাম' (পৃ-৭৩)। 'সে জানতে চায় ডুবুরি কেন ডুবছে, (ডুবে মারা যাচ্ছে কি?) দুঃসাহসী কেন উড়ছে' (পৃ-১৭)। 'এ রকম দিনগুলোতে মানুষেরা থাকে লোকালয়ে আর পশুরা জঙ্গলে' (পৃ-২০)। 'বিদ্যুৎ চমকালে

www.pathagar.com

মেদিনীও কেঁপে ওঠে বলে মনে হতে পারে' (পৃ-২৩)। বস্তুত দুই মলাটের ভেতর থেকে সকল ভুলের উদাহরণ টানলে হয়তো নতুন একটা ছোটখাটো বই রচিত হয়ে যাবে। ভুলে ভরা এমন বই লাখ লাখ শিশুর বাংলা ভাষাজ্ঞানকে কতটুকু সমৃদ্ধ করবে, কে জানে? (পঞ্চম শ্রেণির বাংলা বই ভুলে ভরা—বিধান মিত্র, দৈনিক সমকাল, তারিখ-০৮. ০৩. '১৩)।

শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তাদেরকে অবাধ জ্ঞানের নির্মল আলো-হাওয়ায় বাড়তে দেয়া উচিত। তারা যেন অপজ্ঞান, খণ্ডিত জ্ঞান, সত্য-মিথ্যার আলো-আঁধারিতে না ভোগে, অজ্ঞানতার বেড়াজালে বন্দি থেকে জীবনবিমুখ অপশিক্ষায় দীক্ষিত না হয়, বিশ্বপ্রবাহের নতুন নতুন বার্তা-তত্ত্ব এবং সৃজনশীল চেতনায় সজ্জিত হয়ে নিজের মতো করে বেড়ে উঠতে পারে, সেদিক বিবেচনায় রেখে বিজ্ঞানভিত্তিক অভিন্ন এবং একমুখী শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের নিমিত্তে আশু পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। বস্তুত আমাদের শিশুদের জন্যে এমন শিক্ষা প্রণীত হওয়া উচিত, যা তাকে কেবল সনদ বা ধর্মীয় রেখায় খণ্ডিত না করে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যাক, 'আমাদের ছাত্রগণ যেন শুধুমাত্র বিদ্যা নহে, তাহারা যেন শ্রদ্ধা, যেন নিষ্ঠা, যেন শক্তি লাভ করে, ...তাহারা যেন অভয় প্রাপ্ত হয়, দ্বিধাবর্জিত হইয়া তাহারা যেন নিজেকে নিজে লাভ করিতে পারে।'

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা : প্রচলিত ব্যবস্থায় শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর বলতে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি সমাপনান্তে বোর্ড কর্তৃক গৃহীত এসএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত বোঝায়। নতুন শিক্ষানীতিতে (২০০৯) মাধ্যমিক স্তর ধরা হয়েছে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত। শিক্ষাস্তরের এই নতুন বিভাজন বিন্যাস বৈশ্বিক পর্যায়ের সাথে সঙ্গতিযুক্ত এবং আধুনিক চেতনায় সমৃদ্ধ। কিন্তু আমাদের মতো গরিব দেশে, যেখানে প্রচলিত শিক্ষারীতি চালু রাখতে গিয়েই আর্থিক দীনতায় হিমশিম খেতে হয়, সেখানে একটি নতুন শিক্ষারীতি—যা বাস্তবায়ন করতে হলে লক্ষ লক্ষ প্রতিষ্ঠানের খোল-নলচে পাল্টে ফেলতে হবে, ব্যাপকহারে নতুন শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে, পুরনোদেরকে বহুবিধ প্রশিক্ষণে আলোকিত করতে হবে, সর্বোপরি বহুপ্রাচীন ধারা ফেলে নবধারায় অবগাহন করতে মনকে প্রস্তুত করে নিতে হবে—এতসব মহাযজ্ঞ সম্পাদনের ক্ষমতা ও বল সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের আছে কি না, তা ভাববার বিষয় বটে। তাছাড়া অতীত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অনেকগুলো

www.pathagar.com

শিক্ষা কমিশন তাদের সুচিন্তিত রিপোর্ট পেশ করেছে, কিন্তু কোনোটাই ন্যূনতম সফলতার মুখ দেখতে পায়নি। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে প্রণীত কোনো কোনো শিক্ষানীতি তো লাল ফিতার বন্ধন থেকেই বেরিয়ে আসতে পারেনি। কাজেই নতুন শিক্ষানীতি, যা সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুমাত্র—এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সন্দেহ আমাদের মনে থেকেই যাচ্ছে। ঘর পোড়া গরু নাকি সিঁদুর দেখলেই ভয় পায়; শিক্ষা নীতি নিয়ে যে জাতির মুখ বারবার পোড়েছে, সামনে পা ফেলেও বারবার পিছিয়ে গেছে সেই পুরনো জায়গায়, পুরনো ধারায়, সেই ভুতুড়ে ভয় বুকে ধারণ করি বিধায় আলোচ্য অংশে মাধ্যমিক শিক্ষা বলতে বর্তমানে প্রচলিত ধারাকেই (ষষ্ঠ থেকে দশম) গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া আমাদের বিবেচনায়, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে, মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃতিগত মৌল পার্থক্য নেই, দুটি শিক্ষাই প্রায় একই রঙ্গে ও ঢঙে পরিচালিত এবং অভিন্ন স্থান ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, দুটিরই শিক্ষাদান পদ্ধতি, পরিচালনা পদ্ধতি, কর্মচারী বা শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি, সমস্যার স্বরূপ এবং সফলতা-ব্যর্থতার রূপ—প্রায় একই রকম; এদের দেহগত ভিন্নতা আছে বটে, আত্মগত দিক থেকে তেমন পার্থক্য নেই। কাজেই আমাদের আলোচনায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাকে একসূত্রে গ্রথিত করে এর ভেতর বাইরের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করা হবে।

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা পঞ্চধারায় বিকশিত; মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় একটি ধারা কমে গিয়ে তা বিকশিত হচ্ছে চতুর্বিধ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। এই চার রকমের প্রতিষ্ঠান যেন হিন্দু সমাজে প্রচলিত চতুর্বর্ণের মতো, কোনোটা ব্রাহ্মণ, কোনোটা ক্ষত্রিয়, কোনোটা বৈশ্য বা শূদ্রভুক্ত। সমাজ বিবর্তনের ধারায়, এখন যদিও বর্ণভেদ প্রথা লোপ পাচ্ছে, বর্ণভিত্তিক কর্তৃত্ববাদ তলানিতে ঠেকেছে, তবে উল্লিখিত প্রাতিষ্ঠানিক 'বর্ণভেদ' প্রবণতা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্রাহ্মণদের আগের মতো সম্মান বা ঠাট-বাট নেই, ক্ষত্রিয়দের নেই বাহু-প্রভাব, ধনগর্বে স্ফীত নয় বর্তমান বৈশ্যকুল, শূদ্ররা নয় 'পরিত্যজ্য', তবে শিক্ষাঙ্গনে ওইসব প্রবণতা শোচনীয়ভাবে আছে, এবং আমাদের বৈষম্যযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থায় তা চিরস্থায়ী হওয়ার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা আবশ্যক, উল্লিখিত চতুর্বর্ণ ছাড়াও হিন্দু সমাজে এমন সম্প্রদায়ও আছে, যাকে বলা হয় দলিত শ্রেণি, মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় 'হরিজন', যাকে বল্লালীয় শ্রেণিবিন্যাসে ফেলা মুশকিলের ব্যাপার, তেমনি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে এমন একটি ধারা

www.pathagar.com

আছে, যার ক্রমান্বয়ী বিকাশ ও ব্যাপ্তি প্রবল হলেও এর কুল ও মান নিয়ে যথেষ্ট সংশয় থাকায়, সেটিকে কথিত চতুর্বর্ণ থেকে দূরে রেখে 'হরিজন' বিবেচনাপূর্বক আলাদা আলোচনায় রাখা হলো।

১. স্কুল কলেজ কেন্দ্রিক সাধারণী শিক্ষা : সাধারণ অর্থে মাধ্যমিক (ষষ্ঠ-দশম) ও উচ্চ মাধ্যমিক (একাদশ-দ্বাদশ) শিক্ষা বলতে স্কুল ও কলেজকেন্দ্রিক সাধারণ শিক্ষাকে বোঝানো হয়ে থাকে। যখন ওই দুই পর্যায়ের সমাপনী পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোয়, তখন আমরা ও দেশের গণমাধ্যম স্কুল-কলেজের রেজাল্ট নিয়েই মেতে উঠি, আমাদের মনেই থাকে না যে, এদের সাথে মাদ্রাসা, বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা নামের আরো বিকল্প কিছু শাখা আছে। এই মনে না থাকার অন্যতম কারণ, আমাদের দেশীয় প্রেক্ষাপটে সাধারণ স্কুল ও কলেজ শাখার ধারাটি সবচেয়ে প্রবীণ ও বহুবিস্তৃত। শহর থেকে উপশহর, সেখান থেকে গ্রাম, সর্বত্র এর লক্ষণীয় প্রসার। গ্রহণযোগ্যতা ও প্রকৃতিগত দিক বিবেচনায় এই ধারাটি অপেক্ষাকৃত কুলীন ও সর্বমান্য। ফলে হিন্দু সমাজের বর্ণবিন্যাসের প্রেক্ষিতে এটাকে বলতে পারি 'ব্রাহ্মণ্যবাদী' ধারা। আবার ব্রাহ্মণ্যদের মধ্যে যেমন উঁচু-নিচু ভেদ আছে, কেউ শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ, কেউ বা বর্ণ ব্রাহ্মণ, তেমনি এ শিক্ষাধারাতেও প্রতিষ্ঠানগত দিক থেকে দুটি উপধারা বিদ্যমান, সরকারি বিদ্যাপীঠ ও বেসরকারি বিদ্যাপীঠ।

এ দুই উপ-ধারায় বাহ্যিক বা চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্যে কোনো পার্থক্য নেই, পার্থক্য কেবল দুই উপ-ধারার প্রতি সরকারি আনুকূল্য প্রদানে এবং তদ্‌জাত কারণে কর্মরতদের স্টেটাসে। ওসব প্রতিষ্ঠানে যারা পড়ে, তারা একই মায়ের (দেশের) পুত হলেও, সুবিধাপ্রাপ্তিতে একই সমতলে অবস্থান করতে পারে না। একটি পুরনো পরিসংখ্যান বলছে, The average cost of an undergraduate in a government college is Tk 2,100 while in a non government college the average cost is Tk 210. Furthermore, over 70 percent of the investment in education goes to the urban areas where the universities and most of the government college and school are located. *[The second five-year plan, p-284]* বস্তুত এখানে সরকারি-বেসরকারি কলেজ-শিক্ষার্থীর জনপ্রতি বার্ষিক ব্যয়ের যে বৈষম্য বিদ্যমান, তাতে নিশ্চিত হতে পারি, ওই দু ধরনের স্কুলের ক্ষেত্রেও এই ব্যয়ের আনুপাতিক হারের খুব একটা হেরফের হবে না।

www.pathagar.com

বেসরকারি স্কুল এবং কলেজ : মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই ধারার সংখ্যা সর্বাধিক, গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র বিস্তৃত। তবে অধিকাংশের শরীরে লাবণ্য নেই, সুস্বাস্থ্য নেই, এমনকি বেঁচে থাকবার জন্য যতটুকু শারীরিক সক্ষমতা দরকার, কোনোটির মধ্যে তা-ও নেই। গ্রামের কথা না হয় বাদই রইল, শহরের বিশাল অট্টালিকার ভিড়ে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও আছে, যেগুলো দেখলে মনে হতে পারে, এ যেন জমিদার প্রাসাদের পাশে ভৃত্যের কুঁড়েঘর মাত্র। স্থানের অভাব, কাজ চালাবার জন্য প্রত্যাশিত পরিবেশের অভাব, ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার অভাব। অনেক স্কুল কলেজ আছে, যার প্রতিষ্ঠার পেছনে শিক্ষা দানের মতো মহৎ উদ্দেশ্য কাজ করেনি, তা করা হয়েছে নিছক কারবারি মনোভাবকে সামনে রেখে, অথবা ধনস্ফীত কোনো ব্যক্তি বা তার পূর্বসূরির নাম খোদাই করে রাখবার জন্য। তাই গ্রামে গঞ্জে, শহরেও এমন অনেক প্রতিষ্ঠান দেখা যায়, যেখানে শিক্ষার্থী যা-ই থাকুক, শিক্ষাদাতার কমতি নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞান শিক্ষার বেলায় এমনও দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট বিভাগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা যত, এর চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষকের সংখ্যা।

কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তা হাইস্কুল বা কলেজ যা-ই হোক, কতগুলো সুনির্দিষ্ট বিধি মেনে এর গোড়াপত্তন করতে হয়। প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো দাঁড় করবার জন্য পর্যাপ্ত জমি, গ্রহণযোগ্য পরিবেশ, ওই এলাকায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক কার্যক্রম সন্তোষজনক কি না—এমন অনেকগুলো বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সরকার তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্যি, আমাদের দেশের অনেক প্রতিষ্ঠানে সরকার ঘোষিত ওই শর্তাবলীর বাস্তব প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় না। কিছু প্রতিষ্ঠান সরকারি শর্তের ন্যূনতম অংশ না মেনেও, অজানা শক্তির বলে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে যায়। আর এর বিরূপ প্রভাব পড়ে পরীক্ষার ফলাফলে।

তবে হ্যাঁ, গুটিকতক বড় শহরে এমন কিছু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও আছে, যেগুলো দেহে বা বলে বা নিয়ম শৃঙ্খলায় কিংবা পরীক্ষার ফলাফল সফলতায় যে কোনো সরকারি বিদ্যাপীঠকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারে। তবে সেটা প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ দানের কৃতিত্বে, নাকি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চেষ্টায় প্রাপ্ত, তা বলা মুশকিল। কারণ ওইসব প্রতিষ্ঠানের ভর্তি ফি, মাসিক বেতন যেমন আকাশছোঁয়া, তেমনি মোটা অঙ্কের টাকা গুনে প্রাইভেট পড়া বা কোচিং করা প্রায় বাধ্যতামূলক। এখানকার শিক্ষার্থীরা, বলা যায় বিপুল টাকা

www.pathagar.com

ব্যয় করে শিক্ষকের কাছ থেকে বিদ্যা কিনে নেয়, যে বিদ্যার জোর পরীক্ষার ফলাফলকে ভরিয়ে দেয় আলোর ঝলকে। তাই তাদের মেধা বা তাদের শিক্ষকদের কর্মনিষ্ঠা কতটুকু মৌলিক বা স্বচ্ছ, এর পরিমাপ করা কঠিন। অবশ্য এ ধরনের ধনস্ফীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে খুব বেশি নেই। এদেরকে সামনে রেখে আমাদের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক চিত্র অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের বেশিরভাগ বেসরকারি হাইস্কুল বা কলেজের অবস্থান গ্রামীণ জনপদকে ঘিরে। গ্রামের যারা ধনেমানে স্ফীত, তারা তাদের সন্তানকে পাঠিয়ে দেয় শহুরে প্রতিষ্ঠানে। যাদের আর্থিক সঙ্গতি নড়বড়ে, সন্তানকে শহরে পড়ানোর সামর্থ্য নেই, তারা নিতান্ত বাধ্য হয়ে ছেলে বা মেয়েকে ভর্তি করান মলিন ধূসর গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানে। বর্তমান কারবারি যুগে ওইসব শিক্ষার্থী পড়ার পেছনে খুব বেশি বিনিয়োগ করতে পারে না, সারা বছরব্যাপী প্রাইভেট বা কোচিং চালিয়ে যেতে পারে না। ফলে পরীক্ষায় আহামরি কিছু করতে ব্যর্থ হয় তারা। এটা অবশ্য তাদের মেধার দুর্বলতাকে প্রকাশ করে না, বরং আর্থিক দীনতাবশত প্রত্যাশিত সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ার দিকেই আঙুল নির্দেশ করে। আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় লক্ষ্মী (ধনসম্পদের দেবী) যার অনুকূলে, সরস্বতীকে (বিদ্যার দেবী) পেতে তার সমস্যা হয় না। অর্থাৎ যার পকেটে টাকা আছে, সে তুখোড় মেধাবী না হলেও ক্ষতি নেই, ক্রীত শিক্ষা দিয়ে পরীক্ষায় ভালো করতে তার তেমন অসুবিধে হয় না। অন্যদিকে, 'লক্ষ্মী যার প্রতি বিমুখ, সে রকম কোনো গরিবের ছেলে বা মেয়ে যতই হোক মেধাবী, স্কুলের বেড়া ডিঙোতে গিয়েই সে বারবার হোঁচট খাবে, কিংবা কোনোমতে সে বেড়া ডিঙোতে পারলেও লক্ষ্মীমন্তের ছেলেমেয়েদের অনেক পিছনে পড়ে থেকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে হবে তাকে। শুধু স্কুলে বা কলেজে গিয়েই এখন বিদ্যালাভ করা যায় না, কিংবা কোনোমতে কিছুটা বিদ্যার ছোঁয়া পেলেও সে বিদ্যা দিয়ে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্টের কাঙ্ক্ষিত মুকুটটি মাথায় পরা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন পড়ে স্কুল-কলেজের বাইরে কুশলী বিদ্যা বিক্রেতাদের কাছে ধরনা দেয়ার। সেইসব বিদ্যাবিক্রেতারা যে দোকান খুলেছেন তার আধুনিক নাম 'কোচিং সেন্টার' (বিনষ্ট রাজনীতি ও সংস্কৃতি ঃ যতীন সরকার, পৃ-২৩১)।' দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, বর্তমান কারবারি শিক্ষাব্যবস্থায় একজন ছাত্র বা ছাত্রীর ভালো রেজাল্ট দেখে বোঝার উপায় থাকে না—ওই রেজাল্টের মধ্যে কার কৃতিত্ব বেশি? ছাত্র বা ছাত্রীর, নাকি প্রাইভেট টিউটরের? তার শিক্ষা

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠানের, নাকি সে যে কোচিং সেন্টারে গিয়ে পরীক্ষাপ্রস্তুতি নিয়েছে, তার?

বেসরকারি স্কুল কলেজের শিক্ষকবৃন্দ : দূর অতীতে স্কুল কলেজের শিক্ষাদানে যারা নিযুক্ত ছিলেন, তারা সমাজের বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হতেন। আপদে বিপদে সাধারণ লোকজন তাদের কাছে যেত, বুদ্ধি পরামর্শ নেয়ার জন্য। সবার বিশ্বাস ছিল, মাস্টার সাব বা মাস্টার মশাই-এর কাছে গেলে সুপরামর্শ পাওয়া যাবে। তখনকার অনেক মেধাবী ব্যক্তিবর্গ মনের টানে এ পেশায় আসতেন, পেশাসংশ্লিষ্ট কাজকে অন্তর দিয়ে উপভোগ করতেন। তিন-চার দশক আগেও শিক্ষকতায় এমন অনেকেই আসতেন, যারা ইচ্ছে করলে অন্য কোনো ক্ষমতাঘেঁষা পেশাতেও অবলীলায় যেতে পারতেন। যেতেন না, কারণ শিক্ষকতায় থেকে দেশ ও সমাজকে সেবা দেয়ার জন্য তাদের মধ্যে গভীর আকুতি কাজ করত। তাদের সবাই না হলেও বেশিরভাগই ছিলেন আপাদমস্তক সৎ, পরোপকারী ও কর্মনিষ্ঠ। দেশ ও জাতি গঠনে নিবেদিতপ্রাণ।

কিন্তু এখন সে বোধ পাল্টে গেছে। শিক্ষকতা পেশায়, বিশেষত বেসরকারি স্কুল কলেজের চাকরিতে নিতান্ত বাধ্য না হলে কেউ এখন আসতে চায় না। কেন আসবে? যে শিক্ষাব্যবস্থায় একজন স্কুল বা কলেজ শিক্ষককে মাসিক বাড়ি ভাড়া ভাতা বাবদ ১০০ টাকা এবং চিকিৎসা ভাতা বাবদ মাসিক ১৫০ টাকা প্রদান করা হয় (অবশ্য জানুয়ারি, ২০১৩ তে সদাশয় সরকার ঘোষণা করেছেন যে, এখন থেকে ওই শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া ভাতা হবে ৫০০ টাকা, চিকিৎসা ভাতা হবে ৩০০ টাকা, প্রথমটির বৃদ্ধি ৪০০%, দ্বিতীয়টির ১০০%; আমার এক বন্ধু, যে একটা বেসরকারি কলেজের শিক্ষক, সেদিন বলল, তাদের বাড়ি ভাড়ার ৪০০% বৃদ্ধির কথা শুনে তার বাসার মালিক নাকি সিদ্ধান্ত দিয়েছে, আগামী মাস থেকে তার বাড়ি ভাড়া ৩০০ টাকা বাড়িয়ে দেবেন) সে অবহেলিত, ন্যুব্জ পেশায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে কেউ আসার কারণ আছে কি? মফস্বলের এমন অনেককে জানি, যারা কলেজে চাকরি করতেন, পরে সরকারি অফিসের কেরানি বা এই জাতীয় অন্য কোনো চাকরি পেয়ে প্রথমটি নির্দ্বিধায় ছেড়ে দিয়েছেন। পূর্ববর্তী চাকরির সাম্মানিক ধাপ তাদেরকে আটকে রাখতে পারেনি, কারণ কারবারি যুগে প্রথমে বিবেচ্য আর্থিক নিশ্চয়তা, সম্মানের স্থান এর অনেক পরে।

বেসরকারি বিদ্যাপীঠের একজন শিক্ষক কত টাকা মাইনে পান, এর চেয়েও শোচনীয় প্রশ্ন, মাইনেটা তিনি কবে পাবেন? জানুয়ারির

www.pathagar.com

বেতন—ফেব্রুয়ারিতে তো নয়ই, মার্চের প্রথমার্ধে পাবেন কি না সন্দেহ। বড় ধরনের প্যাচ বাজলে বেতনের শিকেয় মার্চেও না ছিঁড়তে পারে। এই যে আর্থিক অনিশ্চয়তা, নিজের প্রাপ্যটুকু সময়মতো পাওয়া না পাওয়ার দোলাচলতা, প্রতি মাসে সাধ ও সাধ্যের মধ্যে অমিলের ব্যাপকতা, বিপরীতে সরকারি অফিসে কর্মরত পাশের বাড়ির জনৈক পিয়নের আকাশ উড্ডীনতা—এসবের ভিড়ে সর্বোচ্চ সার্টিফিকেটধারী একজন শিক্ষক ইচ্ছে করলেই কি জ্ঞানচর্চায় নিবেদিত থাকতে পারেন? কিংবা শিক্ষকতার অলঙ্কার—সততা, নিষ্ঠা, সাধনায় অটল থেকে নির্বিকার জীবনযাপন করতে পারেন? তার থেকে মেধায় শিক্ষায় উচ্চতায় যারা তুচ্ছ বা ক্ষীণ, ব্যক্তিত্বে যারা নিস্প্রভ, তাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উত্থান কি তার মনে আলো-আঁধারি প্রত্যাশার তরঙ্গ সৃষ্টি করবে না? সবার মনে রাখা দরকার, আমাদের ওই শিক্ষকরা বুদ্ধদেব বা চৈতন্যদেব নয়, তারা রক্ত মাংসে গড়া সাধারণ মানুষ, চাকরিতে এসেছেন জীবন বাঁচাতে এবং সাজাতে, জীবনশক্তিকে ক্ষয় করে কেবল সেবা দানের জন্য নয়।

বেসরকারি শিক্ষক, বিশেষত কলেজ শিক্ষকদের মানসিক নির্যাতনের অন্য একটি নাম 'পদোন্নতি নীতিমালা'। প্রচলিত নীতিমালা অনুযায়ী একজন প্রভাষক কমপক্ষে আট বছর চাকরির পর তিনি সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হন। কিন্তু ওই শর্তের মধ্যে শুভঙ্করের ফাঁকির চেয়ে আরো বড় একটা ফাঁকি আছে। তা হলো, ওই প্রভাষক পদোন্নতি পাবেন তখনই, যখন তাঁর প্রতিষ্ঠানে আরো দুজন ওই পদের অর্থাৎ সহকারী অধ্যাপক হওয়ার যোগ্যতা লাভ করবেন, অর্থাৎ প্রতি তিন জন পদোন্নতিপ্রাপ্তদের মধ্য থেকে একজন, সিনিয়র যিনি—তিনিই উচ্চপদে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। এর মানে দাঁড়াল, কোনো একজনের পদোন্নতি—কেবল তারই উপর নির্ভর করে না, এর জন্য অন্য দুজনের উপর নির্ভর করতে হয়। ওই অন্য দু'জন—যাদের সাথে পদোন্নতির বিষয় জড়িত, ভাগ্য ভালো থাকলে কেউ পান দশ বছরে, কেউ বা বাইশ বছরেও পান না। ওই বাইশ কিংবা তারও বেশি সময় তিনি অভিন্ন পদে, অভিন্ন বেতন স্কেলে (যদি জাতীয় পর্যায়ে নতুন বেতন স্কেল না দেয়া হয়) চাকরি করে যেতে বাধ্য হন। এর ফলে অনেক প্রতিষ্ঠানে খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। চাকরিতে আট দশ বছর পরে আগত কেউ একজন পদোন্নতি পেয়ে যান, আরেকজন স্থিত থাকেন পুরনো বলয়েই। ফলে অনেকের চাকরিজীবন মর্মযাতনায় পিষ্ট হতে দেখা যায়।

www.pathagar.com

সহকারী অধ্যাপকের পরে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে আর যে দুটো পদ আছে, তা হলো উপাধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষ। কলেজ শিক্ষক হিসেবে বারো এবং পনেরো বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে ওই দুটো পদে আসীন হওয়ার যোগ্যতা অর্জিত হয়। পদোন্নতি সংক্রান্ত নিয়মের জটিলতার সূত্র ধরে অনেক শিক্ষক দীর্ঘকাল প্রভাষক থাকতে বাধ্য হন, অথচ তাঁর ছাত্রই উপাধ্যক্ষ বা অধ্যক্ষ হয়ে সংশ্লিষ্ট হতভাগা শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হয়ে যেতে পারেন। পরীক্ষার মাধ্যমে যদি পদোন্নতির বিধান থাকত, তাহলে ওই সব প্রতিষ্ঠানে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠের অবস্থানগত জটিলতা দূর হয়ে যেত। ভাগ্য নয়, অন্যের উপর নির্ভরশীলতা নয়—মেধাই হয়ে উঠত একজন শিক্ষকের পদোন্নতি পাবার শর্ত। তাতে শিক্ষকদের জ্ঞানানুশীলন যেমন বাড়ত, তেমনি তাঁর যোগ্যতাকে পুরস্কৃত করবার ন্যায়সঙ্গত ধারার সৃষ্টি হতো।

এ তো গেল একদিক; অন্যদিকের কথা বললে কর্তা হবেন বেজার। আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থায় শিক্ষা তো সেই কবে থেকে বাজারি পণ্য হয়ে গেছে। তেল মরিচ লবণ পেঁয়াজের মতো এটা এখন ক্রয়-বিক্রয়ের জিনিস। এ বাজারে পাইকারি বিক্রেতা বা ক্রেতা যেমন আছে, তেমনি আছে খুচরা ক্রেতা-বিক্রেতা। এর পাইকারি বাজারে রীতিমতো নিলাম ডাকা হয়। ক্রেতারা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে দরাদরি করে। যে হাঁকে বেশি দাম, তার কাছে বিক্রি হয় পদ। পদ মানে চাকরি। একই মানের চাকরির দাম স্থান বিশেষে ওঠা-নামা করে। শহরে এক রকম দাম, শহরতলিতে এক রকম দাম, গ্রামে অন্য রকম দাম। (এ প্রসঙ্গে বলে রাখি, আমাদের সমাজে সবাই যে শিক্ষার নামে ব্যবসা করেন, এমন কিন্তু নয়। ক্ষয়িষ্ণু বঙ্গ সমাজে এখনও এমন মহাজন বিরল নন, যারা দেশ জাতির কল্যাণের জন্য নিজের সর্বস্ব খুইয়ে বিদ্যাপীঠ গড়ছেন, নিজের আরাম আয়েশ ভুলে সেবা হিসেবে অকাতরে বিদ্যা দান করছেন, ব্যক্তিগত গরজে নিজের আঙ্গিনায় বিনে পয়সার পাঠশালা খুলে বসেছেন, এঁরা আমাদের প্রাতঃনমস্য। এই বিরলতম মহানদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক আমি সংখ্যাগরিষ্ঠ অবিরলদের, অর্থাৎ কৃত্রিম শিক্ষাপ্রসারকদের প্রসঙ্গটি অভিজ্ঞতার আলোকে উপস্থাপন করছি মাত্র)।

আগে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করতেন দানবীর বা শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ। এখন শিক্ষা প্রসারের আড়ালে লুকিয়ে থাকে ব্যবসায়িক ফন্দি। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার অথবা এর সভাপতি বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কেউকেটা লোক শিক্ষা-বিক্রির পাইকারি ব্যবসাটুকু করে থাকেন। যে কোনো নিয়োগের ক্ষেত্রে, সেটা প্রতিষ্ঠান প্রধান বা উপপ্রধান বা সাধারণ শিক্ষক বা কেরানি-মালি যাই হোক,

www.pathagar.com

বিনিয়োগ ব্যতিরেকে পদে ঢোকা প্রায় অসম্ভব। যাদের রাজনৈতিক সামাজিক বা আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতা বেশি, যারা নিজস্ব লাইন ঘাট ঠিক রাখায় সিদ্ধহস্ত, তাদের কেউ কেউ কদাচিৎ আপন বাহুজোরে টাকা বিনা পদ বগলদাবা করতে পারেন। সেক্ষেত্রে কাউকে নগদ না দিলেও চ্যানেল মেনটেইন করতে কম টাকা বিনিয়োগ করতে হয় না।

একটা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হওয়া মাত্র, আগ্রহী প্রার্থীরা খোঁজ নিতে থাকেন, কাকে ধরলে, কত কম বিনিয়োগ করে ওই চাকরি বাগানো যাবে। নিয়োগ পরীক্ষার জন্য পড়াশোনার দরকার নেই, তদ্বির ভালো হলে, এর সাথে দেবতা-ভোগের সন্তোষজনক উপকরণ সংযুক্ত হলেই কেল্লাফতে। প্রার্থীরা পরীক্ষার প্রতিযোগিতা বাদ দিয়ে আসল লোককে ম্যানেজ করার কাজে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। একই পদের জন্য অসংখ্য প্রার্থীর আকুলতা-ব্যাকুলতা, টাকা প্রদানের প্রতিযোগিতা দেখে নিয়োগকারী, বলা উচিত প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ তো মহাখুশি। সবাইকে চারদিক থেকে বাজিয়ে দেখে, প্রার্থী ঘোষিত টাকা ছাড়াও তার রাজনৈতিক সামাজিক অবস্থান বিবেচনা করে, পরীক্ষার আগেই মনে মনে তাকে 'প্রথম' করে রাখা হয়। নিয়োগের মঞ্চে যারা মনোনয়নকারী হিসেবে আসেন, তারা জানেন—ওখানে তাদের কাজ কেবল আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। ইচ্ছে থাকলেও, সাধ্য নেই ভিন্ন কিছু করার। এরচেয়ে এই ভালো নয়, পেট ভরে খেয়ে কিছু সম্মানি পকেটে নিয়ে সম্মান বজায় রেখে চলে যাওয়া? জলে নেমে কে যায় কুমিরের সাথে লড়তে? অবশ্য মাঝে মধ্যে কিছু 'বেয়াড়া' লোকও এসে যান নিয়োগ বোর্ডে, যারা মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে চান। তাদের সে প্রত্যাশা শেষ পর্যন্ত সফল হয় না। 'মীমাংসা' অর্থাৎ শিক্ষা কারবারির ইচ্ছের প্রতিফলন না হলে, আংশিক বা ক্ষেত্রবিশেষে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়াটাকে বাতিল করে দেয়া হয়। তারপর আবার নতুন বিজ্ঞপ্তি দিয়ে, 'পজিটিভ' লোক এনে কর্তার ইচ্ছে বাস্তবায়ন করা হয়।

আমাদের বেসরকারি স্কুল কলেজগুলোর চরম দুর্ভাগ্য এই যে, সেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেধাভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ হয় না। যিনি লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষায় প্রথম হলেন, তার অর্জিত সনদের মান সর্বোত্তম হলেও, তার চাকুরি পাবার কোনো নিশ্চয়তা নেই। বস্তুত চাকরি তিনিই পান, যিনি সনদ বা মেধায় ঊন হলেও, নিয়োগ পরীক্ষায় সর্বনিম্নে অবস্থান করলেও, অর্থ কিংবা রাজনৈতিক বলে বলীয়ান। এসব নিয়োগ প্রক্রিয়া আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, সেটা ভেবে দেখবার বিষয়।

www.pathagar.com

এসব স্কুল কলেজের গভর্নিং বডি সম্পর্কে কত কথা শোনা যায়। যে-বিশিষ্টরা পদাধিকার বলে এর সাথে যুক্ত হন, তাদের অবস্থান বা মেধার ন্যূনতম মান আছে। কিন্তু এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সাথে এমন ব্যক্তিকেও সংশ্লিষ্ট হতে দেখা যায়, যার বিদ্যা বুদ্ধি নৈতিকতা সততা সম্পর্কে হাজারো প্রশ্ন তোলার সুযোগ আছে। এদের অনেকে রাজনৈতিক, সামাজিক বা আর্থিক বলে বলীয়ান থাকায় শিক্ষকদের সাথে প্রায়ই দুর্ব্যবহার করে থাকেন। অন্যায় দাবি পূরণে চাপ সৃষ্টি করেন। শিক্ষাঙ্গনের মতো পবিত্র ও আলোকিত জায়গায় অপরিশীলিত, অসংস্কৃত ব্যক্তির প্রবেশ রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট সকলের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

জরিপ চালিয়ে, গবেষণা করে, বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে প্রায়ই বলা হয় অমুক অমুক সেক্টরে বেশি দুর্নীতি হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষা সেক্টরটির অবস্থান কখনো এক নম্বরে না আসলেও, পাঁচের নিচে নামে না। এতে একজন শিক্ষক হিসেবে আত্মতৃপ্তির সুযোগ নেই। ধরা যাক, কোনো একটা গবেষণায় দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে স্বাস্থ্য খাতকে এক নম্বরে, যোগাযোগ খাতকে দুইয়ে, আর শিক্ষা খাতকে পাঁচ নম্বরে দেখানো হলো। এখানে বিবেচনা করতে হবে, দেশ গড়ার ক্ষেত্রে বা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিকাশে কোন খাতটির গুরুত্ব বেশি? স্বাস্থ্য, যোগাযোগ নাকি শিক্ষার? প্রথমটি মানুষকে সুস্থ রাখার দায়িত্ব পালন করে। দ্বিতীয়টি মানুষকে গতিশীল করে, পথচলায় স্বস্তি আনে; আর তৃতীয়টি নবীন প্রজন্মকে 'মানুষ' হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। সভ্যতার বিকাশে শিক্ষাই সমৃদ্ধি দিয়েছে স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ খাতকে। একজন মানুষ নিতান্ত বাধ্য না হলে স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ সংশ্লিষ্ট খাতের দিকে যায় না, কিন্তু শিক্ষার সাথে সবাই ঘনিষ্ঠ থাকে নিরন্তর এবং স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে। কাজেই অন্য যে কোনো সেক্টরের দুর্নীতি দেশ বা জাতিকে যতটুকু স্পর্শ করে, শিক্ষাব্যবস্থার সামান্য অনিয়মও এর চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা কে না জানি, দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব, মেধাবী প্রজন্ম বা সৃষ্টিশীল মানুষ—সবই গড়ে ওঠে উপযুক্ত শিক্ষার হাত ধরে। আর শিক্ষক যদি আপাদমস্তক সুশিক্ষক না হন, তাহলে উপযুক্ত শিক্ষা কে দেবেন? মেধাবর্জিত, নিয়ম-অনিষ্ঠ, পাঠবিমুখ—কেবল সনদধারী ব্যক্তির হাতে যদি শিক্ষার ভার ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে দেশ ও জাতির সর্বনাশ অনিবার্য। ভুলে গেলে চলবে না যে, শিক্ষকতা—অন্য দশটা পেশার মতো নিছক কাজ করে যাওয়া নয়, এটা একধরনের ব্রত, দেশ দশের কল্যাণ সাধনের অনিন্দ্যসুন্দর কর্ম। এর ভার শুধু সুযোগ্য এবং সুপাত্রের উপরই অর্পিত হওয়া উচিত।

www.pathagar.com

উপসংহারে বলে রাখি, আমাদের দেশে বেশ ক'টি বেসরকারি স্কুল-কলেজ আছে, যেগুলোর শিক্ষক, শিক্ষাদানের মান বা নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রশ্নাতীতভাবে ভালো। এর সব ক'টির অবস্থান বড় শহরে এবং সবগুলোর দরজা কেবল বিত্তবানদের জন্য উন্মুক্ত। এগুলোর ভর্তি ফি, মাসিক বেতন, সেশন চার্জ ইত্যাদির ব্যয়ভার বহন করা আমজনতার পক্ষে সম্ভব নয়। পরীক্ষায় অসাধারণ ভালো ফল করা এসব প্রতিষ্ঠান সংখ্যায় যেহেতু খুবই সীমিত এবং যেহেতু এতে সাধারণ্যের সংস্রব নেই, তাই বেসরকারি স্কুল-কলেজের সার্বিক আলোচনায় এসব প্রতিষ্ঠানকে বিবেচনায় নেয়া হয়নি। কারণ আমরা তো জানি, ব্যতিক্রম কখনো উদাহরণের যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না।

সরকারি স্কুল কলেজ এবং এর শিক্ষকবৃন্দ : আমাদের দেশের সরকারি স্কুল বা কলেজ, এর অধিকাংশের অবস্থান শহর বা শহরতলিতে। প্রত্যন্ত গ্রাম, যেখানে শক্তিমান নেতৃত্বের ছোঁয়া বা ছায়া ছিল, সেখানেও ওই ধরনের প্রতিষ্ঠান একেবারে দুর্নিরীক্ষ্য নয়। এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো, অন্য তিন বর্ণ এবং স্বগোত্রীয় বর্ণব্রাহ্মণ থেকে তুলনামূলকভাবে ভালো। তবে এও মনে রাখা দরকার, দেশে অনেক সরকারি বিদ্যাপীঠ আছে, যেগুলো চল্লিশ পঞ্চাশ বছর কিংবা এরও আগেকার নির্মিত বিল্ডিংয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে; এগুলোর কোনোটার দেয়ালে ফাটল ধরেছে, কোনোটার ছাদ চুইয়ে বৃষ্টির পানি পড়ে, এই পুরনো ভবনগুলো যে কোনো মুহূর্তে ধসে পড়ার সম্ভাবনা আছে।

মেধাভিত্তিক যথেষ্ট কঠিন ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় নির্বাচিত হয়ে সরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এদের যোগ্যতা ও মেধা প্রশ্নাতীত। প্রায় প্রত্যেকেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জিত সর্বোচ্চ সনদধারী। একই ডিগ্রিধারী এবং প্রায় সমমেধাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও, এদের অনেক বন্ধু বা বান্ধবী আছে, যারা আপাত উজ্জ্বল বা ক্ষমতাকেন্দ্রিক ক্যাডারে চাকরি করছে। বন্ধুদের বা পরিচিতের এই উত্থান আমাদের উক্ত ঘরানার শিক্ষককুলকে আজীবন হতাশা ও হীনম্মন্যতায় নিমজ্জিত করে রাখে। জীবনে কী পেয়েছেন, কী পেতে পারতেন, প্রতিভাবিচারে কী পাওয়া উচিত ছিল—এ সব অযৌক্তিক ভাবনা তাদের অনেককেই বিকুলিত করে রাখে।

কে যেন বলেছিলেন, বাঙালি মধ্যবিত্ত নিজের অভাবের কারণে অসুখী নয়। তারা শোকগ্রস্ত হয় সমমানের অন্য কারো উন্নতি দেখে। কথাটা অসত্য

www.pathagar.com

নয়। আমাদের সরকারি স্কুল শিক্ষকরা মনে করেন, এটা তার যথার্থ পদ নয়। সরকারি কলেজেই তাকে মানাতো বেশ। সরকারি কলেজ শিক্ষকদের ভাবনা, এ চাকরি তার মেধাকে যথাযথ ধারণ করছে না। পররাষ্ট্র, প্রশাসন, নিদেনপক্ষে ইনকাম ট্যাক্সে যেতে পারলে তৃপ্তি পাওয়া যেত। অর্থাৎ বেসরকারি স্কুল কলেজের শিক্ষকরা যেমন অন্য কোনো সরকারি চাকরি না পেয়ে বাধ্য হয়ে ওই পেশায় আসেন, সরকারি স্কুল কলেজের বেশিরভাগ শিক্ষকও সমমানের অন্য পেশায় ঢুকতে না পেরে 'অনিচ্ছুক শিক্ষক' হিসেবে পাঠদানের জগতে প্রবেশ করেন; আর মনে মনে বা সগোত্রীয়দের সাথে আড্ডায় নিজেদের অবস্থান 'কোন লেভেলে'—এই নিয়ে অমীমাংসিত আলোচনায় অনেক সময় পার করে দেন। তারা ভুলে যান যে, 'শিক্ষক' এমন একটি পদ, যাতে অবস্থান করে ঢাল তলোয়ার আর্থিক চাকচিক্য প্রত্যাশা করা অনুচিত। এটা কেবল 'দিয়ে যাওয়ার' পেশা, এখানে থেকে পাওয়ার প্রত্যাশা করে লাভ নেই। বর্তমান সমাজ শিক্ষককে খুব দাম দেয় না, সম্মানও করে না খুব, তবে তার কাছে প্রত্যাশা করে অনেককিছু। এই প্রত্যাশার চাপ কাঁধে নিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়া—কঠিন বৈ কি।

আরণির অপরিমেয় গুরুভক্তি, একলব্যের অসামান্য গুরুদক্ষিণা বা গুরুপদে আলমগীর তনয়ের পানি ঢালা—এসব ঘটনা এখন রূপকথার গল্প বলে মনে হয়। এ সব প্রচলিত কাহিনীর সত্যতা যাচাইয়ের সুযোগ নেই। কিন্তু হাল আমলে পত্রিকার পাতা খুললেই দেখতে পাই, অমুক জায়গায় ছাত্র বা অভিভাবক বা সন্ত্রাসী কর্তৃক শিক্ষক প্রহৃত, অমুক জায়গায় লাঞ্ছিত বা একেবারে খুন। এ ধরনের সংবাদ শুনে সমাজ এখন আর গা করে না; ভাবে, বর্তমান জমানায় এ আর নতুন কী? আর দশটা মানুষ হরহামেশাই খুন জখম হচ্ছে; শিক্ষকের কপালে এটা ঘটলে আলাদাভাবে দেখার কী আছে? শিক্ষক কি সমাজেরই সাধারণ অংশ নয়? দুঃখজনক হলো, এই সমাজ একেবারে একচোখা হয়ে যায়, কোনো শিক্ষক যখন কোনো অপকর্মের সাথে জড়িয়ে পড়েন। ভেদাভেদযুক্ত বঙ্গ সমাজ তখন একই সমতলে এসে সমস্বরে রোদন করে ওঠে, 'হায়, হায়—শিক্ষক হয়ে তিনি এমন কাজ করতে পারলেন?' সমাজ যেন প্রকারান্তরে বলে ওঠে, 'ঘুষ-দুর্নীতি-ধাপ্পাবাজি-জুয়াচুরি, তা অন্য কেউ করলে ক্ষমা করা যায়, কিন্তু এর সাথে শিক্ষক জড়িত হবেন কেন?'

বস্তুত শিক্ষক সম্পর্কে সমাজের এই দ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গিকে দোষারোপ করে লাভ নেই। সমাজ—শিক্ষকের উপর থেকে শ্রদ্ধা বা সম্মান জানানোর ভাষা তুলে নিচ্ছে বটে, তবে নিজেদের প্রত্যাশার তেমনকিছু সরিয়ে নিয়ে যায়নি।

www.pathagar.com

বিবর্তনশীল সমাজ নিজে পাল্টাচ্ছে, অন্যের পাল্টে যাওয়ার পর্যায় দেখছে, চামচিকেকে পাখি হিসেবে মানতেও তার আপত্তি নেই, আপত্তি কেবল শিক্ষকের নতুন চেহারা মেনে নিতে। সমাজ যেন অলঙ্ঘনীয় বিশ্বাসে সমর্পিত, 'শিক্ষক—তিনি মানুষ গড়ার কারিগর, তিনি হবেন আলাদা মানুষ।' সমাজ তাকে কী দিল, কতটুকু সম্মান জানাল—তা বিবেনায় না এনে প্রত্যেক শিক্ষকের উচিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিকে, তা একপেশে হলেও—এর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো। শিক্ষক মাত্রই মনে রাখতে হবে, তিনি কেবল শর্তহীন দাতা, জ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য বিষয়ের গ্রহীতা হওয়া তার পক্ষে সাজে না। বিবর্তনশীল কালিক ধারায়, যেখানে প্রতিনিয়ত পাল্টাচ্ছে সবকিছু, তখনও সমাজ বোধহয় লালন করে চলেছে সক্রেটিসের জবানবন্দির খণ্ডাংশ, 'জ্ঞান দানের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করেছি, এ রকম প্রমাণ কেউ দেখাতে পারবে না। আমার এই বক্তব্যের একমাত্র নির্ভরযোগ্য সাক্ষী আমার দারিদ্র্য।'

হ্যাঁ, স্বীকার করে নিতেই হবে যে, শিক্ষকরাও পঞ্চেন্দ্রিয়ের মানুষ। তার চোখ ডান-বাঁয়ে তাকায়, তার নাক ভালো-মন্দের ঘ্রাণ নেয়, ত্বক বুঝে শীত-গ্রীষ্মের উত্তাপ। তার পাশের বাড়ির একজন, মনে করি তিনি জনৈক কেরানি, বেতন পান শিক্ষকের অর্ধেক, তবু অজানা যাদুবলে তার অপরিমেয় ধনস্ফীতি, এটা দেখে শিক্ষকের ষড়রিপু কি সক্রিয় হয়ে ওঠবে না? অন্য পেশাজীবীদের আলোয় বসে তিনি কি তখনও 'টাকা মাটি টাকা মাটি' বলে জীবন পার করে দেবেন? বিত্ত-বৈভবের জন্য নয়, নিতান্ত প্রয়োজনে, পেট চালাবার দায়ে কোনো শিক্ষক যদি দুটো টিউশনি করেন, অমনি সমাজ বলতে শুরু করে, 'হায় হায়, শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা শুরু হয়ে গেল? শিক্ষকের আদর্শ বলে থাকল কী?' টিউশনি বা কোচিং করানো—আমি আদৌ সমর্থন করি না এবং এর বিরুদ্ধে আমার অবস্থান খুব স্পষ্ট। তবে সেই সাথে বিশ্বাস করি, অন্য কিছু সেক্টরের দুর্নীতি, যা সবার ধাতে প্রায় সহনীয় হয়ে গেছে, এর তুলনায় শিক্ষকদের টিউশনি তুচ্ছ অকাজের মধ্যে পড়ে।

আমাদের শিক্ষককুল, সমমানসম্পন্ন অন্য পেশাজীবীর তুলনায় কেবল ম্লান নয়, দুর্ভাগ্যপীড়িতও বটে। তাদের প্রতি সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রত্যাশার শেষ নেই, তবে তারাই বোধহয় সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক সবচেয়ে অবহেলিত। এদের জন্য প্রযোজ্য অনেক বিধিমালা আছে, এর মধ্যে ইতিবাচকগুলোর যথাযথ প্রয়োগ নেই, তবে নেতিবাচকগুলোর যথেচ্ছ প্রয়োগ দেখা যায়। শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশাসনিক পদে বা বড় শহরের বড় প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পাওয়া বা বদলি হওয়ার ধরন খুব স্বচ্ছ নয়। এক্ষেত্রে যোগ্যতা, দক্ষতা, জ্যেষ্ঠতা

www.pathagar.com

অপেক্ষা বড় প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে লবিং এবং...। এর গুণে কেউ আজীবন চাকরি করেন ঢাকা বা অন্য কোনো বড় শহরে, কেউ বাধ্য হন মফস্বলে জীবন কাটাতে। কেউ শিক্ষক হয়েও অফিসে অফিসে বসেন, কারো যথেষ্ট যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও প্রার্থিত পদ বা স্থানে জায়গা নিতে পারেন না। কারো চাহিবামাত্র বদলির কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়, কেউ তার সুবিধামতো মফস্বলে বদলি হতে গিয়ে জুতোর সুকতলা নষ্ট করে ফেলেন, তবু প্রত্যাশা পূরণ হয় না তার। কারণ, যথাযথ স্থানে, যথাযথ ভোগ না দিলে এখন নাকি ফাইল নড়ে না। বাংলাদেশ সার্ভিস রুলে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, একই কর্মস্থলে টানা তিন বছরের অধিক সময় কোনো কর্মকর্তা চাকরি করতে পারবেন না। কিন্তু এ নিয়মের যথাযথ প্রয়োগ নেই। জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক ইত্যাদি পদে নির্বাচন দেয়ার কথা থাকলেও, নিয়োগ নিয়ে নিচ্ছেন লাইন ঠিক রাখায় পটু বিশেষ লোকজন। বস্তুত যথাস্থানে যথার্থ লোক প্রতিস্থাপিত না হওয়ায় আমাদের শিক্ষাকার্যক্রম আশানুরূপভাবে অগ্রসর হতে পারছে না।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ এর ২৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১ ঃ ৩০। এর বাস্তব প্রতিফলন অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই অনুপস্থিত। বড় বা মফস্বল শহরের সিংহভাগ বিদ্যাপীঠে, এমনকি গ্রামাঞ্চলের অনেক বিদ্যাপীঠে শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাতে ন্যূনতম ভারসাম্য দেখা যায় না। দেড়-দুইশো শিক্ষার্থী নিয়ে শ্রেণিকক্ষে কোনো পাঠক্রম চললে, সেই পাঠদানে শিক্ষকের না আসে তৃপ্তি, শিক্ষার্থীর না হয় উপকার। ক্লাসের শৃঙ্খলা রক্ষা করতে গিয়ে শিক্ষকের প্রাণ হয় ওষ্ঠাগত। তখন কথা বলার স্বাভাবিক অবস্থা বা ধৈর্য—কোনোটাই বজায় থাকে না। যদিবা থাকে, অধিক শিক্ষার্থীর ভিড়ে তার বক্তব্য শেষ বেঞ্চ পর্যন্ত পৌঁছয় না। শেষদিকের শিক্ষার্থীরা না পারে শিক্ষকের কথা গ্রহণ করতে, না পারে ক্লাস বর্জন করতে। তারা তখন পরস্পরের সাথে আলাপে লিপ্ত হয়, ক্লাসের সময়টুকু কাটিয়ে দেয় কোনোমতে। বস্তুত প্রথম পর্যায়ে শ্রেণিকক্ষগুলোতে উপচেপড়া ভিড় থাকে নবীন ছাত্রছাত্রীদের, কয়েকদিনের মধ্যে তারা বুঝে যায়—এই ভিড়ের ভেতর থেকে জ্ঞান আহরণ করা অসম্ভব প্রায়, তখন থেকে তারা শ্রেণিকক্ষ বিমুখ হতে শুরু করে এবং একসময় আশ্রয় নেয় প্রাইভেট টিউটর বা কোচিং সেন্টারের ছায়াতলে। বস্তুত শ্রেণিকক্ষে, প্রারম্ভিক পর্যায়ে অধিক ছাত্র উপস্থিতিই যে পরবর্তীকালে তাদের ভয়াবহ অনুপস্থিতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করবার অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

আমাদের প্রায় প্রত্যেকটা স্কুল-কলেজের শ্রেণিকক্ষ প্রয়োজনের তুলনায় ছোট, অস্বাস্থ্যকর। সেখানে পাঠদান ও পাঠগ্রহণ করবার মতো যথাযথ পরিবেশ নেই। প্রত্যাশিত পরিবেশ না পেলে শিক্ষক যেমন তাঁর সবকিছু ঢেলে পাঠকে হৃদয়গ্রাহী করতে পারবেন না, তেমনি শিক্ষার্থীরা পাঠ আত্মস্থ করতে পারবে না। উভয়ের মানসিক সংযোগহীনতা বা মিথস্ক্রিয়ার অভাব, অবচেতন প্রক্রিয়ায় দুপক্ষকেই শ্রেণিকক্ষবিমুখ করে তুলছে। এর ফলে শিক্ষক যেমন শ্রেণিকক্ষ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন, তেমনি বিদ্যালয়বিমুখ হয়ে যাচ্ছে শিক্ষার্থীরাও। তাতে দুই পক্ষের কেউ-ই সমস্যাবোধ করছে না। শিক্ষক গা ভাসিয়ে দিয়ে আরাম করছেন বা শিক্ষা ব্যবসায় বেশি বেশি সময় দিচ্ছেন, আর তার শিষ্যরা গাইড-নোট বগলে চেপে তাদের প্রার্থিত মূল শিক্ষাঙ্গন অর্থাৎ প্রাইভেট বা কোচিং সেন্টারের বাজারে পণ্যক্রয়ের জন্য বেশি সময় ব্যয় করতে পারছে। গণ্ডারকে চিমটি কাটলে বা কাতুকুতু দিলে এর প্রভাব বুঝতে তার নাকি অনেক সময় লেগে যায়। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় 'ভালো ফল' করবার অন্তরালে যে 'অদ্ভুত আঁধার' নেমে আসছে, এর পরিণাম বুঝতে কতদিন লাগবে, কে জানে।

শ্রেণিকক্ষে ব্যাপক হারে ছাত্র অনুপস্থিতি, ক্লাস নেয়ার প্রতি শিক্ষকদের ক্রমবর্ধমান অনীহা, শিক্ষার্থীদের নোট-গাইড বই নির্ভরতা, প্রাইভেট পড়া বা কোচিং করবার প্রতি শোচনীয় ঝোঁকবৃদ্ধি—এর দায় কার? কেবল শিক্ষক বা শিক্ষার্থীর? আমাদের সনাতনী শিক্ষাব্যবস্থা, সরকার কিংবা ব্যক্তি বা সমাজের বর্ধিষ্ণু কারবারি মানসিকতা, এর সাথে আদৌ কি প্রযুক্ত নয়? ব্যাপারটা তলিয়ে দেখা যেতে পারে;

শ্রেণিকক্ষে মানসম্মত পাঠদান নিশ্চিত করবার জন্য প্রথম প্রয়োজন শিক্ষকের মেধা, উন্নত উপস্থাপনভঙ্গি, পাঠকে আকর্ষণীয় করে তোলবার দক্ষতা। (এসব গুণাগুণ যাচাই-বাছাইয়ের রীতি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় না বললেই চলে।) দ্বিতীয় প্রয়োজন, শ্রেণিকক্ষের যথাযথ পরিবেশ এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সুষম অনুপাত। এ দুটো বিষয়ের যথার্থ প্রয়োগ ঘটানোর দায় বা দায়িত্ব পুরোটাই সরকারের। তাছাড়া আইনের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও গাইড বই, নোট বইয়ে বাজার কীভাবে সয়লাব হয়ে যাচ্ছে, এর জবাব তো সরকারকেই দিতে হবে।

ক'বছর আগে (১৫ নভেম্বর, ২০০৮) একটি বেসরকারি গবেষণা সংস্থা, নাম 'এডুকেশন ওয়াচ'—এর তথ্যসমৃদ্ধ এক জরিপ প্রকাশিত হয়েছিল দৈনিক সংবাদ পত্রিকায়। 'মাধ্যমিক পর্যায়ে ৮৬ ভাগ শিক্ষার্থী কোচিং

www.pathagar.com

সেন্টারের উপর নির্ভরশীল'—শিরোনাম শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, 'শহরাঞ্চলে অবস্থিত সরকারি স্কুলে গৃহশিক্ষকের সাহায্য নেয়া ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা শতকরা ৯৬.০১ ভাগ, বেসরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৯১.০২ ভাগ, গ্রামাঞ্চলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গৃহশিক্ষকের সাহায্য নেয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা শতকরা ৮৮ ভাগ, শহরাঞ্চলে মাদ্রাসায় ৮৩.০৩ ভাগ এবং গ্রামাঞ্চলের মাদ্রাসায় গৃহশিক্ষকের সাহায্য নেয়া শিক্ষার্থীদের সংখ্যা শতকরা ৭৪.০৩ ভাগ।' রিপোর্টটিতে আরো বলা হয়েছে, 'উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে এ চিত্র আরো ভয়াবহ।... সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোচিং সেন্টার বা গৃহশিক্ষকমুখী প্রবণতা আরো বেশি।' এবং এসব শোচনীয় অপপ্রবণতার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, 'শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের অভাব, শ্রেণিকক্ষে পাঠদান না করে শিক্ষকদের টিউশনি ও কোচিং সেন্টারমুখী প্রবণতা, কোচিং সেন্টারগুলোর বাহারি অফার, ব্যবহারিক পরীক্ষায় অধিক নম্বর প্রাপ্তির প্রত্যাশা' ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপরিউক্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে দুটো প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, ১. যে সকল শিক্ষার্থী গৃহশিক্ষক বা কোচিং সেন্টারের সাহায্য নেয়, ওই সাহায্যকারীরা তাদেরই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কি না? ২. শতকরা ৮০-৯০ ভাগ শিক্ষার্থীর পড়াশোনা যদি গৃহশিক্ষক বা কোচিং সেন্টারের মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়, তাহলে মাত্র ১০-২০ ভাগ শিক্ষার্থীর জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু রেখে লাভ কী? ওদের সামগ্রিক শিক্ষার ভারও কি গৃহশিক্ষক বা কোচিং সেন্টারের উপর ছেড়ে দেয়া যায় না? জানি শেষ প্রশ্নটা সবার কাছে হাস্যকর ঠেকবে, তবু বলি ব্যয় এবং প্রাপ্তির মধ্যে যদি ন্যূনতম সামঞ্জস্য না থাকে, তাহলে আজেবাজে চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খেতেই পারে।

গৃহশিক্ষক এবং কোচিং সেন্টারে পাঠদানকারীর মধ্যে শতকরা কতজন স্কুল-কলেজের শিক্ষক, আর কতজন অন্য পেশাগত বা স্রেফ বেকার—এর সঠিক পরিসংখ্যান জানা নেই আমাদের। পরিসংখ্যান যা-ই হোক, শিক্ষক সমাজের জন্য এর কোনোটাই সুখকর বিষয় নয়। এক্ষেত্রে শিক্ষকের অনুপাত বেশি হলে, তা তাঁদের শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের প্রক্রিয়া বা নিষ্ঠাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলবে। বলা হবে, একই শিক্ষকের শ্রেণিকক্ষ ছাত্রহীন থাকলেও তাঁর বাসায় সারাক্ষণ স্কুল জমে থাকে কেন? পাঠদানে তাঁর কি দ্বৈত রূপ আছে? প্রতিষ্ঠানে এক রূপ, আর গৃহ শিক্ষকতার প্রাক্কালে ভিন্ন রূপ? তিনি কি প্রকৃত শিক্ষক, নাকি পাঠব্যবসায়ী?

www.pathagar.com

আর টিউশনি বা কোচিং জগতে যদি অশিক্ষকদের প্রভাব বেশি হয়, তাহলে বলা হতে পারে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা যথাযথ পাঠদানে ব্যর্থ বিধায়, শিক্ষার্থীরা ওদেরই শিক্ষক ছেড়ে ভিড় জমাচ্ছে অন্যদের কাছে, যারা ভালো ফলাফলের নিশ্চয়তা দিতে পারছে। (এখানে বলে রাখা ভালো, এই অশিক্ষকরা—যারা টিউশনি বা কোচিং করায় জড়িত, তারা কোনো চাকরি পায়নি বলেই বাধ্য হয়ে ওই কাজে নেমেছে)। বস্তুত আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাইভেট-কোচিং ইত্যাদি বিষয় এমনভাবে লেপ্টে আছে, যাতে সুনির্দিষ্ট কাউকে দায়ী বা দোষী সাব্যস্ত করবার উপায় নেই। এ ব্যাপারে সরকারের দায়ও কম নয়। গৃহশিক্ষকতা বা কোচিং সেন্টার বন্ধ করবার উদ্যোগ নিয়ে সরকার বারবার ব্যর্থ হচ্ছে কেন, এটা খুব মূল্যবান প্রশ্ন নয়?

আমাদের শিক্ষার্থীরা গৃহশিক্ষক বা কোচিং সেন্টারে কেন পড়তে যায়? তাদেরকে কি কেউ বাধ্য করে নিয়ে যাচ্ছে ওখানে? হ্যাঁ মানছি, অল্প ক্ষেত্রে তারা বাধ্য হচ্ছে বটে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাচ্ছে স্বেচ্ছায়। কারণ, বাজার অর্থনীতির যুগে, যন্ত্রপ্রভাবিত সময়ে—সবাই সবকিছু সহজে পেতে চায়। অর্থ এখানে তুচ্ছ, আরাম এবং প্রাপ্তিটাই আসল। এখন রান্নায় কষ্ট লাঘব বা সময় বাঁচানোর জন্য প্রেসার কুকার আছে। কাপড় কাচার জন্য ওয়াশিং মেশিন আছে। শরবত বানানোর জন্য জুসার কিংবা ব্ল্যান্ডার আছে। তাহলে পড়া তৈরি বা শেখার জন্য কোনো যন্ত্র থাকবে না কেন? বাঙালি সৃষ্টিশীল কাজে দুর্বল বটে, তবে নষ্টসৃষ্টিতে তার তুলনা বিরল। আমরা সৎ ও গুণী মানুষ তেমন বানাতে পারি না। তবে বিদ্যাজীবী ও বিদ্যা বিক্রির যন্ত্র বানাতে পারি সহজেই। আমাদের গৃহশিক্ষক বা কোচিং সেন্টারগুলো হলো বিদ্যাবিক্রয় কেন্দ্র, নিজের পরিশ্রম বাঁচিয়ে টাকা দিয়ে যেখান থেকে বিদ্যা ক্রয় করা যায়। অঙ্ক কঠিন লাগছে? কিংবা ইংরেজি? নিজে ভাববার বা কষ্ট করবার দরকার কী? ওই কষ্টটা অন্যরা করে দেবে, টাকার বিনিময়ে। গৃহশিক্ষক বা কোচিং সেন্টার যাবতীয় সমস্যার সমাধান দেবে। শিক্ষার্থীর কাজ কেবল দুটো, টাকা ঢালা এবং ক্রীত বিদ্যা গলাধঃকরণপূর্বক পরীক্ষা নামক অনুষ্ঠানে তা বমন করে আসা। আমাদের দেশ গরিব বটে, তবে বিদ্যা ক্রয়ে আমরা যে যথেষ্ট ধনবান এবং দরাজ, এর প্রমাণ পাই স্তর নির্বিশেষে সকল অভিভাবকের গৃহশিক্ষক বা কোচিং সেন্টারপ্রীতি দেখে।

বিদ্যাবিষয়ক কারবারে ক্রেতার ভূমিকা মুখ্য বটে, তবে বিক্রেতার ভূমিকাকে গৌণ বলা যাবে না। বর্তমান যুগের শিক্ষকরা কেবল পেশাজীবী নন, তারা 'উপরি ইনকামে' যথেষ্ট অনুরক্ত। এখানে অন্য অফিসের মতো ফাইল

www.pathagar.com

আটকে, অথবা ভিজিট নিয়ে টাকা কামাবার সুযোগ নেই, বিধায় তারা উদ্ভাবন করেছেন নিজস্ব রীতি। শ্রেণিকক্ষে তারা কৃপণ, প্রাইভেট পড়ানো বা কোচিং সেন্টারে খুব দরাজ মন। মুখের হাসি বা পেটের বিদ্যে—শ্রেণিকক্ষে তা যেন লজ্জাবতী লতা, নিজস্ব আঙ্গিনায় তা উদ্বেল তরঙ্গমালা। তাদের এই দ্বৈতরূপে শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্ত, পাঠবিষয়ে উদ্বিগ্ন, তাই শিক্ষকের কালোমুখ ভুলে আলোমুখের সন্ধানে কেবলই ছুটে যায় তারা, 'অন্য কোথাও অন্য কোনোখানে'।

যে দেশে মেধার বিচার করা হয় সনদের স্ফীতি ও ভারিত্ব দেখে, সেখানে জ্ঞান বাদ দিয়ে সবাই দৌড়ায় ভালো ফলের দিকে। এই ভালো ফলের গ্যারান্টার কে? হয় প্রাইভেট টিউটর, নতুবা কোচিং সেন্টার। আজকালকার ছেলেরা যেমন মা-বাবার প্রতি উদাসীন থেকে দায়িত্ব নেয় শ্বশুর-শাশুড়ির, তেমনি এখনকার শিক্ষকরা মূল প্রতিষ্ঠান ফেলে প্রাইভেট পড়ানো বা কোচিং সেন্টারের প্রতি বেশি অনুরক্ত বা দায়বদ্ধ। গ্যারান্টি দিয়ে এক-দুইবার ভালো ফল করাতে পারলেই হলো; তারপর ছাত্র আসতে থাকবে নদীর ঢেউয়ের মতো, অথবা আগুনে আত্মাহুতি দেয়া পোকার মতো। টাকার অঙ্ক যা-ই হোক, সেটা গৌণ বিষয়, রেজাল্ট ভালো করাতে পারলে টাকা ঢালার লোকের অভাব নেই বঙ্গদেশে।

এর আগে আমরা চোরাকারবারি সিন্ডিকেট, ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট, আন্ডার ওয়ার্ল্ড সিন্ডিকেট ইত্যাদির নাম শুনেছি। এখন শুনতে পাচ্ছি 'টিউটর সিন্ডিকেটের' কথা। সরকারি-বেসরকারি স্কুল-কলেজের অনেক শিক্ষক নাকি এ রকম সিন্ডিকেটের সাথে জড়িত। মনে করা যাক, একজন শিক্ষার্থী ইংরেজি পড়তে গেছে জনৈক শিক্ষকের কাছে। তখন ওই শিক্ষক বলবেন, 'হ্যাঁ, আমি তোমাকে ইংরেজি পড়াব, তবে এক শর্তে। তোমাকে বাংলা পড়তে হবে অমুকের কাছে;' বাংলার শিক্ষক নতুন পথের সন্ধান দেবেন, 'সমাজকর্মের খুব ভালো নোট মেলে তমুকের কাছে। যোগাযোগ করো।' সমাজকর্ম বলবেন, 'কাল থেকে ওমুখ কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়ে যেও। ওখানকার পড়ানোর সিস্টেম খুবই উন্নতমানের।' বস্তুত ছাত্রটির ইংরেজি পড়বার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু একটা বিষয় পড়তে গিয়ে সে জড়িয়ে গেল সিন্ডিকেটের জালে। ইংরেজি পড়বার জন্য সে অন্য কোথাও যাবে? লাভ কী? সেখানেও আছে অনুরূপ চক্রজাল। বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকরা নাকি সিন্ডিকেট গঠনে খুবই শক্তিশালী। কারণ তাদের হাতে আছে ব্যবহারিক পরীক্ষার কাঁচা নম্বর, যা ইচ্ছেমতো যাকে-তাকে যত খুশি দেয়া যায়। ক'বছর আগে সরকার নিয়ম করেছিল, এক কলেজের শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক পরীক্ষা দেবে অন্য কলেজে। সরকারের সে

www.pathagar.com

সদিচ্ছা কাজে আসেনি। এ কলেজ-ও কলেজ মিলে নতুন সিন্ডিকেট গঠিত হয়ে গেছে, যার মূলকথা, 'ফেল কড়ি মাখ তেল, পড়ো প্রাইভেট, নতুবা প্র্যাকটিকেলে ফেল।' শিক্ষকরা কোনো বিষয়ে সহসা একমত হন না, লাভজনক খাত কেবল ব্যতিক্রম।

পুরনো আমলের শিক্ষককুল ছিলেন জ্ঞানতাপস। তাঁরা অবসর সময়ে বিদ্যাচর্চা করতেন। নব্যযুগের অনেক শিক্ষকের অবসর বলতে কিছু নেই। ভোর থেকে মধ্যরাত অব্দি (মাঝখানে মূল প্রতিষ্ঠানকে কিছুটা সময় দিতে হয়) তিনি বিদ্যাদানে নয়, বিদ্যা বিক্রিতে ব্যস্ত থাকেন। তার বাসাকে মনে হতে পারে আলাদা একটা বিদ্যাকেন্দ্র, যা আসল বিদ্যাকেন্দ্রের তুলনায় বদ্ধ অপরিসর হলেও অনেক বেশি মুখর। এদের কেউ কেউ কোচিং সেন্টারে গিয়ে ক্লাস নেন, কেউ আড়াল থেকে কোচিং সেন্টার পরিচালনা করেন, কেউ নিজের লেখা নোটের ব্যবসা করেন শহর থেকে শহরান্তরে। আমাদের পরীক্ষাপ্রধান শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে শিক্ষককুলের একাংশ শিক্ষাকে স্রেফ পণ্য বানিয়ে ফেলেছেন, এবং তা চড়া দামে বিক্রি করে যাচ্ছেন। তাদের এই অপপ্রবণতা, প্রাইভেট পড়ানো বা কোচিং সেন্টারগামিতা বন্ধ করতে না পারলে শিক্ষার প্রকৃত প্রসার ঘটানো সম্ভব হবে না।

একটা আকাশকুসুম কল্পনা করে নিই; ধরে নিলাম, সরকার একটা অসম্ভব কাজে সফল হলো। সকল শিক্ষককে আইন করে বিরত রাখল প্রাইভেট টিউশন বা কোচিং সেন্টারের ব্যবসা থেকে। তো শিক্ষককে বিরত করা গেলেও যারা সরকার-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কেউ নয়, তাদেরকে গৃহশিক্ষকতা বা কোচিং সংলগ্নতা থেকে বিমুক্ত করবার উপায় কী? কঠোর আইন করে, জেল খাটাবার ভয় দেখিয়ে টিউশনি বা কোচিং পরিচালনা বন্ধ করা যাবে? সরকার তো দু-একবার খণ্ডিত উদ্যোগ নিয়ে দেখেছে, পেরেছে কি? যে দেশে গুটিকয় প্রকাশনা থেকে বেরুনো গাইড বই, নোট বই সরবরাহের অবৈধ কাজটি রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না, সে দেশে গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা টিউশনি বা কোচিং পদ্ধতি বিনাশ করা আদৌ সম্ভব? ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি, শিক্ষাবাণিজ্য বন্ধ করবার জন্য সরকার যে ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে—তা ছিল লোক দেখানো, দায়সারা গোছের—আইন প্রয়োগের কঠোরতা বা লক্ষ্য অর্জনকল্পে যথেষ্ট সক্রিয়তা ওই পদক্ষেপে ছিল না। কিন্তু কেন? এ ব্যাপারে সরকারের আন্তরিকতার অভাব আছে নাকি?

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে প্রায়ই দেখতে পাই, অবৈধ গাইড-নোট বই বিক্রির কাজ কোথাও

www.pathagar.com

দেখতে পেলে, তা যেন এনসিটিবি বা সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করা হয়। বিজ্ঞপ্তিটি দেখে ভেতরের হাসি সংবরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে; কারণ অবৈধ গাইড বই, নোট বই দেশের সকল লাইব্রেরি থেকে অবাধে এবং প্রকাশ্যে বিক্রি করা হচ্ছে, সে খবর আমজনতা জানে, অথচ এনসিটিবি তা জানবে না—ভাবতে খুব কষ্ট হয়। গাইড কিংবা নোট বইয়ের যতগুলো কারখানা আছে, এর বেশিরভাগের অবস্থান এনসিটিবির কাছাকাছি, ওই কারখানাগুলো বন্ধ করতে পারলেই কার্যসম্পাদন প্রায় সফল হয়ে যাবে, সে-কথা কি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি বোঝে না?

আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় টেক্সট বইয়ের গুরুত্ব নিঃশেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই, এখন কেবল গাইড আর নোট বইয়ের রাজত্ব। লাইব্রেরিগুলো যেমন গাইড-নোটে ঠাসা, শিক্ষার্থীর পড়ার টেবিলও তেমনি। সেখানে মূল বইকে ছাপিয়ে, বা এর অস্তিত্ব বিলীন করে দিয়ে বাহারি রঙে শোভা পাচ্ছে বিভিন্ন প্রকাশনীর শতভাগ গ্যারান্টিযুক্ত গাইড কিংবা নোট বই। অভাবনীয় বিষয় হলো, সরকার একদিকে গাইড নোটনির্ভর শিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করছে, অন্যদিকে দেখি—মূল বই হাতে আসার আগেই সরকার নিয়ন্ত্রিত অনেক ব্যক্তির নাম খোদিত গাইড-নোটে বাজার সয়লাব হয়ে যাচ্ছে এবং তাদেরকে কোনোরূপ শাস্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছে না। সত্যিই সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ!

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায়, শুধু আমাদেরই বা কেন, পশ্চিম বাংলাতেও গাইড-নোটের দাপট ক্রমশ বেড়েই চলেছে। পত্রিকার পাতা কিংবা টিভির বিজ্ঞাপনে কী মোহনীয়ভাবে প্রচার করা হচ্ছে গাইড নোট বইয়ের অপার মহিমা। কারবারি যুগে বহুল পরিচিত একটি কথা, 'প্রচারেই পসার।' খুবই সত্যি কথা, রঙে-ঢঙে, নাচে-গানে, কী সূক্ষ্মভাবে মগজ ধোলাই করা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের, যেন ভালো রেজাল্ট করবার জন্য গাইড-নোট বই-ই আসল। বিভ্রান্ত শিক্ষার্থীরা লাইন দিয়ে সে বই কিনছে, টেক্সট বই ফেলে নাইচে কেবল নোট-গাইড বইয়ের সমুদ্রে। অবস্থাটা এমন ভয়াবহ যে, 'স্কুল কলেজের যে কোনো ছাত্রের পড়ার টেবিলের দিকে তাকালে দেখবেন, একদিকে নোট বইয়ের পাহাড়, আরেকদিকে টেক্সট বইয়ের টিলা। এতে টেবিলের ভারসাম্য যদি বা নষ্ট না হয়, লেখাপড়ার নিঃসন্দেহে হয়। তার সময়ের উপর নানারকম দাবি মিটিয়ে একটি ছাত্র দিনান্তে বা নিশান্তে যখন তার পড়ার টেবিলে বসে, তখন উচ্চচূড় নোট বইগুলো তার সব আগ্রহ ও মনোযোগকে গ্রাস করে। তার পাশে টেক্সট বইগুলো মূর্ছায় অসাড় হয়ে পড়ে থাকে। সত্যি কথা বলতে কী,

www.pathagar.com

সুয়োরানীকে অতিক্রম করে দুয়োরানী-সন্দর্শন যেমন গল্পের রাজার পক্ষে সহজ ছিল না, তেমনি নোট বইয়ের ভ্রুভঙ্গি অগ্রাহ্য করে, নিমীলিতনেত্র টেক্সট বইগুলোর সঙ্গে প্রিয়সম্ভাষণ ছাত্রের পক্ষেও প্রায়ই দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া, সময় যেখানে সীমিত, এবং উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট, সেখানে তাকে বাধ্য হয়ে দুইয়ের মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হয়। এবং ঠ্যাং ছেড়ে লাঠির মতো, সে টেক্সট বই ছেড়ে নোট বই বেছে নেয়। কেননা, তার অভিজ্ঞতা তাকে বলে দেয় যে, নোটবই ছাড়া পড়া-পড়ানো, পরীক্ষা পাস, কোনোটাই সম্ভব নয়। সে দেখেছে, যেসব শিক্ষক বাড়িতে নোট বই দেখে পড়া তৈরি করেন, মলাটে ঢেকে ক্লাসেও আনেন, বোধহয় ছাত্রের কাছে ধরা পড়বার ভয়ে, তাঁরাই নোট বইয়ের বিরুদ্ধে বড় গলায় জেহাদ ঘোষণা করেন। তাই বেশির ছাত্র টেক্সট বই কেনে, কিন্তু পড়ে না। কিন্তু নোটবই ওরা কেনে, ধার অথবা চুরি করে, এবং পড়ে। তাই আমাদের লেখাপড়াকে আমরা যখন পুঁথিসর্বস্ব বলে নিন্দা করি, তখন বন্ধনীর মধ্যে পুঁথির অর্থ নোট বই, এ কথাটাও না লিখে বোধহয় ভুল করি।' [শিক্ষা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা—সুনীল চট্টোপাধ্যায়, পৃ-১৩৯]।

ওই যে ঠ্যাং ছেড়ে লাঠি ধরার প্রবণতা বা টেক্সট বই ফেলে নোটবই পড়ার প্রতিযোগিতা—এর মাঝে ছাত্র শিক্ষকের অপভূমিকা যেমন আছে, তেমনি আছে পুস্তক ব্যবসায়ীদের ধূর্ত-অপতৎপরতা। সুনীল বাবুর ভাষায়, 'সাধারণত একটা পাঠ্য বইয়ের যা দাম, নোট বইয়ের দাম অন্তত তার তিন গুণ করা হয়। দাম কমলে, বিক্রি করে লাভও কম হবে। সুতরাং পুস্তক বিক্রেতাদের নোটবই বিক্রি সম্পর্কে উৎসাহ থাকবে না। তাই ব্যবসায়ের স্বার্থে দাম উঁচুতে রাখতে হয়। আর ছাত্রদের কাছ থেকে বেশি টাকা নিতে গেলে, অন্তত ভারী ওজনের একটা বই তার হাতে তুলে দিতে হয়। কেননা, নোট বইয়ের মলাটে মোটা অক্ষরে যাঁর নাম লেখা থাকে, অনেক সময় বইয়ের একটি পৃষ্ঠাও যে তিনি লেখেন না, এ কথা এখন আর ছাত্রদের কাছেও গোপন নেই। তাই তারা লেখকের নামকে তত বেশি গুরুত্ব দেয় না। তাই ঘুরে ফিরে শেষ পর্যন্ত বহর দেখেই নোট বই কেনে। ভালোমন্দ বিবেচনা করে কেনে না, কিনতে পারে না। ব্যবসায়ীরা সে কথা জানেন, এবং তার ষোল আনা সুযোগ নেন।' [পৃ-১৩৮]।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বড় ত্রুটি এই যে, এখন পরীক্ষার খাতার মান যাচাই করে নম্বর প্রদান করা হয় না। উত্তর যতই অবান্তর, এলোমেলো, অসংলগ্ন হোক, হোক না রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কোনো লেখকের নামের বানান ভুল, বাক্য

www.pathagar.com

হোক না শ্রীবর্জিত—কাঁচা, নম্বর তাতে তেমন কমে না। চারদিক থেকে শোনা কথা, এখন নাকি তথ্য উপস্থাপন করতে পারলেই কেল্লাফতে, অর্থাৎ গীতাঞ্জলি রচয়িতার নাম জানাই যথেষ্ট, নামের বানান না জানলেও ক্ষতি নেই, ভুল বানান ও বাক্য দিয়ে প্রশ্নের উত্তরটি কোনোভাবে স্পষ্ট করতে পারলেই ভালো নম্বর পাওয়া যায়। কথাটি যে অসত্য নয়, এর প্রমাণ পাই বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা, এমনকি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত স্নাতক (পাস), সম্মান, স্নাতকোত্তর স্তরের পরীক্ষায় এ-প্লাস আর ফার্স্ট ক্লাস পাওয়াদের ছড়াছড়ি দেখে। ক'দিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, ২০১২ সালে ওই প্রতিষ্ঠানে ভর্তিচ্ছুদের শতকরা ৫৫ ভাগ এ-প্লাস পাওয়া শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি অর্থাৎ ১০০ এর মধ্যে ৩৩ নম্বর পায়নি। এই অভাবনীয় পরিসংখ্যান কি প্রমাণ করে না যে, আমাদের শিক্ষার্থীরা বিশেষায়িত পরীক্ষায় খুব নম্বর পাচ্ছে বটে, কিন্তু তাদের মেধার বিকাশ প্রত্যাশিতভাবে ঘটছে না।

বাস্তবিক পক্ষে আমরা, এমনকি শিক্ষাসংক্রান্ত নীতি নির্ধারকগণও ভুলে গেছেন যে, পরীক্ষায় উচ্চ নম্বরপ্রাপ্তি আর সত্যিকার মেধার বিকাশ ঘটানো এক কথা নয়। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সবাইকে পরীক্ষার্থী বা নম্বরার্থী হিসেবে গড়ে তুলছে। বছর বছর পাসের হার বাড়ছে, গড় নম্বর অর্জনের হারও বাড়ছে, তা গণিত-রসায়নে যেমন, তেমনি বাংলার দুই পত্রেও অভাবনীয়ভাবে আটানব্বই-নিরানব্বই করে নম্বর দেয়া হচ্ছে। প্রশ্ন হলো, ওই নম্বরটা সত্যিই কি ছাত্ররা অর্জন করছে, নাকি আমরা মানে পরীক্ষকরা দরাজমনে দিয়ে দিচ্ছি? ভাষা বা সাহিত্যবিষয়ক উত্তরপত্র এখন নাকি নন্দনতত্ত্ব বা ব্যাকরণগত দৃষ্টি ফেলে যাচাই করা হয় না, সবকিছু দেখা হয় 'ইনফরমেশন' এর আলোকে; তাই আমাদের শিক্ষার্থীরা এখন কেবল তথ্য মুখস্থ করে, বিষয়ের গভীরে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না, এতে তাদের জানা হয় অনেক কিছুই, কিন্তু মনের দুয়ার অবরুদ্ধ থেকে যায়। এই 'ভালো রেজাল্ট'নির্ভর বা তথ্যনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন না ঘটালে, নবীন প্রজন্মের ভেতর নন্দনতত্ত্বধারী মুক্তবুদ্ধির মানুষ মেলানো কঠিন হয়ে যাবে।

২. মাদ্রাসাভিত্তিক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা : আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষার পশ্চাদগামিতা, অবৈজ্ঞানিকতা, ক্ষেত্রবিশেষে অনুপযোগিতা নিয়ে হরেক রকম বিতর্ক শোনা গেলেও, বাস্তববতা হলো—বাংলাদেশের

www.pathagar.com

প্রেক্ষাপটে এ জাতীয় শিক্ষা এমন বিস্তৃত আকারে ছড়িয়ে পড়েছে যে, পেছন থেকে এর রাশ টেনে ধরা কঠিন। যে জাতি ইহলোক অপেক্ষা পরলোকের প্রতি বেশি সমর্পিত, বর্তমান অপেক্ষা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি মগ্ন, সে জাতিকে ধর্মীয় আদলের মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে টেনে আনা খুবই কঠিন কাজ। এ দেশে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রতি বছরই বাড়ছে, অনুপাতগত দিক থেকে বেশি বাড়ছে মাদ্রাসার শিক্ষার্থী। আধুনিক জনকল্যাণমুখী সকল রাষ্ট্রের শিক্ষা যখন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, বিশ্বায়ন ও মানবতাবোধকে কেন্দ্র করে পুনর্লিখিত হচ্ছে, তখন আমাদের দেশে ধর্মমুখী শিক্ষার উচ্ছ্বাসপ্রবণ ব্যাপকতা, কোনো আশার বার্তা বয়ে আনে না।

নতুন শিক্ষানীতি-২০০৯-তে বলা হয়েছে, 'মাদ্রাসা শিক্ষায় ইসলাম ধর্ম যথাযথ শেখানো হবে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জীবনধারণ সংক্রান্ত ও বিভিন্ন জাগতিক কাজকর্মে পারদর্শী হয়ে ওঠা ও উৎকর্ষ সাধন করার জন্য জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যথার্থ জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণ বা ইংরেজি মাধ্যমে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের সাথে প্রতিযোগিতায় তারা যেন সমানভাবে অংশ নিতে পারে সেই লক্ষে মাদ্রাসা শিক্ষা ঢেলে সাজাতে হবে। ...শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে অন্যান্য ধারার সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষায় অভিন্ন বিষয়সমূহ অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির মাধ্যমে বাধ্যতামূলকভাবে পড়ানো হবে। ...ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাক বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা প্রদান করতে হবে। দাখিল পর্যায়ে বাংলা ইংরেজি, গণিত (দশম শ্রেণি পর্যন্ত), তথ্যপ্রযুক্তি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকবে। ...সাধারণ শিক্ষার ন্যায় মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয় সংস্কার, শিক্ষা উপকরণ, বৃত্তিদান, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ ইত্যাদির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। ...সাধারণ শিক্ষাধারায় অনুসৃত শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রক্রিয়া মাদ্রাসা শিক্ষাধারায় অনুসরণ করতে হবে। তবে ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে (যথা—ইংরেজি, বাংলা, গণিত, বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়, কলা, কারিগরি শিক্ষা) বিভিন্ন পর্যায়ে প্রান্তিক মূল্যায়ন করবে নিজ নিজ দায়িত্ব অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বা প্রস্তাবিত তথ্যপ্রযুক্তি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কাউন্সিল। ধর্মীয় শিক্ষার মূল্যায়ন মাদ্রাসা বোর্ডের দায়িত্বে থাকবে।'

মাদ্রাসাশিক্ষা সম্পর্কে নতুন শিক্ষানীতির উপরিউক্ত ভাষ্য, এটাই প্রকটিত করে যে—বর্তমানে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার সাথে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা সমান উচ্চতায় চলছে না। প্রায় একই ধরনের সুপারিশ ছিল ড. কুদরত-ই-খুদা

www.pathagar.com

কমিশনেও, 'আটবছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষার পর মাদ্রাসার ছাত্ররা তিন বছর মেয়াদী বৃত্তিমূলক ধর্মশিক্ষা কোর্স পড়তে পারবে। এ কোর্সের নবম-দশম শ্রেণীতে তাদেরকে আমাদের প্রস্তাবিত আবশ্যিক চারটি পাঠ্য (বাংলা, গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান ও ইংরেজি) অবশ্যই অধ্যয়ন করতে হবে। ...আমরা আশা করি এ রূপ সংস্কারের ফলে মাদ্রাসা শিক্ষা আমাদের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এবং নতুন প্রাণরসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে' (ড. কুদরাত এ খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, বাকবিশিস, ১৯৯৬, পৃ-৫৭)।

বস্তুত আমাদের দেশে 'মাদ্রাসা বোর্ডের শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত পাঠ্যক্রমে বর্ণিত বইসমূহের বিষয়বস্তু নির্ধারণে ধর্মীয় অনুভূতির বিবেচনা প্রধান থাকে। দেশ, সমাজ ও বর্তমান বিশ্ববাস্তবতাকে তেমন প্রয়োজনে আনা হয় না। ...আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্টদের আধুনিক বিশ্বজগৎ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরি দক্ষতা, জ্ঞান ইত্যাদি খবই সীমিত' (বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষানীতি : ড. মমতাজউদ্দিন পাটোয়ারী, পৃ-৮৪)। শিক্ষা যদিও নিরন্তর পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া, দেশ-কাল-সময় ও বৈশ্বিক আবহকে ধারণ করে তা আবর্তিত হওয়ার কথা, কিন্তু আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষায় সমকালীন দাবির প্রতিফলন নেই। অথচ আমরা জানি, একসময় অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল শিক্ষিত পাদ্রি সৃষ্টির প্রতিষ্ঠান, সেখানে কেবল খ্রিস্টধর্মের আইন-কানুন শিক্ষা দেয়া হতো, কালের বিবর্তনে সেই দুটি প্রতিষ্ঠান আপাদমস্তক পাল্টে গিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হয়ে ওঠেছে।

ধর্ম যদিও একান্ত ব্যক্তিগত প্রপঞ্চ, তবু আমাদের দেশে মাদ্রাসাতে তো বটেই, শিক্ষার সকল আঙ্গিকে তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ধর্মকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ধর্মশিক্ষার ভার বিদ্যালয়ের উপর অর্পিত না হলে, আমাদের শিশুরা কি অধার্মিক হয়ে যাবে? বিশ্বখ্যাত পণ্ডিত বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছিলেন, If any morality is better than none, then religion has been a force for good. (Religion in Education, Education and social order, Unwin Books, London, 1967, page-6)। বস্তুত নৈতিক শিক্ষা আর ধর্মশিক্ষা কোনোভাবেই এক জিনিস নয়। ধর্ম হলো বিশ্বাসনির্ভর প্রপঞ্চ, আর নৈতিক শিক্ষা যুক্তিনির্ভর হৃদয়সঞ্জাত বিষয়। পশ্চাৎপদ দেশগুলোতে ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের মেলবন্ধনের প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। তারা না পারছে সর্বব্যাপী সক্রিয় বিজ্ঞানকে গ্রহণ

www.pathagar.com

করতে, না পারছে বিশ্বাসনির্ভর ধর্মকে খারিজ করতে। ধর্ম বলছে, পৃথিবী বা মানুষ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট। অন্যদিকে বিজ্ঞান বলছে ভিন্নকথা। একই শ্রেণিকক্ষে, একই শিক্ষার্থীকে দুটি বিপরীতমুখী তত্ত্ব দিলে, (ধর্মতত্ত্ব, আইনস্টাইন বা হকিং এর বিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্ব) শিক্ষার্থীর মননশীলতা বা সৃষ্টিশীল চিন্তা—নড়বড়ে হতে বাধ্য। কাজেই আমাদের মতো ধর্মভীরু জাতিরাষ্ট্রে, ধর্মের ঝাণ্ডা একচ্ছত্র রাখবার জন্য বিজ্ঞান শিক্ষাকে হয় চেপে যাওয়া হচ্ছে, নতুবা সুবিধামতো খণ্ডিত-আকারে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এম আকবর আলী 'ইবনে সিনা' গ্রন্থে দুঃখ করে বলেছেন, 'মুসলিম জগতে পীর, সূফী, দরবেশের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলেও নিউটন, আইনস্টাইন, কান্টের কোনো চিহ্ন কোথাও দেখা যায় না। খ্রিস্টীয় ধর্মোন্মাদনা ও ধর্মান্ধতার মধ্যেও গ্যালিলিও, কেপলারের আভির্ভাব হয়েছে। কিন্তু ইসলাম যখন ইসলাম সেবকদের হাতেই নির্যাতিত ও পর্যুদস্ত, তখনও তার মধ্যে ধর্মানুমোদিত বা ধর্মবিগর্হিত কোনো প্রকার জ্ঞানবিজ্ঞান সাধনার বিশেষ কোন একাগ্রতা দেখা যায় নাই' (এম আকবর আলী, 'ইবনে সিনা' ইসলামিক ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ, ১৯৫১, পৃ-৮)।

আমরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে পশ্চিমকে অনুকরণ বা অনুসরণ করছি। করছি না কেবল শিক্ষাব্যবস্থায়। 'পশ্চিম যেমন রাষ্ট্রকাঠামো থেকে ধর্মকে সন্তর্পণে সরিয়ে রেখেছে এবং রাষ্ট্রপরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো ধর্মই শিক্ষা না দেয়ার নীতি দীর্ঘকাল অনুসরণ করে আসছে, দেশজাতির ইহজাগতিক স্বার্থে আমরা সে পথ অবলম্বন করব না কেন? বর্তমানে বাংলাদেশে যে গণতন্ত্রের ঢোলকরতাল জোরেশোরে বাজানো হচ্ছে, সে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার স্বার্থেও এটা অপরিহার্য' (শিক্ষাভাবনা : শহিদুল ইসলাম, পৃ-১০৯)। কেবল গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের জন্যই বা কেন? মার্জিত, পরিশীলিত, বিজ্ঞানমনস্ক, সমকালীন বৈশ্বিক শিক্ষানীতির সাথে তাল মেলানোর জন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে অবশ্যই আধুনিকায়ন করা প্রয়োজন। কিন্তু কীভাবে? একটা উদাহরণ দেয়া যাক; ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের স্কুলগুলোতে বার্কলের 'ইনকোয়ারি' গ্রন্থটি পাঠ্য করবার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই উদ্যোগের বিরোধিতা করে বলেছিলেন, 'ইনকোয়ারি'র সাথে সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের আশ্চর্য রকম মিল আছে। যেহেতু দুটোই ভ্রান্ত দর্শন, তাই এমন দর্শনে প্রভাবান্বিত বই, যা একজন বিখ্যাত ইংরেজ লেখক কর্তৃক রচিত, তা পাঠ্য বই হিসেবে বিবেচিত হলে ছাত্ররা খুব গুরুত্ব দিয়ে পড়বে এবং একটা ভুল দর্শন শিখে বড় হবে।

www.pathagar.com

বস্তুত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও, যে দর্শনটি তত্ত্বগতভাবে ভুল, এর বিরোধিতা করে বিদ্যাসাগর যথার্থ শিক্ষাসংস্কারকের ভূমিকা পালন করেছিলেন।

লক্ষণীয় যে, ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা রাজনীতির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়ালেও, শিক্ষায় তারা ধর্ম বা সাম্প্রদায়িকতার ছোঁয়া লাগতে দেয়নি। ইংল্যান্ডের শিক্ষারীতির অনুকরণে ভারতবর্ষেও বিজ্ঞানভিত্তিক ধর্মবর্জিত আধুনিক শিক্ষা চালু করবার প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন ডেভিড হেয়ার। পরবর্তী পর্যায়ে গভর্নর জেনারেল কাউন্সিলের সদস্য ও জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশনের সভাপতি মেকলের সুবিখ্যাত শিক্ষা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়। উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সময় গৃহীত এই নতুন শিক্ষানীতির ঘোষণায় বলা হয়েছিল, 'The great object of the British Government ought to be the promotion of European literature and science among the natives of India and that all the funds appropriated for the purpose of education would be best employed on English education.'

বেন্টিঙ্ক কর্তৃক ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাপ্রদানের ঘোষণা তৎকালীন ভারতের হিন্দু-মুসলমানসহ কোনো সম্প্রদায়কেই খুশি করতে পারেনি। ফলে এ নিয়ে প্রচণ্ড বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল, গোঁড়া হিন্দু বা মুসলমানগণ-এর মাঝে ধর্মবিনাশের ষড়যন্ত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। মেকলের মতো উডের শিক্ষা প্রতিবেদনেও বলা হয় (১৮৫৪) :

Those institutions were founded for the benefit of the whole population of India and in order to effect their object it was and is indispensible that the education conveyed in them should be exclusively secular.

এরপর হান্টার কমিশন (১৮৮২), নাথান কমিটি (১৯১৩), স্যাডলার কমিশন (১৯১৭-১৯১৯) হয়ে ১৯৩৫ সালে গঠিত হয় 'কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড।' এটি প্রাক-প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার সকল পর্যায় বিশ্লেষণ করে সম্পূর্ণ ব্রিটিশ ধারার অনুকরণে নতুন শিক্ষারীতি প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয় :

To create in India in a period of not less than forty years, the same standard of Educational attainments as had already

www.pathagar.com

been attained in England. (Sayed Nurullah, J P Naik, A students History of Education in India, page-344).

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা চালু করা উচিত কি না—এ সম্পর্কে পর্যালোচনা করার জন্য লাহোরের বিশপ রেভা জি ডি বর্নের সভাপতিত্বে একটি রিপোর্ট প্রদান করা হয় (১৯৪৬) এবং দৃঢ়ভাবে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখার প্রত্যয় ঘোষণা করা হয় :

After fully considering all aspects of questions the Boards solved that while they recognize the fundamental importance of spiritual and moral instruction in the building of characters, the provision for such teaching, exception in so far as it can be provided in the normal course of secular instruction, should be the responsibility of the home and the community to which the pupil belong. (Report of the Education Reforms Commission, East Pakistan, 1957, page-3).

দেশ বিভাগের পর, যে আদর্শ ও লক্ষ্যের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল, তা সামনে এনে নতুন রাষ্ট্রের শিক্ষানীতি সম্পর্কে জোর দিয়ে ঘোষণা করা হয়,

'the educational system in Pakistan should be inspired by Islamic ideology emphasizing among many of its characteristics those of universal brotherhood, tolerance and justice.'

এবং অভাবনীয়ভাবে, মধ্যযুগের অনুকরণে শিক্ষা প্রসারের জন্য মসজিদগুলোকে দায়িত্ব প্রদান করা হয় :

In order to make sure that the right type of men are appointed Imams, the appointments should be controlled by the state through its educational agencies. (Proceedings of the third meeting of the Advisory Board of Education for Pakistan, Govt. of Pakistan, page-10).

জেনারেল আইয়ুব খানের শাসনামলে, এস এম শরীফ-নেতৃত্বাধীন কমিশনও প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ধর্মশিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে, নবম ও দশম শ্রেণিতে ধর্মকে নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে গণ্য করে বলা হয় :

www.pathagar.com

The moral and spiritual value of Islam combined with the freedom, intergrity and strength of Pakistan should be the ideology which inspires our educational system. (The Report of the Commission on National Education, 1958, page-11).

বস্তুত শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্ম নিয়ে অতিমাত্রায় মাতামাতি—পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণ বয়ে আনেনি। সেখানে মৌলবাদ কিংবা জঙ্গিবাদের দিনদিন বিকাশ ঘটেছে, এবং ভয়ঙ্কর ধর্মীয় উন্মাদনা রাষ্ট্রটিকে ঠেলে দিচ্ছে অন্ধকার অতল গহ্বরের দিকে।

অন্যদিকে একই সাথে স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারত কিন্তু পাকিস্তানের পথে না হেঁটে ইংরেজ প্রবর্তিত ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখেছে। বিশ্বের অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের শিক্ষাধারা অনুকরণ করে রাধাকৃষ্ণানের নেতৃত্বাধীন শিক্ষা কমিশনের ২১ ধারায় সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে :

No person may be compelled to pay any tax, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintainace of any particular religion or religious denomination. (The report of the University Education Commissin, Vol-1, Govt. of India, page-191).

সরকারি অর্থে পরিচালিত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্ম শিক্ষা দেয়া যাবে না—এই সিদ্ধান্ত মাথায় রেখে কমিশন দ্ব্যর্থহীনভাবে মত প্রকাশ করেছে :

No religion instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state fund. (Page-291).

একটি আধুনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের শিক্ষার সাথে ধর্মের সম্পর্ক পর্যালোচনা করে কমিশন বলেছে :

To be secular is not to be religiously illiterate. It is to be deeply spiritual and not narrowly religious. —— Religion cannot be imparted in the form of lessons. It is not be treated as one a number of subjects to be taught in measured hourly doses. Moral and religious instruction does not mean moral improvement. (Pase-300).

www.pathagar.com

বস্তুত দারিদ্র্য-অশিক্ষা-ধর্মীয় বিভেদ সত্ত্বেও ভারত তার গণতান্ত্রিক চেতনা অক্ষুণ্ন রাখতে পারছে, এর মূলে রয়েছে ওই দেশের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ও উন্নত উদার শিক্ষাব্যবস্থা।

এ দিক থেকে আমাদের চরম দুর্ভাগ্য এই যে, লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে আমরা পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়েছি বটে, কিন্তু ভারত বা পাশ্চাত্যের দিকে না তাকিয়ে আমরা পাকিস্তানি আদলে ধর্মশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছি এবং দশম শ্রেণি পর্যন্ত তাকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে স্থান দিয়েছি। এর অশুভ পরিণাম, পাকিস্তানের মতো সর্বগ্রাসী না হলেও, কমবেশি টের পাওয়া যাচ্ছে।

৩. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা : লর্ড বেকনের একটা উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক : 'The great technical discoveries were more ancient than philosophy and the intellectual arts, so that, to speak truth, when contemplation and doctrinal science began, the discovery of useful works ceased.' (Greek Science : Benjamin Farrington, page-309). বর্তমান বিশ্বে কারিগরি ও প্রযুক্তির প্রভাব অপরিসীম। জাপান, চীন, তাইওয়ান বা পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নতির মূল কারণ বৃত্তিমূলক বা কারিগরি শিক্ষার লক্ষণীয় বিকাশ। আমাদের দেশে, যেখানে উচ্চশিক্ষার হার তুলনামূলকভাবে বেশ কম, সেখানে কম শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে কর্মমুখী বা শিল্পবিকাশের ধারায় সংশ্লিষ্ট করার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব অনেক বেশি। সাধারণ শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া, অথবা এ ধারায় অনিচ্ছুক শিক্ষাগ্রহীতাকে হাতে-কলমে কাজ শিখিয়ে স্বাবলম্বী ও উপার্জন-সক্ষম দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা, যারা কেবল চাকরির উপর নির্ভরশীল না হয়ে স্বাধীনভাবে আত্মমর্যাদার সাথে জীবিকা নির্বাহে সচেষ্ট থাকবে, তাদেরকে সঠিক পথনির্দেশনা প্রদান করাই বৃত্তিমূলক শিক্ষার মূল লক্ষ্য। 'উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জাপান একটি সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ও শিল্পায়নের নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে পাশ্চাত্য দেশের প্রযুক্তি ও শিল্পবিপ্লবের ভাগীদার হবার প্রয়াস পায়। জাপান ও অন্যান্য দ্রুত উন্নয়নশীল দেশসমূহের উন্নয়নের গতিধারা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে সার্বিক প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পেছনে রয়েছে যথোপযুক্ত মানবসম্পদ উন্নয়নের কার্যক্রম। অপরদিকে পশ্চিমা দেশগুলোতে বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও

www.pathagar.com

প্রকৌশল শিক্ষার বিকাশ ঘটেছে—সেখানকার প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান গতিধারার সাথে তাল মিলিয়ে স্বাভাবিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এর ফলে ঐ সব দেশে শিক্ষাব্যবস্থার সাথে প্রয়োগ ক্ষেত্রের একটি সহজ সুন্দর যোগসূত্র সহজেই স্থাপিত হয়েছে এবং একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে গণ্য হয়েছে।... এ ধরনের শিক্ষাকে কেবল আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি বিশেষ অনুচ্ছেদ হিসেবে চিন্তা না করে সার্বিক জাতীয় ও সামাজিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে বিবেচনা করা হয়' [বাংলাদেশের কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষা সমস্যা : ড. ইকবাল মাহমুদ, শিক্ষাবার্তা, নির্বাচিত রচনা (১৯৮৭-১৯৯৭), এ এন রাশেদা সম্পাদিত, পৃ-১৪৮]।

শিক্ষানীতি-২০০৯ এ বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক স্তরে 'বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভিত্তিতে বা আরো বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকার্জনের পথে যাবে। ...কয়েকটি মৌলিক বিষয় যথা : বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ স্টাডিজ ও সাধারণ গণিতের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলক থাকবে।' (পৃ-২১) এ ছাড়া থাকবে বিভিন্ন ধরনের ঐচ্ছিক বিষয়।

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন ১৯৭৪ এ 'শিক্ষা ও উপার্জন কর'—এ রকম কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছিল এবং আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছিল, বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমিক পর্যায় শেষে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী কর্মজীবনে প্রবেশ করার সুযোগ পাবে এবং এর ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ জাতীয় শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটবে। অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি ১৯৭৯-তে উৎপাদনমুখী শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে চিহ্নিত করা হলেও, আমাদের দেশে নানাবিধ কারণে এ ধারাটির আশাপ্রদ বিকাশ ঘটেনি। শিক্ষার অন্যান্য ধারার তুলনায় এটা বিবেচিত যেন 'অন্ত্যজ শ্রেণি' হিসেবে। শিক্ষার সাধারণ ধারার সাথে যারা বেমানান বা মানানসই নয়, যাদের শিক্ষাজীবন থেমে যেতে যেতে সচল হয়ে আছে কোনোমতে, সাধারণত ওইসব ছেলেমেয়েরা অনেকটা ঠেকায় পড়ে আসে বৃত্তিমূলক শিক্ষাধারায়। উন্নত দেশে বৃত্তিবিষয়ে কারো কোনো মাথাব্যথা বা সমালোচনা নেই, আমাদের দেশে সেটি প্রবল বিধায় এখানকার সামাজিক অপবোধের কারণে বৃত্তিমূলক ধারাটি গতিবর্জিত হয়ে আছে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক সূচনা প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে, যুদ্ধফেরত সৈনিকদের পুনর্বাসিত করার জন্য। তখন এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল' স্কুল। দেশবিভাগের পর জাতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৫৯ এর সুপারিশে একটি কারিগরি পরিদপ্তর এবং এর অধীনে ৫৮টি মহকুমা

www.pathagar.com

শহরে একটি করে 'ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট' খোলা হয়। লক্ষ্য ছিল, দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে তোলা। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেই ধারাটি বিভিন্ন পরিবর্তন, পরিবর্ধনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় শিক্ষাবিকাশে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধারায় পরিণত হয়। প্রতি বছর এখান থেকে অগণিত শিক্ষার্থী পাস করে বেরিয়ে আসছে, তবে দুঃখজনক ব্যাপার হলো, তারা প্রত্যাশিত দক্ষতা ও কর্মকুশলতা অর্জন করতে পারছে না। এক সমীক্ষা অনুযায়ী বলা হয়েছে, ভিটিআই থেকে 'পাস করার পর এক বছর পর্যন্ত ৬০% ছাত্র বেকার থাকে।... এই প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ ক্ষমতার সামান্য অংশই পূরণ হয়, কেননা এগুলোতে সঠিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রশিক্ষক আছেন মাত্র ১৭%, প্রয়োজনের তুলনায় কাঁচামাল ১৩% ও যন্ত্রপাতি ৫০% আছে' (বাংলাদেশের কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষা সমস্যা : ড. ইকবাল মাহমুদ)।

বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার পাঠক্রম ও পাঠসূচি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এদের বাংলা, ইংরেজি, গণিত ইত্যাদি সাধারণ বিষয় ব্যতিরেকে যে সকল বিশেষ বিষয় পড়ানো হয়, যেমন জেনারেল ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্কস, ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, ড্রেসমেকিং, ওয়াইল্ডিং ইত্যাদি, এতে সাধারণ পড়া বা পরীক্ষা অপেক্ষা 'হাতেকলমে' শিক্ষার উপর বেশি জোর দেয়া হয়। কিন্তু আমাদের অপরাপর শিক্ষা ধারার মতো, ব্যবহারিক বা টিউটোরিয়াল অথবা ভাইভা—যে নম্বর প্রদানের ভার শিক্ষকের হাতে থাকে, যোগ্যতা বিচার না করে তা যথেচ্ছভাবে প্রদান করা হয়। ফলে দেখা যায়, ব্যবহারিক নম্বর বেশি থাকায় এবং যথেচ্ছভাবে তা অর্জিত হওয়ায় কারিগরি শিক্ষার ছাত্ররা অভাবনীয় নম্বর পেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তবে যথার্থ মেধা অর্জন করে না। পরবর্তীকালে এদের ভালো রেজাল্ট না প্রতিফলিত হয় কর্মে, না চাকরির পাওয়ার পরীক্ষায়।

বর্তমানে আমাদের দেশে সরকারি ছাড়াও, আরো কয়েকশো বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান চালু হয়েছে। এগুলোতে শিক্ষার্থীর অভাব নেই। অভাব কেবল দক্ষ প্রশিক্ষক, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের। এখানকার অনানুষ্ঠানিক কোর্স ও প্রশিক্ষণ স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে বিধায় প্রত্যাশিত মান অর্জন সম্ভব হয় না এবং এর সর্বজনস্বীকৃত মূল্যায়নও নেই। তাছাড়া এখানে হাতেকলমে শিক্ষা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেই। শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তাদেরকে শিল্পকারখানার সাথে সংযুক্তিকরণের ব্যবস্থা নেই। আবার আমাদের দেশে অনেক শিক্ষার্থী আছে,

www.pathagar.com

যারা বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাথমিক সনদপ্রাপ্ত হয়ে পরবর্তীকালে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলে যায়। এই প্রবণতার ফলে বৃত্তিমূলক বা কারিগরি শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়।

বাস্তবিকপক্ষে 'শিল্পায়নের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিশ্বব্যাপী কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। উন্নত বিশ্বে উচ্চশিক্ষার চেয়ে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিতের সংখ্যাই বেশি। পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়াসহ শিল্পোন্নত দেশগুলোয় কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়েছে। এশিয়ার শিল্পোন্নত দেশ জাপানে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ৬০ শতাংশই কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত। সিঙ্গাপুরে এ হার ৫০ শতাংশ। এমনকি উন্নয়নশীল দেশ মালয়েশিয়ার কারিগরি শিক্ষার হার ৪০ শতাংশ। অথচ বাংলাদেশে এ হার ২ শতাংশেরও কম' (বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষিত বেকার তৈরির কারখানা, সাপ্তাহিক ২০০০, ৩৯ সংখ্যা, ২০১০)।

কাজেই উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বৃত্তিমূলক বা কারিগরি শিক্ষাকে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। সরকার ২০২০ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষার হার ২০ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রতি জেলায় একটি করে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, প্রতি ইউনিয়নে একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হচ্ছে। বর্তমানে দেশে বা বিদেশে কল-কারখানা, অটোমোবাইল, টেক্সটাইল, ইলেকট্রনিক্স, গ্লাস, সিরামিক, ইলেকট্রিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে জনশক্তির চাহিদা যে পরিমাণে বাড়ছে, তাতে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করবার জন্য বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষাবিকাশে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

৪. ক্যাডেট কলেজীয় শিক্ষা : আমাদের দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সম্পূর্ণ সামরিক প্রশাসনের পরিচালনায় গড়ে ওঠেছে গুটিকয়েক ব্যয়বহুল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যার নাম ক্যাডেট কলেজ। সাধারণত শহরকেন্দ্রিক সেনানিবাসকে ঘিরে এসব প্রতিষ্ঠানের বিকাশ। ষষ্ঠ শ্রেণি অতিক্রান্তের পর, চরম প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ক্যাডেট কলেজের পড়া শুরু করতে হয় সপ্তম শ্রেণি থেকে। বাংলা ব্যতীত অন্যান্য বিষয় পড়তে হয় ইংরেজি মাধ্যমে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী সংখ্যা খুবই সীমিত। এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, ক্যাডেট স্কুলের একজন ছাত্রের জন্য প্রতি বছর যা ব্যয় হয়, সেই একই অর্থ দিয়ে সরকারি স্কুলের ১৪ জন এবং বেসরকারি স্কুলের ৫০ জন শিক্ষার্থীর ব্যয় নির্বাহ করা যায় (বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও

www.pathagar.com

শিক্ষা নীতি : ড. মমতাজউদ্দিন পাটোয়ারী, পৃ-৪৬)। এখানকার শিক্ষা ব্যয়, প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ, শিক্ষার্থীদের জীবনবোধ, পড়ালেখার ধরন ইত্যাদি দেখলে মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে, গরিব দেশের শীর্ণ শিক্ষাব্যবস্থায় এ বুঝি পাশ্চাত্য শিক্ষার ঝিকিমিকি।

বর্তমান বাংলাদেশে ক্যাডেট কলেজের সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে বাড়ছে। 'এ সব কলেজে সরকারি ভর্তুকিপুষ্ট ব্যবস্থার সুবিধে নিয়ে বিত্তবানদের সন্তানরা আধুনিকতম শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে, বিজাতীয় জীবনপদ্ধতি, সংস্কৃতি ও মনমানসে দীক্ষিত হচ্ছে, অন্যদিকে অর্থাভাবে গ্রামের হাইস্কুলগুলোর পড়াশোনা শিকেয় উঠছে। অথচ একটা ক্যাডেট কলেজের জন্য যে পরিমাণ সরকারি অর্থ ব্যয় হয়, তা দিয়ে হয়তো পঞ্চাশটা গ্রামীণ হাইস্কুল স্বচ্ছন্দে চালানো যায়। এসব ক্যাডেট কলেজে সামরিক-বেসামরিক আমলা কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী শিল্পপতি কিংবা ধনাঢ্য পিতামাতার সন্তানদের একচেটিয়া সংখ্যাধিক্য কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয়।...ধনীর সন্তান বেশি মেধাবী হয়ে জন্মগ্রহণ করে না, কিন্তু সামাজিক পরিবেশ, লালন-পালন এবং সযত্ন পরিচর্যার বৈষম্য দরিদ্র ছাত্রদের ক্রমশই পিছু টেনে রাখছে। এর ফলে ইদানীং তাবৎ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলোয় মেধাবী পরীক্ষার্থীদের তালিকায় ক্যাডেট কলেজগুলোর ক্রমবর্ধমান আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। তাই এ দেশে ক্যাডেট কলেজকে আধুনিক শিক্ষার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করার চেয়ে বিভিন্ন সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর সন্তানদের জন্য উদার সরকারি ভর্তুকিতে বৈষম্যমূলক শিক্ষা লাভের প্রতিষ্ঠান আখ্যায়িত করাই বেশি যুক্তিযুক্ত।' (বাংলাদেশে শিক্ষায় বৈষম্য : মইনুল ইসলাম, এ এন রাশেদা সম্পাদিত, শিক্ষাবার্তা, নির্বাচিত রচনা-১৯৮৭-১৯৯৭, পৃ-২৪৪)।

আরো একটা ব্যাপার, ইদানীং রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলগুলোকে ক্যাডেট কলেজের আঙ্গিকে সাজিয়ে এগুলোর কর্তৃত্বও সেনাবাহিনীর উপর ছেড়ে দেয়া হচ্ছে এবং সীমাহীন সরকারি ভর্তুকি নিয়ে কঠোর নিয়মের অধীনে শিক্ষা কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। বস্তুত এ জাতীয় শিক্ষা আমাদের শ্রেণিবিভক্ত সমাজকে আরো বৈষম্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

৫. উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষা : অষ্টম শ্রেণির পর ঝরে যাওয়া বা থেমে যাওয়া বা কোনো কর্মে প্রবেশকারীর শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ১৯৯২ সাল থেকে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এক ভিন্নধর্মী শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। প্রাথমিক পর্বে এটা ছিল দূরশিক্ষণনির্ভর এবং এতে কেবল বিএড কোর্সটি সম্পন্ন করা হতো। পরবর্তী পর্যায়ে নবম শ্রেণি থেকে

www.pathagar.com

স্নাতক কোর্স এবং এমএড-এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়। বর্তমানে এর আওতায় অনার্স-মাস্টার্স কোর্স চালু করার বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনায় রাখা হয়েছে। 'এ প্রোগ্রামে শিক্ষার্থীদের সুপরিকল্পিত ও পদ্ধতিনির্ভর পাঠ সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। এ প্রোগ্রামে মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিভিন্ন মড্যুল পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। এসব পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু ভাবগত ঐক্যের দিক থেকে কয়েকটি ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে এবং এতে সাধারণত তিন থেকে আটটি পাঠ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইউনিটসমূহে শিরোনাম ভূমিকা, পাঠের রূপরেখা, পাঠ বিভাজন, উপাংশ, চূড়ান্ত মূল্যায়নের ব্যবস্থা রয়েছে। বস্তুত এ কারণে পাঠ্য বইগুলো বহুলাংশে শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।' (সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা : ড. গোকুলচন্দ্র বিশ্বাস ও ড. উত্তম কুমার দাশ, পৃ-১১৫)

পাঠবিরত বা কর্মরত শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনায় রেখে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়াধীন সকল শ্রেণির পাঠ্যক্রম সাধারণ স্তরের পাঠক্রম অপেক্ষা ছোট করে প্রণীত। এর পরীক্ষা পদ্ধতি বেশ শিথিল, যেন জ্ঞান বিতরণ নয়—সনদ প্রদানই এ জাতীয় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এখান থেকে সনদ নিয়ে জজ ব্যারিস্টার বা বড় কোনো উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ নেই বটে, ছোটখাটো চাকরি পাওয়া, বা এ ধরনের অর্জিত চাকরি টিকিয়ে রাখাই এ জাতীয় শিক্ষার মূল লক্ষ্য। বিশ্ববিদ্যালয় নামধারী কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত জ্ঞান বিতরণ—সার্টিফিকেট বিলিকরণ নয়, অথচ দুঃখজনক হলেও সত্যি যে আমাদের এ বিশ্ববিদ্যালয়টি সেই কাজটি সক্রিয়ভাবে করে যাচ্ছে। প্রহসনধর্মী পরীক্ষা নেয়ার মাধ্যমে প্রতি বছর লাখ লাখ সার্টিফিকেট তুলে দিচ্ছে যার তার হাতে। এতে সমাজ বা দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা স্ফীত হচ্ছে বটে, তবে মেধা বিকাশের প্রকৃত প্রকৃতির বিন্দুমাত্র হেরফের হচ্ছে না।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি বা পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মান সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন না করে এর পরীক্ষা গ্রহণপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে দায়িত্ব নিয়ে বলা যায়, এ প্রতিষ্ঠানের নামের মতো এর পরীক্ষার হলগুলো যেন নকল করার জন্য উন্মুক্ত করে রাখা হয়। পরীক্ষার্থীরা পকেটে-ব্যাগে-জুতোর অন্দরে রাশি রাশি নকল নিয়ে আসে; কেউ কেউ নিয়ে আসে আস্ত বই। কক্ষে বসে তারা লুকিয়ে নকল করে না, শিক্ষকের সামনে বই দেখে প্রকাশ্যে লেখে। অধিকাংশ শিক্ষক, অসদুপায় অবলম্বনকারী কাউকে কিছু বলেন না। কয়জনকে বলবেন? কী বলবেন?

www.pathagar.com

কোনো কোনো শিক্ষক নকল করতে সহযোগিতা করেন ছাত্রকে। উত্তর বলে দেন, প্রয়োজনে উত্তর বের করে দেন বই থেকে। বহিঃপরিদর্শক বা ম্যাজিস্ট্রেট এলে নকল লুকোবার জন্য সবাইকে সতর্ক করে দেন। যেন নকলের মহোৎসবে ছাত্র-শিক্ষক এক ও অভিন্ন, তারা হাত ধরাধরি করে মিলেমিশে এ অপকর্মটি করে যান। নকল নামক মহাব্যাধিটি সাধারণ শিক্ষাস্তর থেকে সরে এসে সম্পূর্ণ পরাক্রম নিয়ে সওয়ার হয়েছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঁধে।

এখানকার পরীক্ষার্থীরা জানে, শিক্ষকরা মানেন—উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা মানেই নকল করবার জন্য উন্মুক্ত হয়ে আছে। প্রশাসনের কেউ গিয়ে পরীক্ষার হল খালি করে দিলেও 'স্পিকটি নট'। কিন্তু বহিঃপরিদর্শক কাউকে বহিষ্কার করতে গেলে বাঁধে গোল। পরীক্ষার্থীরা প্রতিবাদ জানায়, চোখ রাঙায়, কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ বিনয় দেখান, 'ওরা এমনই, নিয়মিত ছাত্র তো কেউ নয়, কত বছর ধরে বইখাতার সাথে যোগাযোগ নেই। যদি একটু সুযোগ না দেন তো...।"

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে সার্টিফিকেটগুলো আসে, এর বেশির ভাগ অর্জিত নয়—নকল করে পাওয়া। এ সার্টিফিকেট দিয়ে ব্যক্তিপর্যায়ে স্বার্থসিদ্ধি ঘটতে পারে, সমাজ বা জাতির কল্যাণ হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। প্রতিষ্ঠানটির উপযোগিতা সৃষ্টি করতে হলে হয় এর খোল-নলচে পাল্টে ফেলতে হবে, নতুবা কোটি কোটি সরকারি টাকা কেবল ব্যয় হতে থাকবে কাগুজি সনদপ্রদান নামক প্রহসনে।

শিক্ষাবিকাশে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আনুপাতিক হারের ধরন বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। আমাদের বেসরকারি স্কুল কলেজে ছাত্র শিক্ষকের অনুপাত ৪২ঃ১, ক্যাডেট কলেজে ৯ঃ১; বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানে ২৩ঃ১; মাদ্রাসায় ২৭ঃ১; সরকারি স্কুলে ৩০ঃ১; সরকারি কলেজে (উচ্চ মাধ্যমিক) ৪১ঃ১। এ পরিসংখ্যান থেকে আমাদের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার জীর্ণদশা সহজেই অনুমান করা যায়। এ প্রসঙ্গে বলা অসঙ্গত হবে না যে, স্কুল-কলেজকেন্দ্রিক সাধারণ শিক্ষা, যা এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মূল ভিত্তি, তাকে অগ্রাধিকার না দিয়ে অন্য ধারায় বেশি গুরুত্ব আরোপ—মোটেও শুভ লক্ষণ নয়।

উচ্চশিক্ষা : জাতীয় শিক্ষানীতি-২০০৯ এ স্পষ্ট বলা হয়েছে, 'বর্তমানে প্রচলিত উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশের মতো একটি স্বাধীন দেশের প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে মেটাতে সমর্থ নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চশিক্ষার সামগ্রিক

www.pathagar.com

ব্যবস্থায় পুনর্বিন্যাস আবশ্যক।' নতুন শিক্ষানীতিতে উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ণীত হয়েছে এভাবে :

* অবাধ বুদ্ধিচর্চা, মননশীলতা ও চিন্তার স্বাধীনতা বিকাশে সহায়তাদান করা।
* পাঠদান পদ্ধতিতে সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে দেশের বাস্তবতাকে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা, রাষ্ট্র ও সমাজের সমস্যা শনাক্ত করা ও সমাধান বের করা।
* নিরলস জ্ঞানচর্চা ও নিত্যনতুন বহুমুখী মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণার ভেতর দিয়ে জ্ঞানের দিগন্তের ক্রমসম্প্রসারণ।
* আধুনিক ও দ্রুত এগিয়ে চলা বিশ্বের সঙ্গে কার্যকর পরিচিতি ঘটানো।
* জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের উপযোগী বিজ্ঞানমনস্ক, অসাম্প্রদায়িক, উদারনৈতিক, মানবমুখী, প্রগতিশীল ও দূরদর্শী নাগরিক সৃষ্টি। (পৃ-৩১)।

বস্তুত উচ্চশিক্ষা সম্পর্কিত এ রকম সুভাষিত কথামালা এর আগে প্রণীত শিক্ষা কমিশনগুলোর পাতায় পাতায় কম ছাপা ছিল না। যেমন—কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনে বলা হয়েছিল, 'আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে নতুন নতুন জ্ঞানের আলোতে সর্বদা তাদের কারিকুলাম ও সিলেবাসসমূহ পুনর্বিবেচনা করে দেখতে হবে। যাতে আমাদের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মিটাতে পারে, বুদ্ধিগত জীবনের ক্ষেত্রে আমাদের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করতে পারে এবং বিশ্বের সর্বত্র আমাদের শিক্ষার সুনাম হতে পারে।' (বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, পৃ-৮৬)। এসব নীতিকথা, কেবলই যেন পুস্তকি কথা, বলার জন্য বলা। যে দেশের গোটা সমাজব্যবস্থা যুক্তিহীনভাবে ধর্মমুখী, যে দেশের সর্বজনীন শিশুক্লাসে 'হজরত উমরের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের তাৎপর্যময় কারণ' বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হয় (দ্রষ্টব্য : ৪র্থ শ্রেণির বাংলা বই), সে দেশে সম্পূর্ণ মানবিক, উদারনৈতিক, যৌক্তিক পাঠব্যবস্থা চালু করা সহজ কাজ নয়। তাছাড়া প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক মানসম্মত পাঠরীতি চালু করার মতো দক্ষ জনবল, মেধা, আর্থিক সঙ্গতি, মানসিকতা আমাদের আছে কি?

শিক্ষার প্রথম পর্যায় (প্রাথমিক শিক্ষা) যেন বীজ, মাধ্যমিক পর্যায় (ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি) যেন বীজ লাগানো জমি। বীজ এবং জমি যদি ভালো হয়, পরিচর্যা যদি সঠিকভাবে করা হয়—যদি কোনো প্রাকৃতিক

www.pathagar.com

দুর্যোগকবলিত না হয়, তাহলে ওই জমিতে ভালো ফসল ফলবেই। উচ্চশিক্ষা হলো ওই জমি থেকে উৎপন্ন ফসল, যা নিজে ভোগ করা যায়, যা দিয়ে অন্যকে সহায়তা করা যায় বা অকৃপণভাবে দান করা যায়। এটা নিজেকে বদলাবার, মানুষ হবার, অন্যকে বদলে দেবার, সমাজ বা রাষ্ট্রকে সেবা দেবার দ্যুতিময় উপকরণ। 'শিক্ষার এই স্তরে মানুষ শুধু জানবে না, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবে, সুসম্বদ্ধভাবে ও স্বকীয়ভাবে চিন্তা করতে পারবে, ও চিন্তাকে প্রকাশ করতে পারবে; তার বুদ্ধি, বিচার ও ব্যক্তিগত মূল্যবোধ উন্নত হবে। উচ্চশিক্ষা বলতে একটি পরিবেশও আমরা বোঝব, যেখানে সম্ভাব্য সকল ধারণা ও ভাবনাকে মুক্ত ও নিরপেক্ষ বিবেচনায় আনতে পারা যায়, কোনোরূপ বাধার সম্মুখীন না হয়ে। জ্ঞানচর্চা এই পরিবেশে প্রায়ই জ্ঞানচর্চার জন্যই হতে পারবে, আবার পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় কোনো বিশেষ সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যেও যেতে পারবে। মনুষ্য প্রজাতির বিবর্তন, তার ইতিহাস, তার সংস্কৃতি, তা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতনতা এই পরিবেশের অবদান। উচ্চশিক্ষা একই সঙ্গে ব্যক্তির বিকাশ ও সমাজের কল্যাণ—এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধনের উপায়' (বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকতা ও পেশাগত উন্নতি : জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, শিক্ষাবার্তা, পৃ-২৩০, ঐ)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দার্শনিক হেনরি নিউম্যানের বিখ্যাত বক্তৃতা, যা ছাত্র-শিক্ষকের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন ১৮৫২ সালের ২১ নভেম্বর, উদ্ধৃত করা যাক : That it is a place of teaching universal knowledge. This implies that its object is, on the one hand, intellectual, not moral; and, on the other, that it is the diffusion and extension of knowledge rather than the advancement. If its object were scientific and philosophical discovery, I do not see why a University should have student; if religious training, I do not see how it can be the seat of literature and science. Such is a University in its essence, and independently of its relation to the Church. (Henry Newman, The idea of University Defined edited by Dr S S Mundra Prakash). বস্তুত কট্টর ক্যাথলিক হওয়া সত্ত্বেও, স্বীয় ধর্মানুসারীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর নিযুক্ত হওয়ার পর নিউম্যান আর ক্যাথলিক থাকেননি, তিনি নির্দিষ্ট ধর্মকে অতিক্রম করে কেবল মানুষ হয়ে উঠেছিলেন।

www.pathagar.com

আর আমরা, একুশ শতকে এসে 'মানবধর্ম' পরিত্যাগপূর্বক উচ্চশিক্ষাকে নিয়ে যাচ্ছি কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের দিকে।

উচ্চশিক্ষা-পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক অন্যতম ধাপগুলো হলো স্নাতক (পাস), স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর কোর্স (শেষ দুই পর্যায়ে আছে সাধারণ শিক্ষা, প্রকৌশল, চিকিৎসা, কৃষি, এম ফিল, পি এইচডি ইত্যাদি)। মাদ্রাসা ব্যবস্থায় আছে, ফাজিল [ডিগ্রি (পাস) সমতুল্য], কামিল (এমএ সমতুল্য)। অবশ্য শেষ দাবিটি নিয়ে বিতর্ক আছে ঢের। দেশের সাধারণ বা বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেবল শেষোক্ত দুটি ডিগ্রি-কোর্স পড়ায়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, যা নিজেই সুসংবদ্ধ কাঠামোয় বা জ্ঞান-প্রজ্ঞায় দীপ্ত নয়—সেটি নিয়ন্ত্রণ করে উচ্চশিক্ষার সবগুলো ধাপ বা ডিগ্রি । এটির অবস্থা যেন হাতুড়ে ডাক্তারের মতো, বিশেষ কোনো ডিগ্রি নেই, তবে চিকিৎসা করেন জ্বর থেকে ক্যান্সার সব রোগের। নিজে যথেষ্ট বলবান ও ধীমান না হয়ে অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে যেমন তালগোল পাকাবার সম্ভাবনা থাকে, সাধ্যাতীত বোঝা কাঁধে নিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিনিয়ত অস্থিরতায় ভুগছে, সমস্যার অথৈ দরিয়ায় খাবি খাচ্ছে। বস্তুত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বৃত্তে আবর্তিত স্বাধীন-আলাদা কোনো প্রতিষ্ঠান নয়, সেটি শত শত প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ক ও নিয়ন্ত্রক; আমাদের বিশৃঙ্খল সমাজজাত নানা কিছিমের নানান বিদ্যাপীঠের রাশ টেনে অভিন্ন রেখায় নিয়ে আসা—তার পক্ষে দুঃসাধ্য কাজ বটে। তবে সাধ ও সাধ্যের পার্থক্যটুকু আলাদা করে আমরা কেবল ওই ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করবো, যা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে করা সম্ভব, করছে না সাধ্যাতীত বলে নয়, অদক্ষতা ও ঔদাসীন্যের কারণে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় : প্রথমেই ধরা যাক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত স্নাতক (পাস) পাঠ্যসূচির কথা। এটি এমন সংক্ষিপ্তাকারে প্রণীত, দেখলেই বোঝা যায় বিশ্ববিদ্যালয় যেন তাদের শিক্ষার্থীকে 'বেশি পড়বার চাপ' থেকে মুক্ত রাখতে বদ্ধপরিকর। আমাদের পরীক্ষাপদ্ধতির অলিখিত বিধি এরকম যে, এবারের প্রশ্ন আগামীবার 'রিপিট' করা হয় না। ফলে পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর পড়তে গিয়ে শিক্ষার্থীরা পূর্ববর্তী বছরের প্রশ্ন বাদ দিয়ে সেই সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচিকে আরও সংক্ষিপ্ত করে ফেলার সুযোগ নেয়। তারা গুটিকয় উত্তর পড়ে পরীক্ষা দিতে যায় এবং গতানুগতিক প্রশ্নপত্রের কারণে সবকিছু 'কমন'ও পড়ে যায়। একটা উদাহরণ সহযোগে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যাক; স্নাতক (পাস) এর বাংলা বিষয়ে গল্প বা প্রবন্ধ পাঠ্য আছে ছয়টি করে। মনে করা যাক, ক এবং খ গল্প বা প্রবন্ধ থেকে এবারের পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হয়েছে।

www.pathagar.com

অতএব শিক্ষার্থীরা নিশ্চিত হয়ে যায়, আগামী বছর এই দুটো গল্প বা প্রবন্ধ বাদ দিয়ে বাকি চারটা থেকে প্রশ্ন করা হবে। আবার এখানেও হিসেব আছে ঢের। ওই চারটা গল্প বা প্রবন্ধের লেখক কারা, সেটা বিবেচনায় আনা হয়। এখানে যদি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ থাকেন, তাহলে তাঁরা কাজী মোতাহার হোসেন বা আবুল ফজলকে চাপিয়ে পরীক্ষার জন্য বেশি 'ইমপর্টেন্ট' হয়ে ওঠেন। ফলে চারটা গল্প বা প্রবন্ধ থেকে এক-দুইটা ছেঁটে দিয়েও সেন্ট পারসেন্ট কমন ফেলার নিশ্চয়তা নিয়ে পরীক্ষার হলে যেতে দ্বিধান্বিত হওয়ার কারণ থাকে না।

বিশ্ববিদ্যালয়, যা সৃষ্টিশীল চিন্তাচেতনা-মননশীলতা-ব্যক্তিক বোধের উদ্বোধক হওয়ার কথা, কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (পাস) স্তরের পাঠ্যসূচি, শিক্ষাদান প্রক্রিয়া ও পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন পদ্ধতি—কোনোটাই ব্যক্তিক মেধা বিকাশের সহায়ক নয়; এটা সম্মান শ্রেণিতে ভর্তির অযোগ্য, খুব দুর্বল শিক্ষার্থীকেও উচ্চশিক্ষার মাল্যদান করে, যা গোটা শিক্ষাব্যবস্থা ও দেশের জন্যে আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপ হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে। উচ্চশিক্ষার ভারতীয় রূপ দেখে রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন, যেখানে বিশ্ববিদ্যা লয় পায়, এরই নাম বিশ্ববিদ্যালয়। যে বিশ্ববিদ্যালয় কাউকে পাঠদান করে না, কারো মেধা যাচাই করে না, কেবল শিক্ষার্থী ভর্তি করায় আর দরাজচিত্তে চন্দ্রালোকিত সার্টিফিকেট বিতরণের কাজ করে যায়, রবীন্দ্রনাথ কথিত 'বিশ্ব-বিদ্যা-লয়' কৌতুকটি এর ক্ষেত্রে শতভাগ প্রযোজ্য। এ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন শ্রেণিতে, বিভিন্ন বিষয়ে প্রতি বছর প্রথম শ্রেণিপ্রাপ্তদের উল্লম্ফন বৃদ্ধি দেখে মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, অন্যসব বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিয়ে দেশের সব ভালো ছাত্রছাত্রীরা কি এখানেই ভর্তি হয়?

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেশের শত শত কলেজে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর কোর্স দীর্ঘদিন ধরে পড়ানো হচ্ছে। দেশের বর্তমান শিক্ষাকাঠামোয়, যেখানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই কম, সেখানে উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রাখার নিমিত্তে এমন পদক্ষেপ নেয়া অসঙ্গত নয়। কিন্তু যে বিধি ও প্রেক্ষিতে কোনো কলেজে সম্মান ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করার কথা, অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসব শর্তপূরণের চিহ্ন মাত্র দেখা যায় না। কিন্তু তাতে কী? জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বছর বছর যেখানে-সেখানে উচ্চশিক্ষার দোকান খোলার অনুমতি দিচ্ছে, জোড়াতালি দেয়া পাঠক্রমের ভেতর দিয়েই পরীক্ষা নিচ্ছে, পাসও করাচ্ছে, আর জ্ঞানবর্জিত উচ্চশিক্ষিত বেকারের জন্ম দিয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকে তাকালে দেখতে পাই, এখানে অনার্স-মাস্টার্স পড়াবার জন্য প্রতিটি বিভাগে যতজন শিক্ষক থাকেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজসমূহের কোনো বিভাগে এর অর্ধেক শিক্ষকও নেই। ধরা যাক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে শিক্ষক আছেন ২৫-৩০ জন। এখানে প্রতি বছর অনার্সে ভর্তি করা হয় ১৫০-১৭৫ জন। বিপরীতে ঢাকা কলেজের বাংলা বিভাগে প্রতি বছর অনার্সে ভর্তি হয় ২৫০-২৭৫ জন, কিন্তু শিক্ষক আছেন মাত্র ১২-১৪ জন। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পড়ান কেবল অনার্স-মাস্টার্সের শিক্ষার্থী, আর কলেজ শিক্ষকদেরকে ওই দুটো শ্রেণির সাথে বাড়তি পড়াতে হয় উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণি, স্নাতক (পাস) ও এমএ প্রথম পর্ব। অতি কম জনবল নিয়ে বড় কাজ করতে গেলে প্রত্যাশিত ফল পাবার সম্ভাবনা যেমন ক্ষীণ, আমাদের সংশ্লিষ্ট কলেজগুলোর অবস্থাও তেমনি, বিদ্যাদানের বিশাল প্রক্রিয়া চালু রাখতে গিয়ে শক্তি এবং দ্যুতি—দুটোই নিষ্ফলভাবে ব্যয় করে যাচ্ছে।

বর্তমান বাংলাদেশের প্রত্যেকটি ছোট-বড় জেলা শহরে এক বা একাধিক কলেজে অনার্স-মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। উপজেলা থেকে গ্রামের বাজার পর্যন্ত সরকারি, বেসরকারি অজস্র প্রতিষ্ঠানে অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। অস্বীকার করার উপায় নেই, যুগ এবং জনগণের চাহিদা অনুযায়ী আমাদের আরো আরো উচ্চশিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। কিন্তু শিক্ষা প্রসারের জন্যে কেবল প্রতিষ্ঠান খোলাই যথেষ্ট নয়। এটা সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য যেসব অতি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গের দরকার, সেগুলো সঠিকভাবে সরবরাহ করতে না পারলে প্রতিষ্ঠান খোলার সদিচ্ছা অর্থহীন-অকাজে পরিণত হবার সম্ভাবনা থেকে যায়।

মফস্বল বা উপজেলার কথা না হয় বাদই থাকল, বড় শহরের অনেক বড় প্রতিষ্ঠানে দেখা যায়, সেখানে অনার্স-মাস্টার্স পড়ানোর মতো স্টাফ প্যাটার্ন তৈরি হয়নি। মাত্র তিন-চারজন শিক্ষক দিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক (পাস), স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির ক্লাস নেয়ার কাজ চালানো হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের একজন শিক্ষক বড়জোর দু-তিনটি কোর্সের পাঠ দান করেন। স্বল্প কোর্সের মধ্যে নিজেকে ঢেলে দিয়ে তিনি ওই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন। কলেজকেন্দ্রিক উচ্চশিক্ষায় এর বিপরীত চিত্র বিদ্যমান। শিক্ষকস্বল্পতার কারণে এখানে সব শিক্ষককে সব বিষয় পড়াতে হয়। ফলে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া তো দূরের কথা, ঠেকায় পড়ে কোনোভাবে কাজ চালানো ছাড়া আর কোনো লক্ষ্য থাকে না কারো। বস্তুত

www.pathagar.com

অতি চাপের কারণে দায়সারা গোছের কাজ চালিয়ে যাওয়ার মধ্যে চাকরি রক্ষিত হয় বটে, কিন্তু তাতে শিক্ষকের মনে না জন্মায় তৃপ্তি, শিক্ষার্থীর মনে না জ্বলে জ্ঞানের বাতি।

শিক্ষক স্বল্পতা, প্রয়োজনীয় শ্রেণিকক্ষের অভাব, মানসম্মত গ্রন্থাগারের অভাব—সব মিলিয়ে আমাদের মফস্বলি উচ্চশিক্ষাব্যবস্থা শোচনীয় দুর্দশায় নিপতিত হয়ে আছে। শিক্ষক স্বল্পতাহেতু কোনো বিষয়ের একটা কোর্স সমাপ্ত না করেই দৌড়ে যেতে হয় অন্য কোর্সে, ফলে কোনো কোর্সই সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করা যায় না। শিক্ষার্থীকে প্রত্যাশিতভাবে পরিচর্যা করা যায় না। ফলত শিক্ষার্থীরা বাধ্য হয় এখানে-ওখানে প্রাইভেট পড়তে বা গাইড-নোট বইয়ের সাহায্য নিতে। তখন তাদের কাছে উচ্চশিক্ষা মানে জ্ঞান অর্জনের প্রবহমান ধারা বলে বিবেচিত হয় না, এটা হয়ে যায় যেনতেনভাবে সনদ অর্জনের লড়াই। হ্যাঁ, এ লড়াই শেষ করে শিক্ষার্থীরা সনদ অর্জন করে বটে, তবে সনদের মান রাখার জন্য যে বিদ্যাটুকু আত্মস্থ করার দরকার ছিল—এর ছিটেফোটাও তার চেতনাকে সমৃদ্ধ করে না। সে সর্বাপেক্ষা বড় ডিগ্রি পায়, চাকরিও পায়, কিন্তু নিজের পরিশীলনের জন্য, আত্মার গভীর প্রদেশে প্রদীপ জ্বালাবার জন্য জ্ঞানজগৎ থেকে আলোর যে শিখাটুকু ধারণ করার দরকার ছিল—সেই আলোর সন্ধান সে কোনোদিনই পায় না।

প্রশ্ন হলো, আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীর মনে আদৌ কি প্রদীপ জ্বালতে চায়? নাকি কেবল সার্টিফিকেট দিয়ে তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে চায়? জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলো, যাদের অধিকাংশেই মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের পরিবেশ নেই, প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই, শ্রেণিকক্ষ নেই, সেই মলিন অবয়বের ভেতর থেকে সেখানকার শিক্ষার্থীরা এত ভালো রেজাল্টের দীপ্তি ছড়ায় কী করে? প্রতি বছরই দেখতে পাই, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত অনার্স-মাস্টার্স শ্রেণির রেজাল্টে প্রথম শ্রেণির ছড়াছড়ি। প্রথম শ্রেণি প্রাপ্তির দিক থেকে কোনো কোনো কলেজের কোনো কোনো বিভাগ যখন ঢাকা কিংবা জাহাঙ্গীরনগর প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়কে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়, তখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সনদের মান নিয়ে হাজারো প্রশ্নের জন্ম হয়। ওইসব প্রশ্নের ভিত আরো শক্ত হয়, যখন দেখি ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণি পাওয়া বহু ছেলেমেয়ে ছোট্ট স্কুলের ছোট্ট চাকরি না পেয়ে বেকার হয়ে ঘুরছে। এর কারণ কী?

এর বহুবিধ কারণের মধ্যে অন্যতম ক'টি হলো, এর প্রথাগত সিলেবাস, (যেখানে লেখার মান অপেক্ষা লেখকের নামকে বিবেচনায় আনা হয়)

www.pathagar.com

গতানুগতিক প্রশ্নরীতি (গত বছর যেসব প্রশ্ন এসেছে, তা সম্পূর্ণরূপে বাদ দিতে হবে, খুব গুরুত্ব দিতে হবে গতবছরের আগের বছরের প্রশ্নকে), যাকে-তাকে দিয়ে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করানো (অনেক অভিজ্ঞ শিক্ষক খাতা পান না, অথচ নবীনরা কোন মানদণ্ডে যেন পেয়ে যান), অত্যধিক মাত্রায় ব্যবহারিক, টিউটোরিয়াল বা ভাইভার নম্বর প্রদান (৭০ থেকে ৯৮% পর্যন্ত) ইত্যাদি। আমাদের মনে রাখা দরকার, বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ শিক্ষার্থীর মনে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালানো, তার হাতে নম্বরস্ফীত সনদ তুলে দেয়া নয়। আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সার্টিফিকেট প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সরে এসে জাতির মেধা মনন প্রজ্ঞার বাহক হয়ে উঠুক, এমন প্রত্যাশা করতে দোষ কী।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় : সরকারি বরাদ্দপ্রাপ্তির দিক থেকে বাংলাদেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এমনকি ক্যাডেট কলেজ অপেক্ষাও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বেশি সুবিধা ভোগ করে থাকে। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে, ব্যাপক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও, উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ায় এ দেশের সরকার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ১৯৯৮ সালে দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল মাত্র ৯টি। ২০০১ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ১৫টিতে। বর্তমানে আছে ৩৪টি। উচ্চশিক্ষারত ১২.১ ভাগ শিক্ষার্থী পড়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে, ৯.২ ভাগ পড়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে, আর ৭৮.৭ ভাগ পড়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আওতাধীন বিভিন্ন কলেজে। আমাদের মতো গরিব দেশে সীমিত সংখ্যক উচ্চশিক্ষার্থীর জন্য সরকারি কোষাগার থেকে যে বড় অঙ্কটি ব্যয় করা হয়, ওই ব্যয় থেকে প্রত্যাশিত উপযোগিতা পাচ্ছি কি?

এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হতো 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড'। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায়, গবেষণায়, উপানুষ্ঠানিক কার্যক্রমে এ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বৈশ্বিক মানদণ্ডে অনন্য। কিন্তু কালক্রমে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত এতিহ্য হারিয়ে গেছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মানও ক্রমশ অধঃমুখী হচ্ছে। এর কারণ বোধহয় দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিক বোধের বিবর্তন ধারার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংলগ্ন। প্রথাগতভাবে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, তাই এ গুলো দল বা সরকার নিরপেক্ষ জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র হওয়ার কথা। কিন্তু বর্তমানে প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি বা দলবাজি এমনভাবে ঢুকে গেছে, যা শিক্ষায়তনের আসল লক্ষ্যকে ছাপিয়ে 'পলিটিক্যাল সেন্টারে' পরিণত হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থেকে শিক্ষক নিয়োগ—কোনোটাতেই এখন শুধু যোগ্যতাকে প্রাধান্য দেয়া হয় না। যোগ্যতা অপেক্ষা বিবেচ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মতাদর্শ, তার বর্তমান বা অতীত রাজনীতির ভূমিকা। এখানকার শিক্ষকরা এখন সাহিত্যিক-দার্শনিক-বিজ্ঞানীতে বিভাজিত নন, তাঁদের পরিচয় তিনি নীল, নাকি সাদা, নাকি গোলাপি-সোনালি? অধিকাংশ শিক্ষক যদি জ্ঞানচর্চা বাদ দিয়ে রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তিতে মগ্ন থাকেন, কেবল নিজের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, দলাদলি-রশি টানাটানি করে সময় ব্যয় করেন, তাহলে তাঁদের ছাত্ররা নিপাট বিদ্যার্থী, জ্ঞান-অনুসন্ধিৎসু হয়ে ব্যস্ত সময় কাটাবে—এমন ধারণা করা অমূলক বটে।

তাছাড়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শিক্ষকের স্বাধীন চিত্ততার বদলে পরানুগ্রহের জন্য লোভাতুর সত্তা প্রকাশ হয়ে পড়ছে। সস্তা জনাদরের লোভে ছাত্রদের মনোহরণের জন্য অনেকটাই নিচে নেমে যাচ্ছেন কেউ কেউ। প্রত্যক্ষ রাজনীতি করে অনেকে নেতা বনে নানা অসম সুযোগ সুবিধা ভোগ করছেন। আধিপত্যবাদ বেড়েছে, নিজেদের দলাদলিতে শিক্ষার্থীদের জড়ানো হচ্ছে। অন্যতর কাজের অজুহাতে ক্লাস কামাই করা এখন জলভাত। আবার বলি সব শিক্ষক নন, অনেকেই নন এমন, কিন্তু বেশ কজনই এখন এরকম। ফলে বদনাম হচ্ছে সামগ্রিকভাবে শিক্ষকশ্রেণীর। তাঁদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসযোগ্যতা কমে গেছে। তাঁদের সচ্ছলতাকে সমাজ সন্দেহের চোখে দেখে, তাঁদের আচরণ ও ভাষা অনেককে আহত করে। ক্লাসে না পড়িয়ে সবাই বাড়িতে টিউশনি করে (বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কনসাল্টিং এজেন্সিতে শ্রম দেন) প্রচুর পয়সা কামাচ্ছেন' [লেখাপড়া করে যে : সুধীর চক্রবর্তী, পৃ-১৭২]। এটা অবশ্য পশ্চিম বাংলার উচ্চশিক্ষার চিত্র। এ ধারার বাংলাদেশীয় চিত্রটি নিঃসন্দেহে আরো করুণ ও শোচনীয়।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ রাজনীতি নিয়ে যেমন ব্যস্ত, তেমনি ব্যস্ত মূল প্রতিষ্ঠান ফেলে খণ্ডকালীন শিক্ষকতা বা কনসালটেন্সির কাজে। এক জরিপে দেখা গেছে, দেশের সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষক আছেন ৮৩৬৪ জন। এর মধ্যে ৩৫৪৩ জনই খণ্ডকালীন শিক্ষক, যাদের সিংহভাগ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত। আবার ইউজিসির হিসাব মতে, বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭৩৪ জন শিক্ষকই কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫০ জন (শিক্ষাছুটিতে ১৮৮ জন, প্রেষণে ৫৫ জন, অননুমোদিত ছুটিতে ৭ জন), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২৭ জন (শিক্ষাছুটি ২০৭, প্রেষণে ২০ জন),

www.pathagar.com

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮১ জন (শিক্ষাছুটি ১৫৬, প্রেষণে ১৯, অননুমোদিত ছুটিতে ৬ জন), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫০ জন (শিক্ষাছুটি ১৩৫, প্রেষণে ১৫), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২৯ জন (শিক্ষাছুটি ১০৪, প্রেষণে ১২, অননুমোদিত ছুটিতে ১৩ জন), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০০ জন (শিক্ষাছুটি ৮৩, প্রেষণে ৯, অননুমোদিত ছুটিতে ৮ জন), শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩৬ জন (শিক্ষাছুটি ১২১, প্রেষণে ৪, অননুমোদিত ছুটিতে ১১ জন), জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অঙ্গনের ৭৮ জন শিক্ষকের মধ্যে ৩৭ জনই শিক্ষাছুটিতে আছেন (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ছুটির হিড়িক, সাপ্তাহিক ২০০০, ৩৯ সংখ্যা, ২০১০)। বিশ্ববিদ্যালয় নামক প্রতিষ্ঠানগুলো নিশ্চয়ই প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দেয় না। তাহলে কোনো প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক যদি ছুটিতে থাকেন বা ব্যস্ত থাকেন অন্য প্রতিষ্ঠানের খেদমত করায়, তাহলে তাদের মূল প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রম কি বিঘ্নিত হয় না? হয়, অবশ্যই হয়—এর প্রমাণ পাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল প্রদানে চরম দীর্ঘসূত্রিতার মধ্যে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, শিক্ষা পরিচালনাগত ত্রুটি ইত্যাদি কারণে একজন উচ্চশিক্ষার্থীর জীবন থেকে অনেকটা সময় অহেতুক চলে চায়, সেখানে পরীক্ষার ফল পাওয়ার জন্য তাকে যদি মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হয়, সেটা গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো ব্যাপার।

এ তো গেল একদিকের চিত্র, অন্যদিকে আজকালকার শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই নিছক জ্ঞান অর্জনের জন্য বিদ্যাপীঠে আসে না। বেশির ভাগই আসে সার্টিফিকেট বগলদাবা করতে, যা চাকরি বাগানোর প্রধান অস্ত্র বলে বিবেচিত। (অস্ত্র প্রসঙ্গ উঠলই যখন, তখন জনান্তিকে বলে রাখি—বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রের হাতে কলম থাকে না, অস্ত্র থাকে। দেশের বহু অস্ত্রবাজ সন্ত্রাসীর জন্ম হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনা থেকে)। রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন 'চাকরির অধিকার নহে, মনুষ্যত্বের অধিকারের যোগ্য হইবার প্রতি যদি লক্ষ রাখি, তবে শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য চেষ্টার দিন আসিয়াছে' (শিক্ষা সংস্কার, শিক্ষা, রবীন্দ্র রচনাবলী, পৃ-১৮৯৬)। রবীন্দ্রনাথ কথিত মনুষ্যত্ব অর্জনের প্রয়াস এখন কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই নেই, সেখানে চলে কেবল চাকরির পূর্বপ্রস্তুতি। বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায়, যেখানে জ্ঞান অপেক্ষা ক্ষমতা আর অর্থের দাপট অনেক বেশি, সেখানে নিবিড় অনুশীলনের মাধ্যমে মেধার বিকাশ ঘটাতে তেমন

www.pathagar.com

কেউ উৎসাহ বোধ করে না। অনেক শিক্ষার্থী যারা খুব পড়াশোনা করে, খেয়াল করলে দেখা যাবে তারা স্রেফ জ্ঞান আহরণের জন্য পড়ে না, ভালো রেজাল্ট করা আর সমাজকথিত দামি চাকরি বাগানোর জন্য যে ধারার পড়া প্রয়োজন, কেবল সেই ধারাতেই ঘুরপাক পায়। মেডিকেল কলেজ বা বুয়েট থেকে পাস করে আজকালকার অনেক ছেলেমেয়ে নিজস্ব বলয় ত্যাগ করে চাকরি নেয় প্রশাসন বা পুলিশে; দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে অনেককে চলে যেতে দেখি কাস্টমস বা কর বিভাগে। কিন্তু কেন? এর প্রকৃত কারণ অনুধাবন করবার জন্য পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে নাকি লেখা আছে, 'Seed of Learning'. বিশ্ববিদ্যালয়টিতে পড়তে আসা বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দেখে ওখানকার অনেক সুধীজন নাকি ঠাট্টা করে বলতে শুরু করেছেন, Learning এর L বাদ দিয়ে সেখানে 'Seed of Earning' করা হোক। তাতে নাকি বিশ্ববিদ্যালয়টিতে পড়তে আসা শিক্ষার্থীদের লক্ষ্যের সাথে ওই মনোগ্রামে খোদিত বক্তব্যের সামঞ্জস্য রক্ষিত হবে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঁচ বছরি শিক্ষাজীবন শেষ করতে সময় লেগে যায় ৭/৮ বছর। সময়ের ওই অতিরিক্ত ব্যাপ্তি অনেকের শিক্ষাজীবনকে ক্লান্তিকর ও বিষময় করে তোলে। ওখান থেকে একটা সার্টিফিকেট নিয়ে সবাই চায় দ্রুত বেরিয়ে যেতে, কারণ কেবল জ্ঞানী হলে চাকরি মেলে না, এর জন্য চাই সার্টিফিকেট, মোটামুটি মানের সার্টিফিকেট। আমাদের প্রথাগত শিক্ষাধারায় যেখানে মৌলিক জ্ঞান লাভের সুযোগ খুব কম এবং তা দান করতে কর্তৃপক্ষও গরজহীন, সেখানে চলনসই রেজাল্ট, মানে দ্বিতীয় শ্রেণি পেতে বিন্দুমাত্র কাঠখড় পোড়ানোর প্রয়োজন হয় না। ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে থাকা 'পূর্বপুরুষের' নোট, হাল আমলে অতি সহজলভ্য গাইড বই মুখস্থ করে করে পরীক্ষা নামক বৈতরণীটি পার হওয়া যায়। 'আসলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শেষ বিচারে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রির সার্টিফিকেট প্রদানের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান জগতে প্রবেশ, নিবিষ্ট এবং সম্পৃক্ত করার ব্যাপক আয়োজন তাতে নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থাই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সার্টিফিকেট পাওয়ার প্রধান মানসিকতা গড়ে তুলেছে। লেখাপড়ায় গভীরভাবে সম্পৃক্ত না থেকেও উচ্চতর ডিগ্রি লাভের সুযোগ সৃষ্টি করে রেখেছে।' এবং এর কারণ, 'উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষকের দায়িত্ব পালনে অবহেলা, সময়মতো ক্লাস না

www.pathagar.com

নেয়া, প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি না নিয়ে ক্লাসে যাওয়া, ছাত্রছাত্রীদের যথাযথভাবে মূল্যায়ন না করা, অতিমাত্রায় রাজনীতিতে যুক্ত হওয়া, প্রকৃত মেধাবীদের বের করে আনতে না পারা ইত্যাদি।' (বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষানীতি, বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা ও গবেষণার সমস্যা : ড. মমতাজউদ্দিন পাটোয়ারী, পৃ-৭৩-৭৪)।

একটা কথা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে, দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান যতই পড়তির দিকে হোক না কেন, প্রায় সব ছাত্রছাত্রী বা অভিভাবকের প্রথম পছন্দ বা নির্ভরতা কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানগুলো ঘিরেই আবর্তিত। দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এখনও বিশ্বাস করেন যে, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মেধা ও গুণগত মান অনেক অনেক ভালো। তাছাড়া সেখানকার শিক্ষা সম্পর্কিত ব্যয়ভার মধ্যবিত্ত বা গরিব, সবারই সাধ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমাদের সরকার বা শিক্ষা সম্পর্কিত কর্তাব্যক্তিদের উচিত, জনগণের আস্থা বা নির্ভরতাকে যথাযথ মূল্য দিয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সৃষ্টিশীল, যুগোপযোগী, কন্টকবর্জিত শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় : জ্ঞানতাপস ড. হুমায়ুন আজাদ বলেছিলেন, 'যে বিদ্যা যতো আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিমান, সে বিদ্যায় ইংরেজির প্রাধান্য ততো বেশি।—অর্থনীতি বা হিশেব বা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ বেশ শক্তিমান, তাই সেগুলোতে বাংলার অধিকার নেই।... বাংলা নেই প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়গুলোতে, এমনকি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েও বাংলা নেই।...এখনো শক্তি ও ইংরেজি অচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত, বাংলা ও শক্তিহীনতা জড়িত শাশ্বত সম্পর্কে।' (বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা, সাপ্তাহিক ২০০০, ৩৯ সংখ্যা, ২০১০)। শক্তি এবং অর্থের সাথে ইংরেজি ভাষার যে অতিঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখেছিলেন ধীমান আজাদ, এর নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায় দেশের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকে তাকালে। এসব বিদ্যাপীঠের প্রায় সবগুলোরই নামকরণ করা হয়েছে ইংরেজি ভাষায়, প্রায় সবগুলোতে কেবল পড়ানো হয় আজাদ কথিত শক্তিমান বিষয়গুলো এবং সবগুলোতে শিক্ষাব্যয় এত বেশি যে, কেবল আর্থিক বলবানরাই প্রবেশাধিকার পায় সেখানে।

এসব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হঠাৎ করে শুনলে মনে হতে পারে যে, এগুলো বুঝি ইউরোপ, আমেরিকার কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ইস্ট,

www.pathagar.com

ওয়েস্ট, নর্থ, সাউথ—চারদিক অর্থাৎ সর্বব্যাপী-দিক নির্দেশনাকারী এমন প্রতিষ্ঠান এখন লকলকে লতার মতো ছড়িয়ে পড়ছে এবং মার্কেটে বা শপিং মলে বা আবাসিক এলাকার মধ্যেও ফিটফাট দেহে শোভা পাচ্ছে। এগুলোর ঠাটবাট, সিলেবাস, পড়ানোর সিস্টেম—সবকিছুই বিদেশ থেকে ধার করে আনা। এমনকি এসব প্রতিষ্ঠানের প্রায় অর্ধেক শিক্ষকও ধার করে আনা। ওইসব ধারকৃত শিক্ষকরা অবশ্য বিদেশি নন, তাঁরা এ দেশেরই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে আগত, নগদ অর্থে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত। এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাগণ—হয় শিল্পপতি, অথবা অবসরপ্রাপ্ত চাকুরে-সংঘ, অথবা কোনো এনজিও বা লিমিটেড সংস্থা। এরা স্রেফ বিদ্যা প্রসারের জন্য প্রতিষ্ঠান খুলে বসেননি, বসেছেন মূলত কারবারের উদ্দেশ্য নিয়ে, তাই বাজারি পণ্যের মতো টিভি-খবরের কাগজে মনোলোভা বিজ্ঞাপন দিয়ে ক্রেতা অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীকে আকৃষ্ট করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। ওই ধরনের প্রচারে বোঝানোর চেষ্টা করা হয় যে, এসব প্রতিষ্ঠানের অবয়ব যদিও বাংলাদেশের মাটিতে প্রোথিত, তবে এখানে এলে স্বাদ পাওয়া যাবে ইউরোপ-আমেরিকার, এমনকি ওখানে স্থায়িভাবে চলে যাওয়ার, চাকরি পাওয়ার নিশ্চিত বন্দোবস্তসহ আরো কত কী সুযোগ যে আছে...। পণ্যের বিজ্ঞাপনে যেমন অনেক অন্তঃসারশূন্য কথা বলা হয়, এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথাতেও অনেক ফাঁক পরিদৃশ্যমান; মানসম্মত শিক্ষা দেয়ার জন্য এদের অধিকাংশের না আছে ক্যাম্পাস, না আছে প্রয়োজনীয় শিক্ষা সরঞ্জাম, না আছে শিক্ষক। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোনোটিতেই নিজস্ব দক্ষ শিক্ষক নেই, এগুলো পরিচালিত হয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত খণ্ডকালীন শিক্ষকদের সহায়তায়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তথ্য অনুযায়ী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর খণ্ডকালীন শিক্ষকের উপাত্ত এরকম :

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	মোট শিক্ষক	খণ্ডকালীন শিক্ষক
নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি	২৯৩ জন	১৪৩ জন
ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি	২৮৭	১৫০
এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বালাদেশ	৪২৯	৩০০
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি	১২৪	৯৬
ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক	২৩৪	১২৭
গণ বিশ্ববিদ্যালয়	১৩৭	২৫

www.pathagar.com

দি পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	১৩৮	৮৩
ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	১৫৯	৭০
ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি	২৬৫	১২৫
মানারত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	৬৬	২৯
লিডিং ইউনিভার্সিটি	৮১	৪৩
সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা	২৮৯	১৭১
স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি	৫১০	১৯৫
স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	১৮০	১০১
প্রাইম ইউনিভার্সিটি	১০৮	৪৪
নর্দান ইউনিভার্সিটি	২৬২	১০৮
ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি	১৪৭	৬৪
শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি	৫১৩	৪০৮
আহছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৩৪৮	১২৯
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম	৩০৬	৮৫
সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	৬৪	২০
ইবাইস ইউনিভার্সিটি	১১৮	৪৩
অতীশ দীপঙ্কর ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি	৭৭	৪০

(তথ্যসূত্র : খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়ে চলছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, সাপ্তাহিক ২০০০,৩৯ সংখ্যা, ২০১০)।

বস্তুত খণ্ডকালীন, অতিথি শিক্ষক বা ভাড়া করা শিক্ষক দিয়ে কিন্ডার গার্টেন বা কোচিং সেন্টার চালানো যায়, সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয় চালানো যায় না। কিন্তু রঙ্গভরা বঙ্গদেশে সবই সম্ভব, উচ্চশিক্ষা-বিক্রির দোকান খোলাও সম্ভব। গালভরা নাম, চকচকে আহ্বান শুনে ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে কত না শিক্ষার্থী হুমড়ি খেয়ে পড়ে। বিশাল অঙ্কের টাকা খরচ করে, পড়ে বা না পড়েও ভয়ানক নম্বরসহ ঝকঝকে সার্টিফিকেট নিয়ে বেরোয়। কিন্তু ওইসব প্রতিষ্ঠানের ভাসাভাসা শিক্ষা না যোগাতে পারে ভালো চাকরি, না দিতে পারে চিত্তের সমৃদ্ধি। ফলে আমাদের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষিত বেকার তৈরির কারখানা ছাড়া অন্য কোনো সদর্থক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারছে না। কারবারি সমাজে টাকার কী ভয়ানক শক্তি—তা বোঝা যায় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি শিক্ষকদের দিকে তাকালে। নিজ কর্মস্থলে তাঁদের পাঠদান প্রক্রিয়া বা সময়নিষ্ঠা সর্বদা সরলপথে না চললেও, প্রাইভেট

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁরা সবাই ঋজুপথের পথিক। নিজ ছাত্রকে প্রাপ্য নম্বর দিতে গিয়ে যাঁরা কুণ্ঠিত বা দ্বিধান্বিত বোধ করেন, তাঁরাই আবার এখানে এসে নম্বরকে দানের বস্তু হিসেবে বিবেচনা করেন এবং দুহাত ভরে অকাতরে দান করে যান।

উচ্চশিক্ষা এবং এর ব্যবহারগত দিক : ইদানীং একটা প্রশ্ন খুব জোরেশোরে উচ্চারিত হচ্ছে, শিক্ষার জন্য রাষ্ট্র ও ব্যক্তি যৌথভাবে যে পরিমাণ ব্যয় বা বিনিয়োগ করে, ওই ব্যয়ের প্রেক্ষিতে কতটুকু রিটার্ন পাওয়া যায়? বিশেষত আমাদের প্রথাগত উচ্চশিক্ষা—যা প্রায় অনুৎপাদনশীল খাতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, তাকে ঘিরে এমন হতাশাজনক প্রশ্ন বারবার সামনে চলে আসছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী তাঁর 'ভিসান এন্ড রিভিসান : হায়ার এডুকেশন ইন বাংলাদেশ ১৯৪৭-১৯৯২' নামক গ্রন্থে বিস্তর পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে, বাংলাদেশের বর্তমান উচ্চশিক্ষায় কেবল 'অপচয়ের' ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ছে। সেখানে সময় ও অর্থের ব্যাপক অপচয় হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষার সুযোগ কম থাকায় ওই ধারার ছাত্ররা উচ্চশিক্ষার জন্য মানবিক শাখায় চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে, ফলে তাদের জন্য পূর্ব বিনিয়োগের পুরো টাকা অপচয়ের খাতে চলে যাচ্ছে। উচ্চশিক্ষা এবং চাকরি বাজারের মধ্যে যথাযথ সম্পর্ক না থাকায় কর্মক্ষেত্রে অধীত শিক্ষার সুষ্ঠু প্রয়োগ ঘটানো যাচ্ছে না, বিধায় ওই শিক্ষার বহুলাংশ অপচয়ের ঘরে যাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার বিশাল সরকারি ভর্তুকি ভোগ করে কেউ যখন ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে নিজের বলয় ত্যাগ করে প্রশাসন, পুলিশ বা অন্য ক্যাডারে চলে যায়, তখন তার পেছনে বিনিয়োগকৃত সরকারি অর্থও অপচয়ের খাতে চলে যায়। গাজী মাহবুবুল আলম, মোঃ তাহের বিন খলিফা এবং মির্জা মোহাম্মদ শাহজামাল—এই তিন গবেষক বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের নিরিখে আমাদের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার 'রেট অব রিটার্ন'-এর যে চিত্র তুলে ধরেছেন, তা খুবই হতাশাব্যঞ্জক;

স্তর	একক প্রতি ভর্তুকি হিসেবে সরকারি ব্যয়	একক প্রতি মোট সরকারি ব্যয়
প্রাথমিক	৪,৭০০ মার্কিন ডলার	৪,৭০০ মার্কিন ডলার
মাধ্যমিক	৬,৭০০	১১,৪০০
উচ্চ মাধ্যমিক	৪,৮০০	১৬,২০০
উচ্চশিক্ষা	১৭,০০০	৩৩,২০০

www.pathagar.com

রেট অব রিটার্ন

স্তর	গড় অর্থনৈতিক রিটার্ন	গড় সামাজিক রিটার্ন
প্রাথমিক	৭.০	১৭.৫
মাধ্যমিক	৯.১৭	১৭.০
উচ্চ মাধ্যমিক	১৪.৬৯	১৩.৫
উচ্চশিক্ষা	১১.৪৪	১৭.৩৭

হিসেব থেকে বেকারত্ব বাদ দিলে যে রিটার্ন দাঁড়ায় :

স্তর	অর্থনৈতিক	সামাজিক	গড়
প্রাথমিক	৬.৭	১৭.৫	১২.১
মাধ্যমিক	৮.১	১৭.০	১২.৬
উচ্চ মাধ্যমিক	১২.২	১৮.৫	১৫.৪
উচ্চশিক্ষা	৯.৪	১৩.৪	১৩.৫

উপর্যুক্ত চার রকমের শিক্ষার ব্যবহারগত দিক :

স্তর অবদান

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবহার ১২.১

মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবহার ১২.৬–১২.১ = ০.৫

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবহার ১৫.৪–১২.৬ = ২.৮

উচ্চশিক্ষার ব্যবহার ১৩.৫–১৫.৪ = –১.৯

এ গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী আমাদের উচ্চশিক্ষার ব্যবহার শূন্যও নয়, বরং তা ঋণাত্মক। এ গবেষণার ফল যদি সর্বাংশে সঠিক না-ও হয়, তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, ওই শিক্ষার ব্যবহার ঋণাত্মক না হয়ে শূন্য হলো, তাতে কি আত্মতৃপ্তির সুযোগ আছে? আমাদের উচ্চশিক্ষার এমনতর ব্যবহারিক বিপর্যয়ের কারণ কী?

ড. এস কোঠারি, ভারতের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, ১৯৬৬ সালে ওই দেশের শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন লিখতে গিয়ে বলেছিলেন, 'The destiny of India is now being shaped in her class rooms.' (Education Commission in India, 1966). পণ্ডিত কোঠারি মহোদয় ভারতের ভাগ্য উন্নয়নের মূল শিখা দেখেছিলেন শ্রেণিকক্ষের ভেতরে। এর অর্থ কী? এর অর্থ হলো, শ্রেণিকক্ষের শিক্ষা হতে হবে সৃষ্টিশীল, উৎপাদনমুখী, কর্মক্ষেত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। শ্রেণিকক্ষ যোগান দেবে দক্ষ শ্রমিক, প্রশিক্ষিত টেকনিশিয়ান,

www.pathagar.com

মেধাবী প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, কর্মমুখী জনশক্তি। 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ান দেশগুলোর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিকে তাকালে দেখা যাবে এর পেছনে রয়েছে মধ্যস্তরের শিক্ষায় সুশিক্ষিত, বিশেষ করে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত একটি জনশক্তি। এই জনশক্তিটিই দেশের উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। পাশাপাশি সমর্থন দিয়েছে একটি সুসংগঠিত দক্ষ শ্রমশক্তি, যার বিকাশ ঘটেছে একটি শিক্ষাপদ্ধতির সার্থক প্রয়োগের মধ্য দিয়ে' (আমরা কী ধরনের শিক্ষা চাই, একটি বিকল্প ভাবনা : অজয় রায়, শহিদুল ইসলাম প্রমুখ, পৃ-৭৪)।

বস্তুত শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলে। বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে, শিক্ষার ব্যবহারগত অনুৎপাদনশীলতা নিয়ে যত বিতর্কই থাকুক, কালানুগ এবং কর্মমুখী শিক্ষা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে যে কোনো দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ সম্পর্কে বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের অভিমত, 'Elementary education is a central component of any kind of economic development—. Economic powers such as Japan had high levels of education before they advanced towards industrial development.' (রয়টার, জানুয়ারি ০২, ১৯৯৯)।

www.pathagar.com

উচ্চশিক্ষার বিশ্বমানচিত্র

সব দেশের সব নাগরিকের জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হলেও এবং এ শিক্ষা প্রদানকল্পে সকল রাষ্ট্র ভর্তুকি প্রদান করলেও, এ শিক্ষা বিস্তারে সব রাষ্ট্র সমান সামর্থ্যের অধিকারী নয়। আবার কতিপয় রাষ্ট্র, যেমন মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ—যথেষ্ট সামর্থ্য থাকা সত্ত্বে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে তারা খুব আন্তরিক নয়। আসলে কোনো রাষ্ট্রের শিক্ষাবিস্তার নীতি কিংবা শিক্ষায় ভর্তুকি প্রদানের উদারতা বা কৃপণতা—এই চিত্রটির স্পষ্ট রূপরেখা বোঝা যায় ওই রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত মানব উন্নয়নসূচক পদক্ষেপ এবং তার রাজনীতির গণতান্ত্রিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে। উচ্চশিক্ষার ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে সমর্থবান প্রধান দশটি দেশ হলো :

১. সুইডেন ২. ফিনল্যান্ড ৩. নেদারল্যান্ডস ৪. বেলজিয়াম ৫. আয়ারল্যান্ড ৬. অস্ট্রিয়া ৭. জার্মানি ৮. ফ্রান্স ৯. ইতালি ১০. কানাডা।

উচ্চশিক্ষার প্রবেশাধিকার র‍্যাংকিং

১. নেদারল্যান্ডস ২. ফিনল্যান্ড ৩. যুক্তরাজ্য ৪. যুক্তরাষ্ট্র ৫. কানাডা ৬. অস্ট্রেলিয়া ৭. আয়ারল্যান্ড ৮. ফ্রান্স ৯. সুইডেন ১০. ইতালি।

উচ্চশিক্ষা ও আবাসন ব্যয়

উচ্চশিক্ষা অর্জনে তুলনামূলকভাবে কম ব্যয় হয়, এমন দশটা দেশ (বার্ষিক ব্যয়) :

১. ফিনল্যান্ড (শিক্ষা ব্যয় ২৭১ মার্কিন ডলার, আবাসন ব্যয় ৫২২৯ মার্কিন ডলার) ২. বেলজিয়াম (৮২১ ও ৪১৪৫ মার্কিন ডলার) ৩. সুইডেন (৮৫২ ও ৫৪৩১ ডলার) ৪. অস্ট্রিয়া (১৪৭৮ ও ৫৮২১ ডলার) ৫. আয়ারল্যান্ড (১৫৭৫ ও ৪৯৭৫ ডলার) ৬. ফ্রান্স (১৭৭৮ ও ৫৪০১ ডলার) ৭. নেদারল্যান্ডস (১৯৯০ ও ৪৯২৪ ডলার) ৮. জার্মানি (২০৮৩ ও ৪৪১৭ ডলার) ৯. ইতালি (২১৩৫ ও ৪২২১ ডলার) ১০. যুক্তরাজ্য (৩২৫৭ ও ৮৬০২ মার্কিন ডলার)।

www.pathagar.com

শিক্ষার্থী-সংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় দশটি বিশ্ববিদ্যালয়

১. ইন্দিরা গান্ধি ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি, নয়াদিল্লি শিক্ষার্থীর সংখ্যা– ২৫ লাখ
২. আল্লামা ইকবাল ওপেন ইউনিভার্সিটি, ইসলামাবাদ, " ১৮ লাখ
৩. ইসলামিক আজাদ ইউনিভার্সিটি, তেহরান " ১৩ লাখ
৪. আনাদলু ইউনিভার্সিটি, তুরস্ক " ৮ লাখ ৮৪ হাজার
৫. বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, গাজীপুর " ৮ লাখ
৬. বাংলাদেশ ওপেন ইউনিভার্সিটি, গাজীপুর " ৬ লাখ
৭. রামখামহেঙ্গ ইউনিভার্সিটি, ব্যাঙ্কক " ৫ লাখ ২৫ হাজার
৮. ইউনিভার্সিটি সিস্টেম অব ওয়াহিও, ওয়াহিও, যুক্তরাষ্ট্র " ৪ লাখ ৭৮ হাজার
৯. ড. আম্বেদকার ওপেন ইউনিভার্সিটি, অন্ধ্রপ্রদেশ, ভারত " ৪ লাখ ৫০ হাজার
১০. ইউনিভার্সিটি অব পাঞ্জাব, পাকিস্তান " ৪ লাখ ৪৮ হাজার

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দুটিরই অবস্থান বাংলাদেশে, এটা আমাদের জন্য কম গর্বের বিষয় নয়।

বিভিন্ন দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা

মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে অন্যতম একটি হলো শিক্ষা। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত মানবাধিকার সনদের ২৬ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, 'Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory and unitary.'

১৯৫৯ সালে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কথা পুনর্ব্যক্ত করে জাতিসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত শিশু অধিকার সনদের ৭ নম্বর ধারায় শিশু শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং তা বাস্তবায়নের সমতাভিত্তিক উপায় সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'He (or she) shall be given an education which will promote his (or her) general culture and enable him, on the basis of equal opportunity, to develop his (or her) abilities, his (or her) individual judgment and his (or her) sense of moral and social responsibility and to become a useful member of society.'

১৯৬০ সালে জাতিসঙ্ঘের অঙ্গ সংগঠন UNESCO এর উদ্যোগে প্যারিস সম্মেলনে (১৪-১৫ ডিসেম্বর) ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-শ্রেণি নির্বিশেষে

www.pathagar.com

বৈষম্যহীন শিক্ষার কথা জোর দিয়ে বলা হয় এবং প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তী ধাপগুলো কে, কীভাবে অতিক্রম করবে, সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয় :

To make primary education free and compulsory; make secondary education in its different forms generally available and accessible to all; make higher education equally accessible to all on the basis of individual capacity; assure compliance by all with the obligation to attend school prescribed by law;

(b) To ensure that the standards of education are equivalent in all public institutions of the same level and that the conditions relating to the quality of education provided are also equivalent.

বিভিন্ন দেশের শিক্ষার ধাপ বা পর্যায়সমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করার আগে কোনো দেশ তাদের জাতীয় আয়ের কী পরিমাণ শিক্ষা-উন্নয়নে ব্যয় করে, এর একটা তুলনামূলক চিত্র দেখা যাক :

বাংলাদেশ ২.২ শতাংশ (এক্ষেত্রে সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সবচেয়ে নিচে।)

ভারত	৩.৫ শতাংশ
শ্রীলঙ্কা	৩.৬ শতাংশ
পাকিস্তান	২.৬ শতাংশ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৬.৪ শতাংশ
উন্নত দেশসমূহ	৫.৯ শতাংশ

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার বার্ষিক তুলনামূলক হিসেব (ঘণ্টার এককে) :

দেশ	প্রথম বছর	তৃতীয় বছর
বাংলাদেশ	৪৪৪	৭১৫
শ্রীলঙ্কা	৭৪০	৯০০
চীন	১২৩০	১২৩০
জাপান	১৩৩০	১৩৩০

(বি. দ্র. : উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই তার বাজেটের কম অংশ বিনিয়োগ করে শিক্ষা খাতে। আবার কর্মঘণ্টা বিচারে

www.pathagar.com

বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাই সবচেয়ে কম সময় শ্রেণিকক্ষে অবস্থান করে। শিক্ষা-উন্নয়নের যে স্বপ্ন আমরা লালন করছি, বর্তমান ধারা অব্যাহত রেখে তা অর্জন করা কি আদৌ সম্ভব?)

শ্রেণিভিত্তিক তুলনামূলক শিক্ষা

যে কোনো দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে মানসম্পন্ন, বিজ্ঞানসম্মত রূপ দেয়ার জন্য (অন্তত প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক পর্বে) সর্বাগ্রে প্রয়োজন অভিন্ন বা একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা। একই দেশে ভিন্ন ভিন্ন শিশুর মাতৃভাষা ভিন্ন ভিন্ন হলেও, তাদের পঠিত বিষয়সমূহের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখা অপরিহার্য। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত—অভিন্ন শিক্ষায় অতিক্রমণের পর, বয়সের গ্রহণক্ষমতা অনুযায়ী সুষম ও বিজ্ঞানসম্মত পাঠক্রম ও পাঠসূচি প্রণয়ন করা উচিত। পাঠদানের ধরন ও পরীক্ষা পদ্ধতি অবশ্যই জ্ঞান ও বুদ্ধিবিকাশের সহায়ক হতে হবে। পড়া যেন কেবল মুখস্থের বিষয় না হয়ে মননশীলতা, বুদ্ধিবৃত্তিক সমৃদ্ধির সহায়ক হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষা কেবল তথ্য জানা নয়, জীবন ও জগৎকে চৈতন্যে নিয়ে আত্মিকবোধের পর্যায়ক্রমিক উদ্বোধনের নাম শিক্ষা। এখন দেখা যাক, শিক্ষা সম্প্রসারণে কোন দেশ কী কী পদ্ধতি গ্রহণ করে কোন প্রক্রিয়ায় কর্ম সম্পাদন করে;

ভারত

বহু জাতি, বহু ধর্ম এবং বহু ভাষাভিত্তিক একটি দেশের নাম—ভারত। দেশটির রাষ্ট্রভাষা হিন্দি। সেখানে অনেকগুলো প্রাদেশিক ভাষা আছে, যেমন বাংলা, তেলেগু, গুজরাটি, অসমি, উর্দু—যেগুলো রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত ভাষা। বহু জাতিক এবং বহুভাষিক হওয়ার কারণে দেশটির শিক্ষাব্যবস্থা প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি প্রদেশ, নিজস্ব ভাষানুসারে শিক্ষারীতি সাজায়, তবে সব প্রদেশে প্রায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম যাতে অনুসরণ করা হয়, সে ব্যাপারটি তদারকি করে কেন্দ্র সরকার। তাই প্রাদেশিক শিক্ষাধারায় জাতি-ধর্ম-ভাষাগত কারণে অল্পবিস্তর প্রার্থক্য থাকলেও, কেন্দ্রের সক্রিয়তার ফলে সেখানকার বহুভাষিক শিক্ষায় তেমন মৌল পার্থক্য দেখা যায় না।

শিক্ষা স্তর

১. **প্রাক-প্রাথমিক স্তর :** নার্সারি, কিন্ডার গার্টেন এবং টোল বা আশ্রমভিত্তিক শিক্ষার প্রচলন আছে।

২. **প্রাথমিক স্তর :** এর আবার দুটো উপস্তর আছে; প্রথম শ্রেণি থেকে

www.pathagar.com

পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত হলো নিম্ন প্রাথমিক স্তর; আর ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উচ্চতর প্রাথমিক স্তর।

৩. **মাধ্যমিক স্তর :** এটিও দুধারায় বিভক্ত; নবম, দশম শ্রেণি নিয়ে নিম্ন মাধ্যমিক স্তর, আর একাদশ দ্বাদশ শ্রেণি নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর। (*পৃথিবীর বহুদেশের শিক্ষারীতিতে প্রাথমিক স্তর অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এবং মাধ্যমিক স্তর দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত। ২০০৯ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সর্বশেষ শিক্ষা কমিশনও শিক্ষারীতিকে এভাবেই বিন্যস্ত করেছে। ড. কুদরত-ই-খুদা কমিশনও অনুরূপ সুপারিশমালা পেশ করেছিল)।

৪. **উচ্চশিক্ষা স্তর :** তিন বছরের প্রথম ডিগ্রিস্তর, চার বছরের দ্বিতীয় এবং পরে আরও গবেষণামূলক ডিগ্রি স্তর চালু আছে।

সরকারি, বেসরকারি বিদ্যাপীঠ, বিশেষ ধরনের বিদ্যাপীঠ (শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী, উপজাতি, অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য) রয়েছে। সেখানে উৎপাদনশীল, কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি বেশি জোর দেয়া হয়।

শ্রীলঙ্কা

দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে মানব উন্নয়ন সূচক কিংবা শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রসর দেশটির নাম শ্রীলঙ্কা। জাতি ও গোষ্ঠীগত দাঙ্গায় দেশটি দীর্ঘকাল ধরে রক্তাক্ত হয়েছে, অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে, তবে শিক্ষার মান নিচে নামতে দেয়নি। সেখানে ৫ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত সকলের শিক্ষা বাধ্যতামূলক। শিশুশ্রেণি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল শিক্ষা অবৈতনিক। বর্তমানে সেখানে বেসরকারি পর্যায়ের শিক্ষাও চালু করা হয়েছে।

শিক্ষার স্তরসমূহ

১. **প্রাথমিক স্তর :** প্রথম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত, অর্থাৎ এই স্তর ছয় বছর মেয়াদি।

২. **নিম্ন মাধ্যমিক স্তর :** সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণি, দুই বছর মেয়াদি।

৩. **মাধ্যমিক স্তর :** নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণি মিলে এ স্তরের ব্যাপ্তিকাল তিন বছর। ওই তিন বছর শেষে Sri Lankan O-Level পরীক্ষা দিতে হয়। এখানে ৮টি বিষয় থাকে। এর মধ্যে কমপক্ষে ছয়টি বিষয়ে কৃতকার্য হতে হয়।

৪. **উচ্চ মাধ্যমিক বা মাধ্যমিক উত্তর স্তর :** দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্রেণি নিয়ে এ স্তর গঠিত। এটিকে বলা হয় প্রি-ইউনিভার্সিটি স্তর। এ স্তর

www.pathagar.com

শেষে শিক্ষার্থীরা Sri Lankan A-Level পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে। এতে পাস করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়।

৫. **উচ্চশিক্ষা স্তর :** এই স্তরে প্রথম তিন বছরে তিনটি বিষয় পড়ে পরীক্ষা দিতে হয়। পাস করার পর 'ব্যাচেলর জেনারেল ডিগ্রি' পাওয়া যায়। এরপর আরো দুই বছরের স্নাতকোত্তর কোর্স পড়তে হয়।

জাপান

জাপান এশিয়া মহাদেশ, তথা গোটা বিশ্বের মধ্যে অন্যতম উন্নত একটি দেশ। দেশটির পুরো শিক্ষাব্যবস্থায় মাতৃভাষার একচ্ছত্র প্রাধান্য বিদ্যমান। পাঠ্যপুস্তকে ধর্মীয় প্রসঙ্গ অনুপস্থিত। শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। প্রায় পুরো শিক্ষাব্যবস্থা বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের গুটিকয়েক শাখায় সাহিত্য চর্চা চলে। শিক্ষাবছর শুরু হয় ১ এপ্রিল থেকে, শেষ হয় ৩১ মার্চের মধ্যে।

শিক্ষার স্তর

১. **প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা :** স্থানীয় শিক্ষাবোর্ডের নিয়ন্ত্রাণাধীন এই স্তরে কিন্ডার গার্টেন বা জাপানি ইউনিটের মাধ্যমে শিশুদের শারীরিক, মানসিক, ও বুদ্ধি বিকাশের জন্য পরিচর্যা করা হয়।

২. **প্রাথমিক স্তর :** বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসজ্জিত। এই স্তরের মেয়াদ ছয় বছর। দেশের সর্বত্র একই পাঠক্রম অনুসৃত হয়। বছরে কমপক্ষে ২৬৬ দিন শিক্ষা কার্যক্রম চলে। প্রতি শ্রেণিতে অনধিক ৫০ জন শিক্ষার্থী থাকে।

৩. **নিম্ন মাধ্যমিক স্তর :** সপ্তম থেকে নবম—এই তিন শ্রেণি এ স্তরের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষার্থীরা নিজেদের আগ্রহ, মেধা, চাহিদা অনুযায়ী ঐচ্ছিক বিষয় নির্বাচন করে। তবে বাধ্যতামূলকভাবে জাপানি ভাষা, অঙ্ক, বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি পড়তে হয়। প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে ৩২ ঘণ্টা ক্লাস করতে হয়। এর মধ্যে ছয় ঘণ্টা ঐচ্ছিক বিষয়, যেমন বিদেশি ভাষা, কৃষি, বৃত্তিমূলক ইত্যাদির উপর ক্লাস চলে, বাকি ২৬ ঘণ্টা ক্লাস চলে বাধ্যতামূলক বিষয়ের উপর।

৪. **উচ্চ মাধ্যমিক স্তর :** এই স্তর তিন ভাগে বিভক্ত; সাধারণ কোর্স, বৃত্তিমূলক কোর্স, এবং সাধারণ ও বৃত্তিমূলক কোর্স। শিক্ষার্থীরা

www.pathagar.com

নিয়মিত ও অনিয়মিত—দুভাবেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। নিয়মিতদের শিক্ষাকাল ৩ বছর, অনিয়মিতদের ৪ বছর। বছরে কমপক্ষে ৩৫ সপ্তাহ ক্লাস করতে হয়।

৫. **উচ্চশিক্ষা স্তর :** উচ্চ মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করবার পর National Centre for University Entrance Examination-এর ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর স্থানীয় জাতীয়, সরকারি বেসরকারি প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করবার নিমিত্তে ভর্তি হওয়া যায়।

যুক্তরাজ্য

জ্ঞান বিজ্ঞান, শিক্ষা, সাহিত্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই অন্যতম অগ্রসর একটি দেশের নাম যুক্তরাজ্য। এখানে ৫ থেকে ১৬ বছরের সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা LEA (Loacal Education Authority) শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করে থাকে।

শিক্ষা কাঠামো

১. **প্রাক-প্রাথমিক স্তর :** তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের জন্য এই স্তর। এটা বাধ্যতামূলক স্তর নয় এবং এ পর্যায়ে কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হয় না। শিশুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষালয়ে আসা যাওয়া করে এবং খেলাচ্ছলে তাদের মানসিক বিকাশ ঘটানো হয়।

২. **প্রাথমিক শিক্ষা :** প্রাথমিক শিক্ষা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক। ৫+ বয়স থেকে এ শিক্ষা শুরু হয়। এ স্তরটি প্রধানত তিন ধরনের : ৫ থেকে ৭ বছরের শিশুরা পড়ে ইনফ্যান্ট স্কুলে, ৭ থেকে ১১ বছরের শিশুদের জন্যে আছে প্রাইমারি জুনিয়র স্কুল, আবার ১১ থেকে ১৩ বছরের শিশুরা পড়তে পারে প্রিপারেটরি স্তরে; সেটি উত্তীর্ণ হওয়ার পর শিশুরা পাবলিক স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়।

৩. **মাধ্যমিক স্তর :** ১১ থেকে ১৬ বছর বয়সীরা এ স্তরে পড়ে। অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক এ স্তরটি তিন ধরনের স্কুলের মাধ্যমে পরিচালিত। স্কুলগুলো হলো Secondary Grammer School, Technical School, Secondary Modern School. এসব স্কুলে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান ইতিহাস, কলকারখানা পরিচালনা, ব্যবসা সংগঠন প্রভৃতি বিষয়ে পড়াশোনা করতে পারে।

www.pathagar.com

৪. **উচ্চশিক্ষা স্তর :** উচ্চশিক্ষা প্রদানের জন্য রয়েছে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। কলেজগুলো কোনো না কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত। তাছাড়া উচ্চশিক্ষা প্রদানের জন্য সেখানে এমন কিছু প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান আছে, যাকে 'স্কুল' বলা হয়। এই স্কুল প্রধানত দুই প্রকার, পাবলিক স্কুল ও কম্প্রিহেনসিভ স্কুল। এগুলোতে উচ্চতর আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা বিদ্যমান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

কেন্দ্র, রাজ্য ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পরিচালিত যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা যেমন বিজ্ঞানসম্মত, তেমনি কর্মমুখী ও কালোপযোগী। ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত সকলের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রচলিত। শিশুক্লাস থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, একই ধারার সর্বত্র অভিন্ন পাঠ্যক্রম অনুসৃত।

শিক্ষা স্তর

১. **প্রাক-প্রাথমিক স্তর :** প্রাক প্রাথমিক স্তরের ব্যাপ্তিকাল বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা, পরিচ্ছন্নতা, খেলাধুলার মাধ্যমে শরীর গঠন, ছবি আঁকা, গান-বাজনা ও গল্পের মাধ্যমে শিশুমনের বিকাশসাধন ইত্যাদি বিষয় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

২. **প্রাথমিক স্তর :** নিয়মানুগ, রীতিবদ্ধ পড়াশোনা শুরু হয় প্রাথমিক স্তর থেকেই। প্রথম থেকে ষষ্ঠ, কোনো কোনো রাজ্যে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরের ব্যাপ্তি। রাজ্যবিশেষে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্তরের ব্যাপ্তিকাল কম বেশি হলেও, উচ্চ মাধ্যমিক স্তর সমাপ্ত করতে হলে সবাইকে (৩+৫+৪, ৬+৩+৩, ৬+৬), যেভাবেই হোক, মোট ১২ বছর অধ্যয়ন করতে হবে। শিক্ষাদান যাতে একঘেয়ে ও বিরক্তিকর হয়ে না যায়, সেজন্যে মাঝেমধ্যে শিক্ষার্থীদেরকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং টিভি, সিনেমা দেখানোসহ নানাবিধ বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়।

৩. **মাধ্যমিক স্তর :** এটি দুভাগে বিভক্ত—জুনিয়র মাধ্যমিক ও সিনিয়র মাধ্যমিক স্কুল। ১২ থেকে ১৮ বছরের শিক্ষার্থীরা এ স্তরের অন্তর্ভুক্ত। এখানে ইংরেজি, সমাজ, ইতিহাস, যন্ত্রশিল্প, চারুকলা, বিদেশি ভাষা ইত্যাদি মিলে তিন শতাধিক বিষয়ে পাঠ দানের ব্যবস্থা আছে। বিদ্যালয়ের পাঠ ও বাইরের জগৎ, দুটো পারস্পরিক

www.pathagar.com

ঘনিষ্ঠতায় আবদ্ধ।

৪. **উচ্চশিক্ষা স্তর :** উচ্চশিক্ষার জন্য কঠোর নিয়মের অধীন থেকে ভর্তি পরীক্ষা দিতে হয়। বহুল প্রচলিত দুটি ভর্তি পরীক্ষার নাম SAT (Scholastic Aptitude Test), ACT (American College Testing Programme). রাষ্ট্র ও ব্যক্তি মালিকানাধীন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মানের সমতা বজায় রেখে বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, এম ফিল, পিএইচ-ডি, কারিগরি ও প্রফেশনাল ডিগ্রি দিয়ে থাকে।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যগুলো পৃথক পৃথকভাবে তাদের শিক্ষানীতি প্রণয়ন করলেও, শিক্ষার মূলনীতির ক্ষেত্রে এক রাজ্যের সাথে আরেক রাজ্যের তেমন পার্থক্য দেখা যায় না।

www.pathagar.com

শিক্ষানীতি বনাম রাষ্ট্রের চরিত্র

বাস্তবিকপক্ষে শিক্ষার স্তরবিন্যাস বা বিষয়বৈচিত্র্যের ওপর এর সফলতা খুব একটা নির্ভর করে না। শিক্ষার সফলতা নির্ভর করে এর প্রয়োগপদ্ধতির ওপর। মানে শিক্ষাঙ্গনের অবকাঠামো ও অন্যান্য সুবিধাদি, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচির কালানুবর্তিতা, নিয়োগকৃত শিক্ষকদের দক্ষতা, যোগ্যতা এবং কর্মনিষ্ঠা, শিক্ষকদের প্রতি সমাজ বা রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষার প্রতি ওই রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার স্বরূপ, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রকৃতি, সর্বোপরি রাষ্ট্র কর্তৃক শিক্ষা বাজেটের উচ্চতা—এই সব অনুষঙ্গের ওপর নির্ভর করে কোনো দেশের শিক্ষাচিত্রের সফলতা বা ব্যর্থতা। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে একজন বরেণ্য শিক্ষাবিদের উক্তি স্মরণ করা যাক, 'ডাক্তারি মতে 'ক্লিনিক্যালি' জীবিত বলে রোগীর যে অবস্থাটা বোঝানো হয়, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাটা ঠিক তাই। মৃত্যুর সব চিহ্ন প্রকট, সর্ব শরীর অসাড়, সর্ব ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয়, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াহীন, তবু মৃত্যু ঘটেছে বলা যায় না। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটাও আজ সব অর্থে বিকল। গোটা দেশজুড়ে বিরাট একটা কাঠামো পড়ে আছে, গল্পের দানবের মতো। গল্প হচ্ছে : দানবের হাঁ-মুখ এতই বিরাট যে তার ভক্ষ্য পায়ে হেঁটে পেট পর্যন্ত পৌঁছে এতটুকু স্পর্শিত না হয়ে আবার ফিরে আসতে পারে। এটা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাতেও সম্ভব যে, দেশের একজন নাগরিক প্রাথমিক শিক্ষায় ঢুকে উচ্চশিক্ষার ভেতর দিয়ে স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে আসতে পারেন শিক্ষা নামক বস্তুটি দ্বারা এতটুকু স্পর্শিত না হয়ে। মানুষকে এমন চরম অপদার্থ ও অকর্মণ্য বানাবার কারখানা দুনিয়ার আর কোথায় আছে আমার জানা নেই।... রসায়নশাস্ত্র যে পড়ে সে রসায়নবিদ হয় না, হওয়ার কোনো উপায় নেই, সে ব্যাংকে গিয়ে কলম পিষছে, পদার্থবিজ্ঞানে যিনি উচ্চতর ডিগ্রির অধিকারী পদার্থের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, হয় তিনি পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কাজের খোঁজে, না হয় কাজ করছেন এমন ধরনের—যে জন্য অক্ষরজ্ঞান থাকাই যথেষ্ট।...এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শিক্ষাব্যবস্থার এইরকম হাল বলেই দেশের এমন দুরবস্থা—না কি

www.pathagar.com

দেশের সর্বনাশের নাভিশ্বাস উঠেছে বলেই শিক্ষাব্যবস্থার এমন হাল ! দুটোই ঠিক।" (মুক্তিযদ্ধের চেতনা : গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রসঙ্গে ঃ হাসান আজিজুল হক, শিক্ষাবার্তা ১৯৮৭-১৯৯৭, নির্বাচিত রচনা, এ এন রাশেদা সম্পাদিত, পৃ-২০১-২০২)।

একটু পরেই লেখক এই সিদ্ধান্তে স্থিত হয়েছেন, 'যে সমাজ প্রচণ্ড প্রাণশক্তিতে ভরপুর, যার সৃজনীশক্তি নানা পথে প্রবল বেগে প্রকাশ পায়, তার শিক্ষাব্যবস্থা পঙ্গু এবং নষ্ট এটা কি করে ঘটতে পারে? কাজেই সমাজের দুর্গতির জন্য শিক্ষাব্যবস্থা দায়ী, এটা না বলে আমাদের দুর্গত, ধস-নামা, নির্যাতন ও শোষণমূলক বিকারগ্রস্ত রাষ্ট্রব্যবস্থাই আজকের বাংলাদেশের এই অচল শিক্ষাব্যবস্থাটার জন্ম দিয়েছে বলতে হবে' (পৃ-২০২)। বস্তুত শিক্ষা যেহেতু রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত বহুর মধ্যে মাত্র একটা প্রপঞ্চ বিশেষ, তাই রাষ্ট্রের পঙ্গুত্বের জন্য শিক্ষা দায়ী হতে পারে না, কারণ শিক্ষা রাষ্ট্র চালায় না, রাষ্ট্রই শিক্ষার আপাদমস্তক নিয়ন্ত্রণ করে। যে দেশে সুশাসন আছে এবং তদ্‌সৃষ্ট গণতান্ত্রিক, মেধাভিত্তিক, মানবিক সমাজব্যবস্থা আছে, সে দেশে সুশিক্ষা থাকবেই।

প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে আমাদের দেশে কি আইনের শাসন নেই বা নিয়ন্ত্রণ নেই? উত্তর হলো—আছে, অবশ্যই আছে—তবে সে আইন খুব একচোখা, যা কেবল শক্তিমান ও বিত্তবানদের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে থাকিয়ে থাকে। আমাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কতটুকু বেদনাদায়ক-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো—সভ্য দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা পায় জনসেবা করার সুযোগ বা অধিকার, আর আমাদের জনপ্রতিনিধিরা যায় ক্ষমতায়। ভোটের ম্যান্ডেট নিয়ে যারা জনসেবার জন্য নয়—ক্ষমতায় যায়, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর—তারা যে দেশের আমজনতার ভালো-মন্দ বিবেচনা না করে ক্ষমতা প্রয়োগপূর্বক নিজের সমৃদ্ধি অন্বেষণে ব্যস্ত থাকবেন, এতে অবাক হবার কী আছে? পাশের দেশ ভারত বা শ্রীলঙ্কা, কিংবা কিছু দূরের থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, জাপান অথবা যুক্তরাজ্য বা যুক্তরাষ্ট্র, বিপরীতে পাকিস্তান, সৌদি আরব, ইরাক, নাইজেরিয়া, উগান্ডা—এসব দেশের সুঠাম, নীরোগ অথবা দুর্বল অকার্যকর শিক্ষাব্যবস্থা দেখে সিদ্ধান্ত নেয়া কি কঠিন হবে, কোনো দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সাফল্য ওই দেশের সুশাসন বা কুশাসনের সম্পূর্ণ অনুবর্তী? দরিদ্রতা—সুশিক্ষা প্রসারের অন্তরায় বটে, কিন্তু প্রাচুর্য থাকলেই যে সফল শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যায় না, এর প্রমাণ মিলবে মধ্যপ্রাচ্যের তৈলার্দ্র দেশগুলোর দিকে তাকালে।

www.pathagar.com

আসলে মানসম্মত, জ্ঞানান্বেষণী, কর্মোদ্দীপক শিক্ষা প্রসারের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন কালোপযোগী ও বিজ্ঞাননির্ভর শিক্ষানীতি। শুধু নীতি প্রণয়ন করাই নয়, চাই এর সফল বাস্তবায়ন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষানীতি, যা ছিল কুদরত-ই-খুদার অসামান্য মেধা ও প্রজ্ঞায় আলোকিত, সেটি আলোর মুখ দেখলো কই? কেন দেখেনি? এমন আধুনিক, বৈশ্বিক মানদণ্ডোত্তীর্ণ শিক্ষানীতিটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে এরপর আরো অসংখ্য শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে। এ গুলোর মান ও উপযোগিতা যাই হোক, কোনোটিই সর্বাংশে অনুসৃত হয়নি কেন? সর্বশেষে যে শিক্ষানীতিটি পেয়েছি ২০০৯ সালে, যা প্রায় কুদরত-ই-খুদা প্রণীত নীতির আদলেই গড়া, শেষপর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হবে কি? আমাদের সন্দেহের তীর—সরকারের আর্থিক দীনতা বা সিদ্ধান্তহীনতার দিকে নয়, এটি ধাবমান প্রথাগত রাজনীতির অপ্রকৃতিস্থতা, অসহিষ্ণুতা ও বিভাজিত মানসিকতার দিকে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার আলোচিত, সমালোচিত কয়েকটি দিক : শিক্ষার শ্রেণিগত বা প্রাতিষ্ঠানিকগত আলোচনায় যদিও এ দিকগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, তবু সমকালীন নিরন্তর পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক আবহের প্রেক্ষিতে এ দিকগুলো এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, এ সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রসঙ্গ : ধর্ম

আমাদের জীবনবোধে, প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্মে ধর্মের প্রভাব প্রবল বিধায়, শিক্ষাতেও এটি অপরিমেয় গুরুত্ব নিয়ে সমাসীন হয়েছে। উপাসনালয়ভিত্তিক অর্থাৎ মন্দির বা মসজিদভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ধর্মই হলো মূল শিক্ষা। মাদ্রাসাভিত্তিক, বিশেষত কওমি মাদ্রাসার শিক্ষায়ও এই ধারা অনুসৃত। অপরাপর শিশুশিক্ষায় তৃতীয় শ্রেণি থেকে ধর্ম অবশ্যপাঠ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু উন্নত বিশ্বে, এমন কি ভারত, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়াতেও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ধর্মকে বিযুক্ত রাখা হয়েছে। ভারতে অনুসৃত শিক্ষা কমিশনে ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে : The constitution requires that religious instruction may be imparted to all those who desire to take part in it . It does not put it negatively that religious instruction may be imparted to all as a rule except to those who object. (Conscious clause, The

www.pathagar.com

Report of the University Education Commission, Vol- 1, Govt. of India)। ধর্মকে ব্যক্তিগত জীবনের অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করে ভারত সরকার মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত কোনো পাঠ্যসূচিতে ধর্মকে অন্তর্ভুক্ত করেনি।

কোনো ব্যাপারে তুলনা করতে গিয়ে আমরা স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে বেছে নেই যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশকে। নাগরিকের ধর্মাচরণ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র অভিমত পোষণ করে, 'American Constitution neither approves nor rejects the religious sanctions of morality. It states that Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise there of.'

ওই দেশের সংবিধান স্পষ্টভাবে বলেছে, রাষ্ট্র যদি ব্যক্তির ধর্ম নিয়ন্ত্রণের ভার নিতে চায়, তবে ধর্মের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়ে যাবে : If the state is given power to direct religious matters the freedom of religious would cease.

অস্ট্রেলিয়ার সংবিধানেও রাষ্ট্র কর্তৃক ধর্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বলা হয়েছে, ধর্ম একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়, সেটা পালন করা বা না পালন করা একান্তই ব্যক্তিক চেতনার বিষয় : The commonwealth shall not make any law for establishing any religion for imposing any religious observance or for prohibiting the free exercise of any religion and no religious text shall be required as a qualification for any office of public trust under the commonwealth.——It recognises the right of every man and women to worship or not to worship God according to the dictates of his or her own conscince.

অন্যদিকে বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ (১) ধারায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।' যুক্তরাষ্ট্র, ভারত বা অপরাপর গণতান্ত্রিক দেশ যখন রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থেকে ধর্মকে বিযুক্ত করে রেখেছে, সেখানে আমাদের সংবিধান ধর্মকে রাষ্ট্রের অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বলেছে, 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' [অনুচ্ছেদ ২(ক)], তবে প্রত্যেক ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্র সহনশীল, উদার ও বৈষম্যবর্জিত আচরণ করবে।

www.pathagar.com

রাষ্ট্র যেহেতু মানুষ কর্তৃক চালিত প্রপঞ্চ, যে রাষ্ট্রের সংবিধানস্বীকৃত নির্দিষ্ট একটা ধর্ম আছে, সে রাষ্ট্র অন্য ধর্মের ব্যাপারে 'সহনশীল' ও 'উদার' থাকার কথা যতই বলুক, যাদেরকে প্রীত করার জন্য রাষ্ট্রধর্মের স্বীকৃতি, তারা চিন্তন-মননে কখনো বিস্মৃত হবে না যে, তারা যে ধর্মানুসারী, খোদ রাষ্ট্রটিও সেই ধর্মে দীক্ষিত। কাজেই যে রাষ্ট্রের নিজেরই ধর্ম আছে, সে রাষ্ট্র তার শিক্ষা ব্যবস্থায়—বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, দর্শন, নীতিশাস্ত্রকে পাশ কাটিয়ে ধর্মকে সামনে নিয়ে আসবেই। বিজ্ঞান-দর্শনের প্রসার মানে তো প্রথাগত ধর্মাচরণ থেকে ক্রমশ সরে যাওয়া, যেমনটা দেখা যাচ্ছে জাপানে, চীনে, যুক্তরাজ্যে, যুক্তরাষ্ট্রে—সেখানে বাংলাদেশের মতো ধর্মানুগত একটা দেশ, যার আবার 'রাষ্ট্রধর্ম' আছে, সেটি বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাদর্শনে খুব সমর্পিত হতে পারবে, এমনটি ভাবার অবকাশ নেই। ধর্মকে শিক্ষা থেকে বিযুক্ত রাখা, যেটি আধুনকি ও পরিশীলিত শিক্ষানীতির একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য, সে কাজটি ঝুলে থাকবে যতদিন, ততদিন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বিশ্বাসনির্ভর ধার্মিক বেরিয়ে আসবে, যুক্তিবাদী, প্রমাণনির্ভর মানুষ আসবে খুবই কম।

সপ্তম শতকের পরবর্তী কয়েক শতক মুসলমানরা বিশ্বশাসন করেছে, সেটি ধর্মের জোরে নয়—জ্ঞান-বিজ্ঞানের শানিত অস্ত্র দিয়ে; বরেণ্য চিন্তাবিদ যতীন সরকার সেই সত্যটি তুলে ধরেছেন এভাবে, "খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী পাশ্চাত্য জগতে যখন মধ্যযুগের অন্ধকার নেমে এসেছে, ঠিক তখনই—সেই অষ্টম-নবম শতকেই—আরবজগতে ইসলামী ধর্মাবলম্বী শাসকবৃন্দ 'ইলম আল-কাদিমাহ' বা প্রাচীন বিজ্ঞানচর্চার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে মানবসভ্যতাকে সঞ্জীবিত করে রাখার প্রয়াস পেয়েছেন। আব্বাসীয় খলিফা মনসুর-মামুন-হারুন-অর রশিদদের পৃষ্ঠপোষকতায় যদি গ্রিক জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা ও অনুবাদ না হতো, তাহলে পৃথিবী থেকে বিদ্যার ধারাবাহিকতাই হারিয়ে যেত, মানবসভ্যতা তার উৎস থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত...। ইহলৌকিক বিদ্যার সনিষ্ঠ চর্চার স্বাভাবিক পরিণতিতেই ঘটে মুক্তবুদ্ধির উজ্জীবন। আর এ রকম মুক্তবুদ্ধির উজ্জীবনের ফলেই আরব জগতে উদ্ভূত হয় 'মুতাজিলা'র মতো যুক্তিবাদী ও বস্তুনিষ্ঠ এক বলিষ্ঠ দর্শন। কিন্তু দশম শতাব্দীর পর থেকে মুতাজিলা দর্শনটি বিকশিত হওয়ার বদলে হতে থাকে অবদমিত এবং ক্রমে 'বিশ্বাসবাদ' পোক্ত হতে হতে 'যুক্তিবাদ'কে একেবারেই হীনবল করে দেয়।" (বিনষ্ট রাজনীতি ও সংস্কৃতি, পৃ-২৩৬)। যে ধর্মে বিদ্যাচর্চাকে জীবনের অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে দেখা হয়েছে—বলা হয়েছে, 'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানান্বেষণ করো', 'বিদ্বানের দোয়াতের কালি শহীদের রক্তের

www.pathagar.com

চেয়ে পবিত্র', 'বিদ্যা অর্জনের প্রয়োজনে সুদূর চীন দেশে যাও'—সেই ধর্মাবলম্বীরা বর্তমানে ইহলৌকিক বিদ্যা ছেড়ে, পরকালিক কর্মকাণ্ড নিয়ে কেন ব্যস্ত হয়ে উঠল, সেটা ভেবে দেখার বিষয়।

প্রসঙ্গ : একমুখী শিক্ষা

উন্নত দেশগুলোর শিক্ষানীতি পর্যালোচনায় আমরা দেখেছি যে, সে সব দেশের শিশুরা অভিন্ন সিলেবাসের একমুখী শিক্ষানীতি দ্বারা গ্রন্থিত। শিক্ষার এই একমুখীনতা শিশুদের মধ্যে অভিন্ন চেতনা ও বোধের জন্ম দেয়, তাদেরকে ভ্রাতৃত্বের নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ করে। অন্যদিকে একই বয়সী শিশুদের বিচিত্রমুখী শিক্ষা তাদেরকে বিচিত্র চিন্তন ও মননে বিভাজিত করে ফেলে। প্রথাগত ধর্ম শিশুচিন্তার বিক্ষিপ্ত বিস্তৃতিকে এক বন্ধনীতে নিয়ে আসতে পারে না, ফলে দেখা যায়—আমাদের পাঁচ শিক্ষাঙ্গনের পাঁচটি শিশু পাঁচ রকমের বোধ নিয়ে বড় হয় এবং কোনো ব্যাপারে তাদের মধ্যে সহজ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। কাজেই আমরা নিজেরা মত-পথ, ধর্ম ও চিন্তনে যতই বিভাজিত থাকি না কেন, আমাদের শিশুরা যেন অভিন্ন বোধ-চেতনা-স্বপ্ন নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে, সেজন্য অভিন্ন বা একমুখী শিক্ষানীতি প্রবর্তন করা প্রয়োজন। অর্থাৎ "এর স্পষ্ট অর্থ হলো একজন শিক্ষার্থী একটি মাত্র শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত নানা বিষয়ে ও শৃঙ্খলায় শিক্ষা গ্রহণ ও জ্ঞান অর্জন করবে। এর মধ্য দিয়ে বর্তমানে যে বিভিন্ন ধারার শিক্ষাদান পদ্ধতি, যেমন—সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা-মক্তব-টোল-চতুষ্পাঠী অবকাঠামোগত ধর্মভিত্তিক শিক্ষা, ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে কিন্ডার গার্টেন থেকে এ লেভেল স্কুল ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে দেয়া শিক্ষা—তার অবসান ঘটবে। যেমন প্রাথমিক স্তর থেকে নিম্ন মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত (১ম শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি) সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষাব্যবস্থা অনুমোদিত একটি মাত্র শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে যেতে হবে, তা তারা যে বিদ্যায়তনেই পড়াশোনা করুক না কেন। পরবর্তী স্তরগুলোতে, যেমন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে সমাজের প্রয়োজনের নিরিখে বিশেষ শৃঙ্খলায় একাধিক ধারার শিক্ষা কার্যক্রমের প্রবর্তন করা যেতে পারে—যেমন মানবিক, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, বৃত্তিমূলক, সঙ্গীতবিদ্যা, 'নীতি ও ধর্ম' ইত্যাদি।" (আমরা কী ধরনের শিক্ষা চাই, একটি বিকল্প ভাবনা : অজয় রায়, শহীদুল ইসলাম প্রমুখ, পৃ-১৪)।

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ : ইংরেজি পাঠ

কুদরত-ই-খুদা কমিশনের সুপারিশ ছিল, ইংরেজি বিষয়টি যেন ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে পাঠ্য করা হয়। নতুন শিক্ষানীতি ২০০৯-এ বলা হয়েছে, 'প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার ধারা (সাধারণ, মাদ্‌রাসা) নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী নিধারিত বিষয়সমূহ অর্থাৎ বাংলা, ইংরেজি, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, গণিত, সামাজিক পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হবে' (পৃ-১৩)। এখানে কোন শ্রেণি থেকে ইংরেজি বা নৈতিক শিক্ষা (মানে ধর্ম) পড়তে হবে, তা স্পষ্ট করা হয়নি। আমাদের বিবেচনা খুদা কমিশনের অনুরূপ; কারণ 'নিম্ন মধ্যবিত্ত স্তর থেকে শুরু করে জনসাধারণের বিপুল অংশ থেকে যে শিশুরা প্রাথমিক স্তরে আসবে ইংরেজি তাদের কাঁধে শুরু থেকেই চাপিয়ে দিলে জোঁয়াল ফেলে দিয়ে তারা শিক্ষায়তন ত্যাগ করবে। শিক্ষা যতোই বাধ্যতামূলক করা হোক না এটা ঠেকানো যাবে না' (মুক্তিযুদ্ধের চেতনা : গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রসঙ্গে : হাসান আজিজুল হক, শিক্ষাবার্তা, নির্বাচিত রচনা (১৯৮৭-১৯৯৮), পৃ ২০৫)।

পৃথিবীর বহুদেশে প্রাথমিক স্তরে তো বটেই, এমনকি মাধ্যমিক স্তরেও ইংরেজি বা অন্য কোনো বিদেশি ভাষা বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হয় না। যারা উচ্চশিক্ষা নিতে চায়, তারাই কেবল ইংরেজির দ্বারস্থ হয়। আমাদের দেশে, যেখানে প্রাথমিক শিক্ষায় অবস্থানকালীন ব্যাপক শিক্ষার্থী ঝরে যায়, সেখানে সবাইকে ইংরেজি শেখাবার পরিকল্পনা ফলদায়ক হবার সম্ভাবনা কম। তাছাড়া ওই ঝরে যাওয়া শিক্ষার্থীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যে 'ইংরেজি ভীতি' থেকেই ঝরে পড়ে, এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কাজেই বর্তমানে প্রচলিত তৃতীয় শ্রেণি থেকে বাধ্যতামূলকভাবে ইংরেজি পাঠ—এই সিদ্ধান্তটি নতুন করে পর্যালোচনা করা দরকার।

কর্মদিবসের স্বল্পতা

আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শ্রেণিগুলোর পাঠ্যসূচি প্রণীত হয় একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত মাথায় রেখে। প্রথম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণির পাঠ্যসূচি সমাপ্ত করা, বার্ষিক পরীক্ষা নেয়া ও ফলাফল প্রদানের কাজ সারতে হয় এক পঞ্জিকা বছরের মধ্যে। দশম শ্রেণির ক্লাস হয় এক পঞ্জিকা বছরের চেয়েও আরো কম সময়। নভেম্বরের মধ্যে নির্বাচনী পরীক্ষা শেষ করার পর আর ক্লাস নেয়া হয় না। একাদশ শ্রেণির ক্লাস শুরু হয় জুলাই/ আগস্ট মাসে।

www.pathagar.com

দ্বাদশের ক্লাস শুরু হয় মে মাসে। ফলে এক শিক্ষাবর্ষের মধ্যে তারা ক্লাস পায় নয় মাসেরও কম সময়। দ্বাদশের নির্বাচনী পরীক্ষা হয় জানুয়ারির মধ্যে। ফলে তারা ক্লাস পায় সাত মাসেরও কম সময়। স্নাতক (পাস), সম্মান বা স্নাতকোত্তর শ্রেণির শিক্ষার্থীরাও কোনোভাবেই আট মাসের বেশি ক্লাস করার সুযোগ পায় না। আবার ওই ক্লাসের সময়টুকুতে কত কী বন্ধ থাকে। সাপ্তাহিক বন্ধ, রমজান মাসের বন্ধ, ঈদুল ফিতর, দুর্গাপূজার বন্ধ, বিভিন্ন শ্রেণির পরীক্ষা গ্রহণের নিমিত্তে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান মুলতবি, মহররম-জন্মাষ্টমী, বড়দিন, মাঘী পূর্ণিমা, শহিদ ভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, দিনের পর দিন হরতাল-অবরোধসহ আরো কত যে বন্ধ। এরপর আছে শিক্ষকদের নৈমিত্তিক ছুটি, অসুখ বিসুখ। ফলে এক শিক্ষাবর্ষের মধ্যে কোন বিষয়ের কতটি ক্লাস হয়, সেটা গবেষণার বিষয়। ক্লাস হোক আর না হোক, পরীক্ষা নেয়া হয় নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠ্যসূচি পড়িয়ে শেষ করা যায় না। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষের অসমাপ্ত পড়াটুকু বোঝার জন্য হয় প্রাইভেট পড়ার জন্য লাইন ধরে, কোচিং সেন্টারে টাকা ঢালে, নতুবা পাঠ্যপুস্তক অসমাপ্ত রেখেই অবতীর্ণ হয় পরীক্ষায়। শিক্ষালয়ে কর্মদিবসের এত স্বল্পতা, ফলত কম কর্মঘণ্টা—অন্য কোনো দেশে আছে কি-না সন্দেহ। একটা বই ভালোভাবে পাঠদান করবার জন্য যে সময়টুকু নির্ধারিত থাকে, এরই অর্ধেক সময় যদি বিভিন্ন বন্ধের কারণে পাঠদান পর্ব না চলে, তাহলে শিক্ষা গ্রহণ বা শিক্ষা প্রদানের প্রক্রিয়াটিতে কী পরিমাণ গলদ বা ফাঁকি আছে—ব্যাপারটা ভেবে দেখা উচিত; সিলেবাস অসমাপ্ত রেখে শিক্ষার্থীদেরকে গিনিপিগ বানিয়ে পরীক্ষায় বসানো—এটা জনমুখী ও কল্যাণকামী শিক্ষাব্যস্থার পরিচয় বহন করে না।

গৃহশিক্ষক, কোচিং সেন্টার/গাইড বই, নোট বই প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়ে কথা শুরু করা যাক, 'আজকাল প্রয়োজনের নিয়মে শিক্ষকের গরজ ছাত্রের কাছে আসা, কিন্তু স্বভাবের নিয়মে শিষ্যের গরজ গুরুকে লাভ করা। শিক্ষক দোকানদার, বিদ্যাদান তাঁহার ব্যবসায়। তিনি খরিদ্দারের সন্ধানে ফেরেন। ব্যবসাদারের কাছে লোকে বস্তু কিনতে পারে, কিন্তু তাহার পণ্য তালিকার মধ্যে স্নেহ শ্রদ্ধা নিষ্ঠা প্রভৃতি হৃদয়ের সামগ্রী থাকিবে এমন কেহ প্রত্যাশা করিতে পারে না। এই প্রত্যাশা অনুসারেই শিক্ষক বেতন গ্রহণ করেন ও বিদ্যাবস্তু বিক্রয় করেন—এইখানে ছাত্রের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ।' (শিক্ষা সমস্যা, পৃ-৩০৭, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড)।

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথের সময় শিক্ষকের না ছিল টিউশনি, না ছিল কোচিং বাণিজ্য। আর নোট গাইড বইয়ের কথা তখন কারো কল্পনাতেও ছিল না। সাড়ে তিন দশক আগেও স্কুল বা কলেজ পর্যায়ে নোট বই, গাইড বই দেখা যেতো না। আর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তা ছিল স্বপ্নের অতীত। তখন মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা অঙ্ক, ইংরেজি বা বিজ্ঞানের বিষয়গুলো প্রাইভেট পড়ত বটে। শিক্ষকদের কাছ থেকে হাতে তৈরি নোট নিত; তবে প্রাথমিক শিক্ষাপর্যায়ে এসবেরও বালাই ছিল না। কলেজে অনার্স, মাস্টার্স পড়ুয়াদের কেউ কেউ বিষয়ভেদে প্রাইভেট পড়ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী ক্লাসনোট অনুসরণ করত; রেফারেন্স বই ঘেঁটে নিজেরা উত্তর তৈরি করত। কিন্তু এখন, কারবারি যুগের প্রভাবে সেই শিক্ষাচিত্রটা আমূল পাল্টে গেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণি থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত—সকল শিক্ষার্থী কেউই টেক্সট বই পড়ে না, নোট-গাইড বই পড়ে। নিজে নিজে কোনো সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা করে না, শিক্ষকের শরণাপন্ন হয়। প্রাইভেট-কোচিংয়ের ক্রয় করা বিদ্যা নিয়ে এমনই ব্যস্ত থাকে যে, নিজের মেধা আছে কি নেই, সেটা যাচাই করতেও সচেষ্ট হয় না কেউ। বস্তুত প্রতি বছর আমরা গুটিকয় স্কুল-কলেজের দ্যুতিময় রেজাল্ট দেখে শিহরিত হই, একবারও ভাবি না যে—ওখানকার শিক্ষার্থীরা কথিত মেধার যে স্বাক্ষরটুকু রাখছে—এটা তাদের মৌলিক মেধা নয়, উচ্চমূল্যে ক্রয় করা চন্দ্রালোকিত মেধা।

প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী, যারা দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে, তাদের পঠিতব্য প্রশ্নোত্তর মূল বইয়েই দেয়া থাকে, তারা কেন দল বেঁধে প্রাইভেট পড়তে যায়? যায় এজন্য যে, এদের অধিকাংশের মা-বাবা অশিক্ষিত, সন্তানকে পড়াবার যোগ্যতা নেই, যে স্কুলে সন্তানরা পড়ে, দুঃখজনকভাবে সেখান থেকে পড়ানোর সঠিক দিক-নির্দেশনা দেয়া হয় না, কাজেই বাধ্য হয়ে তারা, বিশেষ করে অঙ্ক ইংরেজি প্রাইভেট পড়তে যায়। যারা আর্থিক কারণে এই পথটি অবলম্বন করতে পারে না—তারা গাইড বই, নোট বইয়ের ছায়াতলে আশ্রয় খোঁজে, কিন্তু অঙ্ক ইংরেজির ক্ষেত্রে গাইড-নোটের সহায়তা যখন যথাযথ ফল দিতে ব্যর্থ হয়—অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা যখন নিজের চেষ্টায় ওই দুটো বিষয়ের কাঠিন্য ভেদ করতে অক্ষম হয়—তখন তারা শিক্ষা নামক প্রপঞ্চ থেকে দূরে সরতে থাকে। তাই প্রাথমিক পর্বে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার কমাতে হলে ইংরেজি বা অঙ্ক বিষয়ের কাঠিন্য কমাতে হবে; নতুবা ওই দুটি বিষয় শ্রেণিকক্ষে খুব যত্নসহ পড়াতে হবে যাতে বিষয় সমাধানের জন্য কোনো শিশু প্রাইভেট পড়তে বাধ্য না হয়। সবচেয়ে ভালো হয়, যদি প্রাথমিক পর্যায়

www.pathagar.com

থেকে ইংরেজি বিষয়টি ছেঁটে দেয়া হয়। অবশ্য এ কাজ করলে অনেকের হয়তো পিত্তি জ্বলতে শুরু করবে, কিন্তু তাতে ঘাবড়ে গেলে চলবে না। প্রথাগত ধারার বাইরে, তা হোক না তা খুব কল্যাণকর, যে কোনো উদ্যোগ নিতে গেলে নিন্দুকরা কমবেশি সমালোচনা করবেই।

শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত

যে কোনো দেশে যতগুলো পেশা আছে, এর মধ্যে জাতিগঠনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী পেশারটির নাম শিক্ষকতা। আজকে যারা শিশু, যারা শিক্ষকের কথাকে বেদবাক্য মনে করে, আগামী দিনে তারাই তো রাষ্ট্রের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে। ওই শিশুদেরকে কোনো শিক্ষক যদি নিখাদ সত্যের সন্ধান না জানান বা সত্য অসত্যের পার্থক্য না শেখান, যদি বড় হবার মন্ত্র না পড়ান, বা শিশুকে আলোর সন্ধান দেয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষক নিজেই যদি অযোগ্য বলে বিবেচিত হন, অথবা তিনি যদি নৈতিকভাবে স্খলিত হন, তাহলে শিক্ষার্থীর উপর এর কম বেশি প্রভাব পড়বেই। শিশুরা সবচেয়ে বেশি মানে এবং বিশ্বাস করে তার শিক্ষক বা শিক্ষিকার কথাকেই। কাজেই শিশুমনস্তত্ত্বের নিরিখে এ পেশায় যারতার আগমন রোধ করতে হবে, সৃষ্টিশীল, মেধাবী-কর্মনিষ্ঠ-প্রত্যয়ীদেরকে এ পেশায় নিয়োগ দিতে হবে; শিক্ষকের নিজের ভাণ্ডার যদি শূন্য থাকে, তাহলে তিনি অপরকে দান করবেন কোত্থেকে বা তাঁর নিজের মনে আগুন না থাকলে তিনি ছাত্রের মনের প্রদীপ কীভাবে জ্বালাবেন?

বর্তমান বাংলাদেশে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা কী চিত্র দেখছি? এখানে মেধা অপেক্ষা পিছনের তদ্বিরের জোর বেশি, দক্ষতা অপেক্ষা দক্ষিণার ক্রিয়া বেশি। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বেসরকারি পর্যায়ে, আমরা বোধহয় ভুলেই যাই, তদ্বিরের ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ দিলে কারো ব্যক্তিগত ফায়দা হয়তো হাসিল হতে পারে, কিন্তু জাতির ভাগ্যে নেমে আসে একাধিক প্রজন্মবিস্তারি ঘোর অমানিশা। শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত নিজস্ব অভিজ্ঞতায় দেখেছি, বেসরকারি স্কুল-কলেজ বা মাদ্রাসায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের পছন্দের প্রার্থী থাকে। ওই প্রার্থী নিয়োগ সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় খারাপ করলেও তাকে নেয়ার জন্য ক্ষমতাবলয় থেকে চাপাচাপি করা হয়। সিংহভাগ ক্ষেত্রে সে চাপ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। ফলে শিক্ষক হিসেবে এমন অনেকেই নিয়োগ পেয়ে যায়, যাদের ওই পেশায় আসার ন্যূনতম যোগ্যতা নেই। এইসব অযোগ্য অশিক্ষকদেরকে নিয়ে একুশ শতকের বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিনির্ভর, জ্ঞানানুসন্ধিৎসু শিক্ষাব্যবস্থার বিস্তার ঘটানো অসম্ভব কাজ বৈকি।

www.pathagar.com

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও এ রকম অপপ্রবণতা থেকে মুক্ত নয়। সেখানেও রাজনীতির রং দেখে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। যোগ্যতম প্রার্থীকে বাদ দিয়ে নিয়োগ দেয়া হয় ক্ষমতাসীন দলের অনুগতদের। ফলে অতিমাত্রায় রাজনীতিকরণের জন্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথাযথ শিক্ষাদান ও মুক্তবুদ্ধি চর্চা ব্যাহত হচ্ছে। অনেক শিক্ষক আসল কাজ ফেলে রাজনীতির মাঠে ঘোরাফেরা করেন। তাঁরা বুঝে গিয়েছেন, বড় পদ বাগাবার জন্য মেধা কিংবা গবেষণাকর্ম মূল নিয়ামক নয়, বড় প্রভাবক হলো রাজনীতি। বস্তুত আমাদের শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত করতে না পারলে শিক্ষাবিকাশের প্রত্যাশিত ধারা বহমান রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। শিক্ষার স্বার্থে, জাতির কল্যাণার্থে শিক্ষক রাজনীতি যেমন বন্ধ করে দেয়া উচিত, তেমনি উচিত শিক্ষার্থীদেরকে রাজনীতির করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করে কেবল পড়াশোনার মধ্যে স্থিত করে রাখা।

শিক্ষকদের বেতন প্রসঙ্গ

শুরুতেই একটা তুলনায় যেতে চাই। দুই বন্ধুর একজন গ্রাজুয়েট হবার পর চাকরি নিল সরকারি অফিসের তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী হিসেবে। অন্যজন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স মাস্টার্স করে চাকরি নিল কলেজে। পাঁচ-দশ বছর পর উভয়ের আর্থিক অবস্থানের কী চিত্র দেখা যাবে? কলেজ শিক্ষকটি, সে সরকারি বা বেসরকারি যে প্রতিষ্ঠানেই চাকরি করুক, তার সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যাচ্ছে। বউ আর দুই ছেলেমেয়ে, সাথে বৃদ্ধ মা-বাবা নিয়ে তার দুর্বিষহ সংসার। মাসের মাঝখান থেকে টানাটানির শুরু। বাবা-মার ওষুধ, সন্তানদের পড়াশোনার খরচ, স্ত্রী কিংবা নিজের হাতখরচ—সব মিলিয়ে যা ব্যয়, তা বেতনের টাকার মধ্যে সীমিত করে রাখা পুরোপুরি অসম্ভব। অন্যদিকে তার বন্ধুটি, যে কিনা কম মেধাবী ও কম শিক্ষিত, সে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের ছোঁয়ায় বেশ ভালোভাবে সংসার চালিয়ে যাচ্ছে। সন্তানকে প্রাইভেট বা কোচিং-এ দিচ্ছে, স্ত্রীকে গয়না গড়িয়ে দিচ্ছে, বাড়ি তৈরি করছে, জমি কিনছে ইত্যাদি। তার ঔজ্জ্বল্যে ম্রিয়মাণ হয়ে তখন অধ্যাপক বন্ধুটি হতাশায় পুড়তে পুড়তে বাড়তি 'ইনকাম'-এর পথ খোঁজছে। সে পথ প্রাইভেট পড়ানো বা কোচিং করানো। এখন আমরা যদি শিক্ষাব্যবস্থা থেকে প্রাইভেট বা কোচিং-কে সমূলে উৎপাটন করতে চাই, তাহলে ওই শিক্ষককে ন্যূনতম আর্থিক সুবিধা দেয়া সঙ্গত নয় কি? বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের মাসিক বাড়িভাড়া ভাতা ১০০ টাকার স্থলে ৫০০ টাকা করা, সেটা অঙ্কের বিচারে যৌক্তিক বটে, কিন্তু মানবিক কিংবা নৈয়ায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি প্রশ্ন করা হয়, ওই টাকা

www.pathagar.com

দিয়ে বস্তিতেও তো ঘর পাওয়া যায় না, তাহলে কোথায় বাড়িভাড়া নেয়ার জন্য শিক্ষককে সে টাকাটা দেয়া হচ্ছে? একই প্রশ্ন প্রযোজ্য তাদের চিকিৎসা ভাতার ক্ষেত্রেও; একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সবার অধিকার সমান—এমন গালভরা কথা বলার পর, কেবল একটা নির্দিষ্ট পেশার ক্ষেত্রে খোদ রাষ্ট্র কর্তৃক বৈষম্য প্রদর্শন—কখনো কাম্য হতে পারে না। আমরা প্রায়ই বলি, গার্মেন্টস মালিকরা কায়দা করে সস্তায় শ্রম কিনে নিয়ে শ্রমিককে খুবই ঠকাচ্ছে। তো ওই লক্ষ লক্ষ শিক্ষককে যখন প্রাপ্যের তুলনায় কণামাত্র বাড়িভাড়া দেয়া হয়, চিকিৎসা ভাতা দেয়ার ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় বঞ্চিত করা হয়, (যা আবার আইন করে স্বীকৃত ও বিধিবদ্ধ) এ ব্যাপারটা কি শোচনীয় ঠকানোর পর্যায়ে চলে যায় না? যার কাছে আপনি সততা, ন্যায়পরায়ণতা, কর্তব্যনিষ্ঠা খুব করে আশা করেন, তার ব্যাপারে আপনি নিজে কতটুকু সৎ ও আন্তরিক—সেই আত্মসমালোচনা কেউ কি করেছে কখনো? আর একটা কথা, এখনকার জমানায় অন্য চাকরি না পাওয়া লোকরা শিক্ষকতায় আসে, অর্থাৎ এ পেশার প্রতি মেধাবীদের ন্যূনতম আগ্রহ নেই, এর মূল কারণ ওই পেশার অর্থনৈতিক-ঊনতা। কাজেই শিক্ষার মানসম্মত বিকাশ দেখতে হলে, এ পেশায় মেধাবীদের টানতে হবে এবং সেজন্য চাই শিক্ষকদের সুন্দর জীবনযাপন করার মতো আর্থিক নিশ্চয়তা।

শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রসঙ্গ

আমাদের শিক্ষক-প্রশিক্ষণের উপর আলোকপাত করে 'জাতীয় শিক্ষানীতি' ২০০৯ এ তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করা হয়েছে, 'দেশে প্রচলিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা খুবই গতানুগতিক, অসম্পূর্ণ, সনদপত্র সর্বস্ব, তত্ত্বীয় বিদ্যাপ্রধান, ব্যবহারিক শিক্ষা অপূর্ণ, মুখস্থবিদ্যার উপর নির্ভরশীল এবং পুরনো পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসারী। তাই আশানুরূপ ফললাভ হচ্ছে না।' এটি খুবই খাঁটি ও সত্য কথা। কিন্তু আমাদের প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলোর কেন এই শোচনীয় হাল? উপযোগিতাবর্জিত অর্থশ্রাদ্ধ? প্রশিক্ষণদানের গুরুভার যাদের উপর অর্পিত, তারা ওই ভারটুকু মেধাবলে প্রাপ্ত হয়েছেন, নাকি অনুক্ত বন্ধুর পথ বেয়ে বেয়ে ওখানে গিয়ে সমাসীন হয়েছেন, সে প্রশ্নের উত্তর কমবেশি সবাই জানি। আমাদের কোনো বিশেষ পদের জন্য কোনো বিশেষ যোগ্যতার মাপকাঠি আছে কি? পদের জন্যে যোগ্যতা অপেক্ষা অন্য যোগাযোগের পারঙ্গমতা কি বেশি শক্তিশালী নয়? যোগ্য লোক যদি যোগ্য স্থানে সহজ প্রবেশাধিকার না পান, গুণ অপেক্ষা নুনের গুরুত্ব যদি বেড়ে যায়, প্রশিক্ষকদের অধিকাংশ নিজেরাই যদি অপ্রশিক্ষিত থাকেন, নিজের কাজটি সুচারুভাবে করতে গিয়ে

www.pathagar.com

ব্যর্থ হন, প্রশিক্ষণার্থীদের আস্থা অর্জনে অসফল হন, তবে যে কাজের নামে সরকারি কোষাগার থেকে অর্থ ব্যয় করা হয়, সেটি তখন হয় অপব্যয়, নয় তো অপচয়। আমাদের শিক্ষক প্রশিক্ষণে অপচয়ের মাত্রা প্রবলভাবে দৃশ্যমান। ওইসব প্রশিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান—যে গুলোর অধিষ্ঠান বড় বড় শহরে, সেখানে প্রবেশাধিকারের নিয়ামক যোগ্যতা বা দক্ষতা নয়—অন্যকিছু। সেই অন্যকিছুতে যারা বলীয়ান, তাদের মেধা যাই থাকুক, বড়ো শহরই যেন স্থায়ী কর্মস্থল তাদের। তারাই হয় বড় কলেজ পড়ান, শিক্ষাপ্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হন, ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পদ অলঙ্কৃত করেন, রকমারি সংযুক্তি নিয়ে একই শহরে পুরো চাকরি জীবন কাটিয়ে দেন। শিক্ষকতা—যার প্রধান শক্তি যোগ্যতা-দক্ষতা-মেধা-মননশীলতা, এর সঠিক প্রয়োগ নেই বিধায়, আমরা প্রশিক্ষণপীঠ বা যথাস্থান থেকে যথাযথ ফল লাভ করতে পারছি না।

প্রথাগত শিক্ষা প্রসঙ্গ

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় দেখা যায়, ক্লাস বা ধাপ ডিঙ্গানোর পর মেধা বা বুদ্ধিবৃত্তিক স্তর কার, কী পরিমাণ বাড়ল, সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়—গণ্য বিষয় হলো কে কী পরিমাণ নম্বর পেয়েছে। অর্থাৎ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় মেধাবী হিসেবে তারাই বিবেচিত, যারা পরীক্ষা নামক মহারণে বেশি বেশি নম্বর অর্জন করতে পারে। ধরি একজন শিক্ষার্থী সারা বছর প্রাইভেট পড়ে, শিক্ষক প্রদত্ত নোট মুখস্থ করে পরীক্ষার হলে বমন করল এবং বেশি বেশি নম্বর পেল, বিপরীতে আরেকজন সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়, কোনোকিছু মুখস্থ না করে নিজের মেধা ও প্রজ্ঞা থেকে পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর বানিয়ে লেখলো এবং প্রথম জন থেকে কম নম্বর পেল। এখানে আমরা মেধাবী বলব কাকে? দুজনের মধ্যে কাকে দেব উচ্চশিক্ষায় প্রবেশাধিকার? আমরা কেন বুঝি না, কেউ যখন টাকা দিয়ে শিক্ষা কিনে পরীক্ষার খাতায় বমি করে আসে, মূলত শিক্ষাকে সে বহন করে মাত্র, সে ভারবাহক। আর যে নিজস্ব ধারায় স্থিত হয়ে, মুখস্থবিদ্যা এড়িয়ে পরীক্ষায় পাস করে, সে-ই প্রকৃত সৃষ্টিশীল। কাজেই শিক্ষার্থীর ভেতরের মৌলিকতা পরিস্ফুটনের জন্য এমন শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলন করা দরকার, যা মুখস্থ করে বা শিক্ষকের কাছ থেকে টাকায় কিনে এনে পরীক্ষার হলে কামিয়াব হওয়ার সুযোগ থাকবে না, সেখানকার প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর লেখতে হবে তাৎক্ষণিক বুদ্ধি খাটিয়ে, নিজের সৃষ্টিশীল মনোজগৎ থেকে তৈরি করে করে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণে নেয়া যাক, 'শিশুকাল হইতেই কেবল স্মরণশক্তির উপর সমস্ত ভর না দিয়া সঙ্গে সঙ্গে যথাপরিমাণে চিন্তাশক্তি ও

www.pathagar.com

কল্পনাশক্তির স্বাধীন পরিচালনার অবসর দিতে হইবে।—কিন্তু আমরা বাল্য হইতে কৈশোর এবং কৈশোর হইতে যৌবনে প্রবেশ করি কেবল কতকগুলা কথার বোঝা টানিয়া। সরস্বতীর সাম্রাজ্যে কেবলমাত্র মজুরি করিয়া ফিরি, পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায় এবং মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ হয় না। যখন ইংরেজির ভাবরাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করি তখন আর সেখানে তেমন যথার্থ অন্তরঙ্গের মতো বিহার করিতে পারি না। যদি বা ভাবগুলা একরূপ বুঝিতে পারি কিন্তু সে গুলাকে মর্মস্থলে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারি না। বক্তৃতায় এবং লেখায় ব্যবহার করি, কিন্তু জীবনকার্যে পরিণত করিতে পারি না' (শিক্ষা, পৃ-২৮৩, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী সম্পাদিত)। কাজেই পরীক্ষায় 'কমন' পড়া, বা অন্যের ফলানো ফসল নিজের বলে চালিয়ে দেয়া, বা প্রথাগত শিক্ষকানুকূল্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বলবান হওয়া—ইত্যাদি প্রবণতা যদি রোধ করা যায়, তাহলে বাজারি নোটবই, গাইড বইয়ের প্রভাব থাকবে না, প্রাইভেট-টিউশনি নামক শব্দগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং শিক্ষার্থীর নিজস্ব মেধা তৈরি করার একটা ফলপ্রসূ উপায় গড়ে ওঠবে। এখন প্রশ্ন হলো, ওই রঙ্গে এবং ঢঙ্গে পুরো শিক্ষাব্যবস্থা সাজানোর উপায় আছে কি এবং সেটা কীভাবে সাজানো যায়?

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, শিক্ষা—কারো ভাবনাকে সংকোচিত বা নির্দিষ্ট গণ্ডীতে আবদ্ধ করে না, এটা সবার ভাবনাকে বিস্তৃত করে, যৌক্তিক পথের সন্ধান দেয়, নিজস্বতার আঙ্গিক গড়তে উৎসাহ দেয়। তাহলে ব্যাপারটা কেন এমন হতে পারে না যে, রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা পাঠ্য করা হলো, ওই কবিতার শব্দার্থ ও সারমর্ম দেয়া হলো, কোনো প্রশ্ন সংযোজন করা হলো না। বলা হলো, ওই কবিতার অনুসরণে যে কোনো প্রশ্ন করা হতে পারে, কবিতার তৃতীয় পঙ্‌ক্তির পর চতুর্থ পঙ্‌ক্তি কী, কবিতার সপ্তম পঙ্‌ক্তির অর্থ কী—যা কেবল নিজের মতো পড়ে উত্তর করা যাবে। ওই মূল রচনা থেকে একেক বছর একেক রকম প্রশ্ন করা হবে, প্রশ্নের কোনো কাঠামোবদ্ধ রূপ থাকবে না, যাতে এর প্রথাবদ্ধ উত্তর সাজাতে গিয়ে নোট কিংবা গাইড বই-ওয়ালারা হিমশিম খেয়ে যায়। প্রতি তিন বছর পর পর পাঠ্যসূচি বদলে ফেলতে হবে, যাতে বই ব্যবসায়ীরা ওই খাতে টাকা খাটাতে নিরুৎসাহিত বোধ করে। ছাত্রছাত্রীর মেধা বিকাশের জন্য 'নিজের তৈরি' উত্তরকে বিশেষ বিবেচনায় এনে ভালো নম্বর প্রদান করতে হবে; তাদের মনে বদ্ধমূল ধারণার জন্ম দিতে হবে যে, নিজের চেষ্টায় উত্তর লেখলে ভালো ফল পাওয়া যায়, অন্যদিকে কেবল পাঠ্য বই, গাইড নোটের ভেতর নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলে

www.pathagar.com

চিন্তার ক্ষীণতা দেখা দেয়, চোখ এবং মনের দৃষ্টিতে ফারাক রচিত হয়, এর প্রভাবে আমাদের অবস্থা হয়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বইয়ের লোককে চিনি, পৃথিবীর লোককে চিনি না। বইয়ের লোক আমাদের পক্ষে মনোহর, পৃথিবীর লোক শ্রান্তিকর।...যখন আমরা বড়ো কথা, বইয়ের কথা লইয়া আলোচনা করিতে পারি, কিন্তু সহজ আলাপ, সামান্য কথা আমাদের মুখ দিয়া বাহির হইতে চায় না, তখন বুঝিতে হইবে দৈবদুর্যোগে আমরা পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছি, কিন্তু আমাদের মানুষটি মারা গেছে।'

পাঠ্যপুস্তক ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পাঠ্যপুস্তক কেমন হওয়া উচিত, তাতে কোন ধরনের প্রশ্ন বা অনুশীলনী সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত—এ সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টিপাত করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সেই ভাবনা আজকের দিনেও ফলপ্রসূ—বিধায় তাঁকে উদ্ধৃত করা হলো :

উদাহরণ–১.

রাম খাইতেছে। পাখী উড়িতেছে। হরি পীড়িত হইয়াছে। মানুষ মরিয়া যায়। এইগুলিকে এক একটি বাক্য, উক্তি বা পদ বলা যায়।

'রাম খাইতেছে'—এই বাক্যে কাহার কথা বলা যাইতেছে? রামের কথা। অতএব রাম এই বাক্যের 'বিষয়'।

'পাখি উড়িতেছে'—কাহার কথা বলিতেছি? পাখীর কথা। 'হরি পীড়িত হইয়াছে'—কাহার কথা বলিতেছি? হরির কথা। 'মানুষ মরিয়া যায়'—কাহার কথা বলিতেছি? মানুষের কথা। পাখী, হরি, মানুষ, ইহারা ঐ ঐ বাক্যের বিষয়।

'রাম খাইতেছে'—এখানে রামের কথা বলিতেছি বটে, কিন্তু রামের কথা কি বলিতেছি? সে 'খাইতেছে'–তাহার খাবার কথা বলিতেছি। 'খাইতেছে' হইল বক্তব্য। 'পাখী উড়িতেছে'—'উড়িতেছে' বক্তব্য। 'মানুষ মরিয়া যায়'—'মরা' এখানে বক্তব্য।

অতএব সকল বাক্যে, দুইটি বস্তু থাকে, একটি 'বিষয়' আর একটি 'বক্তব্য'। এই দুইটিই না থাকিলে বাক্য বলা সম্পূর্ণ হয় না। শুধু 'গোরু' বলিলে, তুমি বুঝিতে পারিবে না যে, আমার বলিবার কথা কি? কিন্তু 'গোরু চরিতেছে' বলিলেই তুমি বুঝিতে পারিলে। বাক্য সম্পূর্ণ হইল। শুধু 'ভাসিতেছে' বলিলে তুমি বুঝিতে পার না যে, আমার বলিবার ইচ্ছা কি? তুমি জিজ্ঞাসা করিবে, কি ভাসিতেছে? কিন্তু যদি বলি যে, 'কুম্ভীর ভাসিতেছে' বা 'নৌকা ভাসিতেছে', বাক্য সম্পূর্ণ হইল—তুমি বুঝিতে পারিলে।

www.pathagar.com

অভ্যাসার্থ

নীচের লিখিত বিষয়গুলি লইয়া, তাহাতে বক্তব্য যোগ কর; ঘোড়া, আকাশ, নক্ষত্র, সমুদ্র, বালক, মাতা...।

নীচের লিখিত বক্তব্য লইয়া তাহাতে বিষয় যোগ কর; হাসিল। উচিত নয়। বাড়িয়াছে। ডুবিয়াছিল। অধীন ছিল। (পাঠ্য পুস্তক : সহজ রচনাশিক্ষা, বঙ্কিম রচনাবলী, পৃ- ৯২৮)।

উদাহরণ–২.

"কখন কখন বিষয়ের কোন গুণ কি দোষ আগে লিখিয়া তার পর বক্তব্য লিখিতে হয়। যেমন—'সুন্দর পাখী উড়িতেছে।' 'দুঃখী হরি পীড়িত হইয়াছে।' এখানে পাখিটির একটি গুণ যে, সে সুন্দর; ইহা বলা হইল। হরির একটি দোষ যে, সে দুঃখী; ইহা বলা হইল। এগুলিকে বিশেষণ বলে। 'সুন্দর' 'দুঃখী' এই দুটি বিশেষণ। যাহার বিশেষণ, তাহাকে বিশেষ্য বলে। 'পাখী' 'হরি' ইহারা বিশেষ্য। বিশেষণ উপযুক্ত হইতে পারে, অনুপযুক্তও হইতে পারে। উপযুক্ত বিশেষণ, যেমন—

ফলবান বৃক্ষ নির্ম্মল আকাশ

বলবান মনুষ্য বেগবতী নদী।

অনুপযুক্ত বিশেষণ, যেমন—নির্ম্মল বৃক্ষ; ফলবান মনুষ্য; বেগবান আকাশ।

এইগুলি অনুপযুক্ত। বৃক্ষের সমলতা বা নির্ম্মলতা নাই, এই জন্য নির্ম্মল বৃক্ষ বলা যায় না। মানুষে কোন ফল ফলে না, এই জন্য ফলবান মনুষ্য বলা যায় না। আকাশের বেগ নাই, এজন্য বেগবান আকাশ বলা যায় না। যে বিশেষণ উপযুক্ত তাহাই লিখিবে, যাহা অনুপযুক্ত তাহা লিখিও না।

অভ্যাসার্থ

১. নিচের লিখিত বিশেষ্যের সঙ্গে উপযুক্ত বিশেষণ যোগ কর ঃ সমুদ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, হস্তী, বন, সংসার, স্ত্রী, কন্যা, পুত্র, বালিকা, দেশ, রাত্রি, আসন, পুতুল, হংস।

২. নীচের লিখিত বিশেষণের পর উপযুক্ত বিশেষ্য যোগ কর ঃ নশ্বর, পবিত্র, দীন, অযোগ্য, কষ্টসাধ্য, গুণবতী, সুলভ, সদাচার, শান্ত, পরিষ্কার, অজ্ঞাত। (পাঠ্যপুস্তক—সহজ রচনা শিক্ষা, বঙ্কিম রচনাবলী, পৃ-৯৩০)।

উদাহরণ–৩.

"অনেক বালককে প্রবন্ধ লিখিতে বলিলে তাহারা খুঁজিয়া পায় না যে, কি লিখিতে হইবে। একটি বিষয় লও, যথা—অশ্ব। অশ্ব সম্বন্ধে দুই তিনটি

www.pathagar.com

বাক্য লেখ। যথা—'অশ্ব চতুষ্পদ। অশ্ব বড় দ্রুতগামী। মনুষ্য অশ্বের উপর আরোহণ করে।' এখানে তিনটি বাক্যের বিষয় একই অশ্ব, কিন্তু বক্তব্য তিনটি। যথা—চতুষ্পদ, দ্রুতগমন, মনুষ্যগণের তদুপরি আরোহণ। এই জন্য তিনটি পৃথক বাক্য হইল। এইরূপ এক বিষয়ে অনেকগুলি বাক্যকে একত্র করিলে প্রবন্ধ বা বক্তৃতা হইল।

আরও একটি বিষয় লও, 'পৃথিবী'।

'পৃথিবী গোলাকার। পৃথিবীতে জল ও স্থল আছে। পৃথিবী সূর্য্যকে সংবেষ্টন করে।'

পরীক্ষার্থ : হস্তী, কুকুর, চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, বিদ্যা, মাতাপিতা, রাগ, সাহস, শিক্ষক, দয়া।" [পাঠ্যপুস্তক—সহজ রচনা শিক্ষা, বঙ্কিম রচনাবলী, পৃ-৯৩২, (মূল রচনা থেকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত)]।

বঙ্কিমচন্দ্র কথিত এই পাঠ্যক্রম ও প্রশ্নপত্রের নমুনা—যেমন বিজ্ঞানসম্মত, বস্তুনিষ্ঠ, শিক্ষার্থীর মনোবিকাশের সহায়ক, তেমনি গাইড-নোট বই পড়ে (যদি অভ্যাসার্থ বা পরীক্ষার্থকে সীমিত করা না হয়; লক্ষণীয় যে, এখানকার প্রশ্নমালা মূল রচনার অনুবর্তী বটে, তবে মূল থেকে আহরিত নয়।) এমন প্রশ্নের উত্তর দেয়া অসম্ভব। এক্ষেত্রে নিজের চেষ্টা ভিন্ন অন্য কোনো উপায় খুব ফলপ্রসূ হবার কথা নয়।

এক্ষেত্রে এমন সম্ভাবনা আছে যে, শিক্ষার্থীরা হন্যে হয়ে লাইন ধরবে শিক্ষকের কাছে, সহায়তা নেয়ার জন্য। এটা রোধ করবার জন্যে প্রশ্নপত্রের ধরনে পরিবর্তন আনাই যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের প্রাইভেট পড়ানো বা কোচিং করানোকে 'গর্হিত কাজ' বলে বিবেচনায় এনে কঠোর আইন প্রণয়ন করতে হবে। মূল কথা, শিক্ষার্থীর মনে যদি ওদের নিজস্ব মেধার স্বীকৃতিকে স্পষ্ট করে তোলা যায়, তাহলে ওরাই ক্রমে ক্রমে প্রাইভেট পড়া বা কোচিং সেন্টারের জগৎ থেকে সরে আসবে। তাছাড়া সকল বিষয় থেকে যদি রচনামূলক প্রশ্নের প্রথাবদ্ধ কাঠামো বাদ দিয়ে মূল রচনাকে পুরো গুরুত্ব দিয়ে প্রশ্ন উপস্থাপন করা হয়, যদি নোট-গাইড, প্রাইভেট-কোচিং ইত্যাদিকে এক দুই বছর 'অর্থহীন বা ব্যর্থ' বলে প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে শিক্ষার বর্তমান দীনতায় সুদিন ফিরে আসতেও পারে। পরীক্ষার খাতায় কী লেখেছে, সেটা ধর্তব্যে না এনে যদি কীভাবে লেখেছে, মুখস্থ করে নাকি নিজের চেষ্টায়—সেটাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা যায়, তাহলে শিক্ষার্থীর মস্তিষ্কের পরত আস্তে আস্তে খুলতে থাকবে এবং নিজস্ব সৃষ্টিবলয়ের দিকে মনোযোগী হয়ে ওঠবে সে।

www.pathagar.com

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও কয়েকটি প্রস্তাব

শিক্ষার ক্ষেত্রে এর নীতিমালা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি যেমন, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ এর পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন। কোন শ্রেণিতে কী পাঠ্য করা হবে, পাঠ্য বিষয়ের স্ট্যান্ডার্ড কী হবে, প্রতিটা বিষয়ের ব্যাপ্তি কতটুকু হবে—নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কোর্স সমাপ্ত করা যাবে কি না, পাঠ্য বিষয়ের সমাধান দানে শিক্ষার্থীর চেষ্টাই যথেষ্ট কি না, এ বিষয়গুলো মাথায় রেখে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করতে হবে। শিশুর জন্য শিশুতুল্য সূচিই পাঠ্য করতে হবে। অন্য দেশের শিক্ষানীতি অনুসরণ করবার আগে—আমাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত, প্রাতিষ্ঠানিক পরিমণ্ডল, শিক্ষা-উপকরণের অবস্থা, শিক্ষাদাতার মান ও দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে এবং এর নিরিখে নিজস্ব আদলের প্রয়োগধর্মী শিক্ষারীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। সেইসাথে কতিপয় ব্যাপারে প্রত্যয়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে :

১. প্রথম থেকে নিম্ন মাধ্যমিক পর্যন্ত (অষ্টম শ্রেণি) আমাদের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা হবে অভিন্ন ও একমুখী।

২. পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজি বিষয়ের প্রবেশাধিকার থাকবে না।

৩. ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ধর্মকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কেবল মাদ্রাসা শিক্ষায় তা আবশ্যিক বিষয় বলে স্বীকৃত হবে।

৪. নবম শ্রেণি থেকে মানবিক, বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু করতে হবে। বেশি জোর দিতে হবে কর্মমুখী শিক্ষার দিকে। ফলহীন, ভবিষ্যৎবর্জিত শিক্ষিত বেকার যাতে না বাড়ে, সেজন্য উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে দেয় নকলমুখী শিক্ষাকে বন্ধ করে দিতে হবে। ওই শিক্ষা কার্যত কোনো কাজে আসে না। এ শিক্ষা কাঠামোকে কীভাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় রূপান্তরিত করা যায়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

৫. উন্নত বিশ্বে, এমন কি ভারতেও সাধারণ শিক্ষার ক্রমশ সংকোচন ঘটানো হচ্ছে। সেক্ষেত্রে দ্রুত বাড়ানো হচ্ছে বিজ্ঞানভিত্তিক কারিগরি, কৃষি,

www.pathagar.com

যন্ত্রনির্ভর, বা ব্যবসায় শিক্ষা। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে আমাদেরকেও সেদিকে হাঁটতে হবে। প্রযুক্তি শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। তবে প্রচলিত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক হাতেকলমে কিছু না শিখিয়ে কেবল সনদমুখী শিক্ষা প্রদানকে নিরুৎসাহিত করতে হবে।

৬. শিশুশ্রেণি থেকে পাঠ্যক্রম এমনভাবে সাজাতে হবে, যাতে শিশুরা যুক্তিবাদিতা, উদারতা, মুক্তচিন্তা, সহনশীলতা, বিজ্ঞানমনস্কতার মধ্য দিয়ে বড় হয় এবং জীবনের সর্বত্র মৌলিক চিন্তন ও নিজস্ব বোধ দ্বারা পরিচালিত হয়।

৭. শিক্ষার সকল পর্যায়ে শ্রেণিবৈষম্যের বিলোপ ঘটাতে হবে। মেধানুসারে সবাখানে সবার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

৮. শিক্ষক নিয়োগ, সরকারি প্রতিষ্ঠানের বদলি, উচ্চতর পদে নিয়োগ—প্রভৃতি ক্ষেত্রে মেধাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেন কোনোভাবেই রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়, সেদিকে নির্মোহ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আপাদমস্তক পাল্টে ফেলার প্রবণতা কঠোরভাবে রোধ করতে হবে। যোগ্য ব্যক্তির জন্য যোগ্য স্থান অবশ্যই বরাদ্দ রাখতে হবে।

৯. শিক্ষা আর রাজনীতি পাশাপাশি চলতে পারে না, চলা উচিতও নয়। আমাদের দেশে এ-দুটো পাশাপাশি চলতে গিয়ে প্রথমটিকে দ্বিতীয়টি যেন গিলে ফেলেছে। প্রত্যেকটা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়— ছাত্র সংগঠন বা তাদের মুরুব্বি সংগঠনের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে। শিক্ষালয়ে রাজনীতির অপরিমেয় প্রভাব বজায় থাকলে মুক্তচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধিভিত্তিক শিক্ষাচর্চা অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়।

১০. মফস্বলি শিক্ষালয়, বিশেষত কলেজগুলোতে ছাত্র উপস্থিতি ভয়াবহভাবে হ্রাস পেয়েছে। ওই সময় তারা শ্রেণিকক্ষমুখী না হয়ে হয় প্রাইভেট পড়ে, বা কোচিং সেন্টারের ক্লাস করে। একজন শিক্ষার্থী, যে কখনো ক্লাসে আসে না, বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষাগুলোতে অংশই নেয় না, বিধি মোতাবেক ফাইনাল পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার যোগ্যতা থাকে না তার। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, এ ধরনের অছাত্ররা সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় বসার সুযোগ পেয়ে যায়। কিন্তু কীভাবে এবং কেন? এই অপপ্রবণতা রোধকল্পে আমাদের শিক্ষা প্রশাসনকে কঠোর ভূমিকা নিতে হবে।

www.pathagar.com

আমাদের অতীত ও বর্তমান-শিক্ষানীতিবিষয়ক কথকতা

বস্তুত যে কোনো দেশের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানবিক মানদণ্ডের প্রধান ভিত হলো ওই দেশের শিক্ষাব্যবস্থার স্বরূপ ও পরিকাঠামো এবং এ দুটো গড়ে উঠে দেশটির পরিকল্পিত বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষানীতির উপর। দুঃখজনক সত্য এই যে, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমরা বেশ ক'টি শিক্ষানীতি পেয়েছি, কিন্তু কোনোটাই স্থায়ী নীতি হিসেবে অনুসৃত হয়নি। কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বাধীন কমিশন প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত আট বছরব্যাপী অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক, একমুখী ও অভিন্ন শিক্ষানীতির জোর সুপারিশ করেছিল এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা বা নীতিবিষয়ক শিক্ষা দানের কথা বলেছিল। সেখানে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বৃত্তিমূলক ও সাধারণ শিক্ষা নামক দুটি ভাগে বিভক্ত করে কেবল মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার খোলা রাখবার কথা বলা হয়েছিল। সেখানে বেশি জোর দেয়া হয়েছিল কর্মমুখী, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর—যা ভারতসহ অন্যান্য দেশে অনুসৃত হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে ধর্ম বা নীতিশিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে স্থান দেয়া হয়েছিল।

খুদা কমিশনের এই শিক্ষানীতিকে মন্ত্রণালয়ের আর্কাইভে স্থান দিয়ে ১৯৭৮ সালে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমেদের নেতৃত্বে গঠন করা হয়েছিল 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' এবং এতে পর্যাপ্ত ধর্মীয় শিক্ষা এবং চরিত্র গঠনের উপর জোর দেয়া হয়েছিল। এই 'শিক্ষা পরিষদ' কাজ শুরু করার পর ১৯৮২ সালে রাষ্ট্রক্ষমতার হাত বদল হয় এবং আব্দুল মজিদ খানের নেতৃত্বে শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ প্রথম শ্রেণি থেকে আরবি ভাষা বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করে এবং এর সূত্র ধরে মফিজউদ্দিন আহমেদের 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন' ১৯৮৮ সালে খুবই হাস্যকরভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বয়ান দেয়, 'সকল মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি—এই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার উপর ভিত্তি করে বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও আন্তর্জাতিক সমঝোতার মনোভাব সৃষ্টি, সকল চিন্তা ও ধর্ম প্রেরণার উৎস হিসেবে সৃষ্টিকর্তার উপর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মানো এবং সৃষ্টিকর্তার

www.pathagar.com

উপর একনিষ্ঠ বিশ্বাসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও আত্মিক মূল্যবোধ জন্মানো।' এর প্রেক্ষিতে প্রথম শ্রেণি থেকে ধর্মকে বাধ্যতামূলক করা হয়, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত আরবি বা অন্য আর একটি ভাষাকে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করবার কথা বলা হয়; বস্তুত এই শিক্ষানীতির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা পেছন দিকে চলতে শুরু করে, যুক্তি-তর্ক-বিশ্লেষণকে দূরে সরিয়ে শিক্ষাকে কেবল বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত করার অপপ্রয়াস চালানো হয়।

১৯৯৭ সালে, পূর্ববর্তী শিক্ষানীতিগুলো ঝেরে ফেলে অধ্যাপক এম শামসুল হকের নেতৃত্বে নতুন একটি কমিটি গঠিত হয় এবং ওই কমিটি পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষাকে ধাপে ধাপে এক বছর করে বাড়িয়ে আট বছরব্যাপী করার সুপারিশ করে। ইংরেজি ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষার স্বীকৃতি দিয়ে তৃতীয় শ্রেণি থেকে তা পাঠ্য করার কথা বলে এবং প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার ভিন্নতা সম্পর্কে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বক্তব্য রাখে 'আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারা যেমন জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা, কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা, ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষা, বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয় প্রভৃতি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে। মান ও বৈশিষ্ট্যের বিচারে এ সব ভিন্ন।... ফলে শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই শিশুদের যোগ্যতার মধ্যে যেমন তারতম্য গড়ে ওঠে, তেমনি দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের মধ্যেও ভিন্নতা তৈরি হয়। তাতে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। আমাদের সংবিধানে স্পষ্টভাবে সমমানের সর্বজনীন মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে অন্তত প্রাথমিক স্তরে সবার জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে একই মান ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একই ধারার শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি করা আবশ্যক।' অবশ্য এ কমিশন প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কথা বললেও ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে প্রথাগত ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

২০০৩ সালে অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়ার নেতৃত্বে ২৫ সদস্যবিশিষ্ট 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন' গঠিত হয়। এই কমিশন পাঁচবছরি প্রাথমিক শিক্ষার ধারাকে অব্যাহত রাখার সুপারিশ করে এবং প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথাগত অভিমত দেয়, 'শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহতালার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা, যেন এই বিশ্বাস তার চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণা যোগায় এবং আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়তা করে' (ধারা ৩.২.১-অধ্যায় তিন)। অর্থাৎ এ কমিশনও শিশুচিত্তে অনুসন্ধিৎসা, মুক্তচিন্তার বিকাশ, জিজ্ঞাসা ইত্যাদির পরিবর্তে

www.pathagar.com

'ধর্মবোধ' জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিল এবং প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত সকল শ্রেণিতে ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব দিয়েছিল।

সর্বশেষ ২০০৯ সালে প্রণীত অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন শিক্ষা কমিশন সুপারিশ করেছে, 'তৃতীয় শ্রেণি থেকে মূলত জীবনী ও গল্পভিত্তিক বিভিন্ন ধর্ম নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে' এবং 'মানসম্পন্ন ইংরেজি লিখন-কথনের লক্ষ্যে যথাযথ কার্যক্রম শুরু থেকেই গ্রহণ করা হবে এবং ক্রমান্বয়ে ওপরের শ্রেণিসমূহে প্রয়োজনানুসারে জোরদার করা হবে।' বস্তুত এ শিক্ষানীতিতেও ন্যায়বোধ, আত্মিক গুণাবলী অর্জন ইত্যাদির আবহে শিক্ষার উদ্দেশ্যকে প্রকারান্তরের ধর্মের কোলেই সমর্পিত করা হয়েছে। সেইসাথে শিক্ষাকে কেবল জ্ঞানান্বেষণের লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে 'আয়নির্ভর' করার কথা জোরের সাথে বলা হয়েছে, 'দারিদ্র্য ও বৈষম্য লাঘবে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য টেকসই কর্মসংস্থানের বিকাশে তাদেরকে সক্ষম করে তোলাও জাতীয় শিক্ষানীতির একটি লক্ষ্য।' আমাদের শিক্ষানির্ধারকগণ ধরেই নিয়েছেন, শিক্ষাধারার স্তরে স্তরে শিক্ষার্থীরা ঝরে পড়বে, বিভিন্ন কারণে তারা পাঠগ্রহণ থেকে দূরে সরে যাবে, এর রোধকল্পে অনেক দেশ অনেক পদক্ষেপ নেয়, কিন্তু আমাদের শিক্ষানীতির একটিতেও এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি।

সত্যি কথা বলতে কী, আমাদের শিক্ষানীতির সুসংবদ্ধ সর্বজনগ্রাহ্য কাঠামো যেমন নেই, তেমনি নেই এর সুনির্দিষ্ট নীতি। এটা পরিচালিত হচ্ছে প্রথাগত নিয়মে, ক্ষমতাসীন দলের মর্জিমত, পূর্ববর্তী নিয়ম বা অনিয়মকে ইচ্ছেমতো গ্রহণ-বর্জন করে করে, অঞ্চল বা প্রতিষ্ঠানভেদে স্বেচ্ছাচারিতার মধ্য দিয়ে। একই পর্যায়ের পাশাপাশি পাঁচটি প্রতিষ্ঠান—সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডার গার্টেন স্কুল, এবতেদায়ি মাদ্রাসা, ইংরেজি ভার্সানের স্কুল, এনজিও পরিচালিত স্কুলের একই ক্লাসের পাঠ্যসূচির মধ্যে, প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম কানুনের মধ্যে—কী বিষম ফারাক বিদ্যমান, তা কল্পনা করতেও কষ্ট হয়। প্রথম শ্রেণি, ক্ষেত্রবিশেষে প্রাক-প্রথম শ্রেণি থেকেই এ ফারাকের সূচনা এবং পরবর্তী উচ্চতর শ্রেণিতে এর কেবল বিস্তৃতি। যাদের শৈশব-কৈশোর-তারুণ্য-যৌবন, পাঁচ ভিন্নতর পরিবেশে, ভিন্ন ভিন্ন চেতনা-উদ্দেশ্য ও স্বপ্ন নিয়ে বিকশিত হয়, জীবনের পরবর্তী কোনো পর্যায়ে তাদেরকে একসূত্রে নিয়ে আসা কেবল অসম্ভব নয়, অবাস্তব কল্পনার নামান্তর। এমন আত্মবিধ্বংসী, বিভাজন সৃষ্টিকারী শিক্ষাব্যবস্থা এই বঙ্গীয় দেশ ব্যতীত পৃথিবীর আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ।

www.pathagar.com

পরিশেষ

১৩৩৬ বঙ্গাব্দে সিলেটে অনুষ্ঠিত ছাত্র সম্মেলনে একটা বাণী পাঠিয়েছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, 'ভ্রান্ত আদর্শ' শিরোনামে। সেখানে তিনি বলেছিলেন, 'অধ্যয়নের অর্থ কতকগুলো গ্রন্থ পাঠ ও কতকগুলো পরীক্ষা পাশ। ইহার দ্বারা মানুষ স্বর্ণপদক লাভ করিতে পারে—হয়তো বড় চাকুরী পাইতে পারে—কিন্তু মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে পারে না। পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা উচ্চভাব বা আদর্শ শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি—এ কথা সত্য, কিন্তু সে সব ভাব যে পর্যন্ত আমরা উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করিয়া কার্যে পরিণত না করিতেছি, সে পর্যন্ত আমাদের চরিত্র গঠন হইতে পারে না।' বস্তুত শিক্ষার আসল লক্ষ্য বিদ্যা বা ভাবকে উপলব্ধি বা হৃদয়ঙ্গম করা এবং সেটা অন্যের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া। কিন্তু আমাদের প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থা কেবল মুখস্থ করায় উৎসাহ যোগায়, বৃত্তাবদ্ধ ভাবনায় চিত্তকে বন্দি করে রাখে, যুক্তি ও প্রশ্নকে বিশ্বাসের পাথরে চাপা দিয়ে রাখতে চায়।

একটা কথা বলা আবশ্যক, ধরে নিলাম আমাদের শিক্ষানীতিতে অনেক ভালো ভালো কথা আছে, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি বাতলানো আছে, কিন্তু সেই নীতি যদি কাজির গোয়ালের গরুর মতো হয় অর্থাৎ এর প্রয়োগ যদি সুষ্ঠুভাবে করা না হয়, তাহলে পুস্তকাবদ্ধ নীতিসমষ্টি থাকা কিংবা না থাকা একই কথা নয়? বলা হলো অমুক শ্রেণিতে অমুক বিষয় পড়ানো হবে, ইতিহাস-মানবিকতাবোধ-বিজ্ঞানচেতনা ইত্যাদি ইত্যাদি—শিশুক্লাস থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ধর্মবিষয় বাধ্যতামূলক করে শিশুচিত্তের বিভাজন করা হবে না—কিন্তু যে বিভাজন আমাদের মননে, পরিবারে, সমাজে, রাজনীতিতে সূচিত হয়ে গেছে, সে বিভাজন কেতাবি আইন দিয়ে দূর করা সম্ভব? আমাদের সংবিধানে কতই না মনোহর, মনোময়, সতর্কমূলক আইনি কথা আছে, সেই আইন অনেকেই মানে না—অথচ ব্রিটেনের কোনো লিখিত সংবিধানই নেই, কিন্তু সেখানকার প্রচলিত অলেখিত আইন শ্রদ্ধার সাথে মেনে চলে সবাই, কাজেই আইনি নীতিমালা লেখা বা না লেখা বড় কোনো প্রভাবক নয়। বড় কথা হলো,

www.pathagar.com

ব্যক্তিক-সামাজিক-রাষ্ট্রিক চেতনার অবস্থান ও প্রবণতা। আমাদের রাষ্ট্র আইন দিয়ে হাতে পায়ে যে শৃঙ্খল পরাতে পারে, সেটি শান্তির জন্য লোহার শৃঙ্খল—রাষ্ট্র চেতনাগত শৃঙ্খলে ব্যক্তি বা সমাজের মননকে আবদ্ধ বা পরিশীলিত করতে পারছে না বা পারার চেষ্টাও করছে না। সামষ্টিক চিত্তের পরিশীলন, বোধের সারস্বত উদ্বোধন—সেটা যুগ যুগ বিস্তারি দীর্ঘ প্রলম্বিত প্রক্রিয়া—যার বীজ আজ রোপিত হলে ফসল কবে পাওয়া যাবে—বোঝা খুব মুশকিল। তবে হ্যাঁ, জাতি গঠনের কাজটি, শিশুকে মানবিক উদার যুক্তিনিষ্ঠ শিক্ষা প্রদানের পদক্ষেপটি নিতে হবে রাষ্ট্রকেই। সেই ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিজেই যদি মানবিক বোধসম্পন্ন না হয়, কোনো দিকে একচোখা হয়ে তাকিয়ে থাকে কিংবা রাজনীতির মাঠে সুবিধা নেয়ার জন্য কোনো বিশেষ কৌশল গ্রহণ করে, সেটি সেই রাষ্ট্রের, দৃশ্যত সকল জনগণের চরম দুর্ভাগ্য বটে। কারণ রাষ্ট্রের কর্ণধারদের দল, মত, ধর্ম থাকলেও রাষ্ট্র যেহেতু প্রাণহীন প্রপঞ্চ—তাই তাকে কঠোরভাবে দল বা ধর্মনিরপেক্ষ থাকা উচিত, সকলের জন্যে সমতাভিত্তিক কাঠামোতে বিন্যস্ত হওয়া উচিত।

আর একটা কথা না বললেই নয়; উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষার অবকাঠামোগত বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা অনেক বেশি বিধায়, ওদের আদলের শিক্ষানীতি আমাদের এখানে প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা প্রায় অসম্ভব। অন্য উন্নততর শিক্ষাব্যবস্থা আমরা অনুকরণ বা অনুসরণ করব, ঠিক ততটুকুই—যা আমাদের সাধ্য, মানসিকতা ও ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। অন্ধ অনুকরণ বা অসম অনুকরণ—দেশ, জাতি বা ব্যক্তির জন্য মঙ্গল বয়ে না, বরং তা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। 'যে শিশু প্রথম লিখিতে শিখে, তাহাকে প্রথমে গুরুর হস্তাক্ষরের অনুকরণ করিতে হয়—পরিণামে তাহার হস্তাক্ষর স্বতন্ত্র হয়, এবং প্রতিভা থাকিলে সে গুরুর অপেক্ষা ভাল লিখিয়াও থাকে। তবে প্রতিভাশূন্যের অনুকরণ বড় কদর্য্য হয় বটে। যাহার যে বিষয়ে নৈসর্গিক শক্তি নাই, যে চিরকালই অনুকারী থাকে, তাহার স্বাতন্ত্র্য কখন দেখা যায় না। ...বাঙ্গালির মধ্যে প্রতিভাশূন্য অনুকারীরই বাহুল্য, এবং তাঁহাদিগকে প্রায় গুণভাগের অনুকরণে প্রবৃত্ত না হইয়া দোষভাগের অনুকরণেই প্রবৃত্ত হতে দেখা যায়। এইটি মহা দুঃখ। বাঙ্গালি গুণের অনুকরণে তত পটু নহে, দোষের অনুকরণে ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয়। এই জন্যই আমরা বাঙ্গালির অনুকরণপ্রবৃত্তিকে গালি পাড়ি।' (অনুকরণ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলী, পৃ-২০২, ২০৩)।

কাজেই আমাদের না পাশ্চাত্য, না মধ্যপ্রাচ্য—না ইংরেজি, না আরবি, কোনো রীতি বা ভাষাকে গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন নেই। আমাদেরকে নিজের

www.pathagar.com

অবস্থা এবং অবস্থান বিবেচনা করে দেশীয় আধারের সাথে আন্তর্জাতিকতা মিশিয়ে একটা কার্যকর ফলপ্রসূ বিভেদবর্জিত মানবিক শিক্ষানীতি অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে, যার প্রতিপাদ্য হবে 'জ্ঞান অর্জন কর, মানুষ হও, যুক্তবাদী হও, বেঁচে থাকার উপযোগী হও।' আমরা যেন ভুলে না যাই সেই অমিয় বাণী, "If God were to hold in his right hand all truth. And in his left hand the single ever active impule to seek after truth even though with the condition that I must enternally remain in error and say to me 'Choose', I would with humility fall before his left hand and say. 'Father, Give. For pure thoughts belong to thee alone.' (Cotthald Ephraim Lessing –Laocoon.)"

বাঙালির ভাবনাবলয়ের প্রাণপুরুষ থেকে ধার নিয়ে বলতে পারি, 'আর্যরা মধ্য এশিয়া হইতে ভারতে আসিয়াছেন; খৃস্টজন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্বে বেদ রচনা হইয়াছে—এই-সকল কথা আমরা বই হইতে পড়িয়াছি; বইয়ের অক্ষরগুলো কাটকুটহীন নির্বিকার। তাহারা শিশুবয়সে আমাদের উপরে সম্মোহন প্রয়োগ করে—তাই আমাদের কাছে আজ এ-সমস্ত কথা একেবারে দৈববাণীর মতো। ছেলেদের প্রথম হইতেই জানাইতে হইবে, এই-সকল আনুমানিক কথা কতকগুলা যুক্তির উপর নির্ভর করিতেছে। সেই-সকল যুক্তির মূল উপকরণগুলি যথাসম্ভব তাহাদের সম্মুখে ধরিয়া তাহাদের নিজেদের অনুমানশক্তির উদ্রেক করিতে হইবে। বইগুলা যে কী করিয়া তৈরি হইতে থাকে তাহা প্রথম হইতেই অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে তাহারা নিজেদের মনের মধ্যে অনুভব করিতে থাকুক। তাহা হইলেই বইয়ের যথার্থ ফল তাহারা পাইবে, অথচ তাহার অন্ধশাসন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে, এবং নিজের স্বাধীন উদ্যমের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিবার যে স্বাভাবিক মানসিক শক্তি, তাহা ঘাড়ের-উপরে-বাহির-হইতে-বোঝা-চাপানো বিদ্যার দ্বারায় আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইবে না—বইগুলোর উপরে মনের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন থাকিবে। বালক অল্পমাত্রও যেটুকু শিখিবে, তখনই তাহা প্রয়োগ করিতে শিখিবে। তাহা হইলে শিক্ষা তাহার উপরে চাপিয়া বসিবে না, শিক্ষার উপর সে-ই চাপিয়া বসিবে।' (আবরণ, পৃ-৩৩৪, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী সম্পাদিত)। বস্তুত শিক্ষা ও এর প্রয়োগনীতি সম্পর্কে রবিবাবুর এ-বক্তব্যের পর আর কোনো নতুন কথা বলার প্রয়োজন মনে করি না।

www.pathagar.com

শেষ হয়েও হইল না শেষ

'বাঙালির ছেলের মতো এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই। অন্য দেশের ছেলেরা যে বয়সে নবোদত দন্তে আনন্দমনে ইক্ষু চর্বণ করিতেছেন, বাঙালির ছেলে তখন ইস্কুলের বেঞ্চির ওপর কোঁচাসমেত দুইখানি শীর্ণ খর্ব চরণ দোদুল্যমান করিয়া শুধুমাত্র বেত হজম করিতেছেন, মাস্টারের কটু গালি ছাড়া তাহাতে আর কোনোরূপ মশলা মিশানো নাই।' (শিক্ষার হেরফের, রবীন্দ্ররচনাবলী ১২শ খণ্ড, পৃ-২৭৮)। রবীন্দ্রনাথের কালে সিংহভাগ বাঙালি শিশু বিদ্যালয়ে যেত না, ফলে মাস্টার মশাইয়ের অকৃপণ বেত্রবর্ষণ তাদেরকে স্পর্শ করতে পারত না। বর্তমান কালে—সকলের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষানীতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও শিশুদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ স্কুলবিমুখ হয়ে বেড়ে ওঠে; সেটা অবশ্য নিজেদের ইচ্ছেতে ঘটে না, তাদের জন্মদাতারাই সন্তানকে বিরত রাখেন স্কুল-যাওয়া থেকে।

'মুখ দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি' এমন বিশ্বাসবাদী সমাজের একাংশে প্রতি বছরই লক্ষ লক্ষ মুখের জন্ম হচ্ছে, ওইসব মুখের জন্মদাতাগণ—জন্ম দিয়েই খালাস, কারণ তারা তো 'বিশ্বাসই করেন, ব্যক্তিচেষ্টা থেকে আহার মেলে না, 'আহার দেবার মালিক স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা।' এরা নিজের কিংবা সন্তানের ভবিষ্যৎ সাজাবার জন্য শিক্ষার কোনোরূপ প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না, এদের কাছে জীবনের অর্থ হলো—তিন বেলা আহার, একটুখানি শারীরিক ও মানসিক বিনোদন, আর যে কোনো প্রক্রিয়ায় অর্থ-উপার্জন। সন্তান লেখাপড়া করবে, চাকরি করবে, তারপর তাদেরকে আর্থিক সহায়তা দেবে—এমন দূরবর্তী আশায় তারা পুরোপুরি আস্থাহীন। সন্তানের কাছ থেকে তারা চান তুরিৎ সহায়তা, আর্থিক সুবিধা—তাই সন্তান একটু বড় হওয়া মাত্র, তাদেরকে লাগিয়ে দেন বিভিন্ন কাজে, আয়-রোজগারের নিমিত্তে। ওইসব সন্তানের জীবনসংগ্রাম শুরু হয় বড্ড অকালে, ফুটপাতে-স্টেশনে, চায়ের দোকানে কিংবা অন্ধকার রাস্তায় এবং জীবন-যন্ত্রণার অভাবিত আঘাতে এরা পরিবার থেকে, সমাজ ও জীবনের

www.pathagar.com

আলো থেকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে।

পঞ্চধারায় বিকশিত বিদ্যালয়গামী শিশুরা—ইতোপূর্বে যাদেরকে একই গ্রন্থিভুক্ত করবার জন্য 'পঞ্চপাণ্ডব' শব্দটি বেছে নিয়েছিলাম, মননে-হৃদয়ে এবং রক্তধারাতে তাদের খুব ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও, স্কুলে না যাওয়া শিশুরা—কুমারীপুত্র 'কর্ণ'-এর মতো পাণ্ডব কিংবা অন্য ভাইদের থেকে পুরোপুরি বিযুক্ত হয়ে দিন কাটায়। আমাদের সমাজ এবং রাষ্ট্র যেন ধরেই নেয়—বস্তি কিংবা ফুটপাতই ওদের বাসস্থান, শিক্ষাবর্জিত থাকা এবং মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিন গুজরান করা—ওদের অনিবার্য নিয়তি। কুন্তী তাঁর সন্তান কর্ণকে বুকে টানতে পারেননি সমাজের ভয়ে, কর্ণের উত্তর প্রজন্মের শিশুরা শিক্ষালয়ে যেতে পারছে না জন্মদাতার আর্থিক অনটন বা আগ্রহের অভাবে—এখানে রাষ্ট্র কি শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কর্ণানুসারীদেরকে বুকে টেনে নিতে পারে না? রাষ্ট্র তো রক্ত মাংসে গড়া ভীরু কিংবা দ্বিধান্বিত কুন্তী নয়—রাষ্ট্র জনকল্যাণমূলক বৃহৎ প্রতিষ্ঠান, কাজেই কর্ণবংশীয়দের যথাযথ স্বীকৃতি দেয়া, শিক্ষায় দ্যুতিত করা—রাষ্ট্রের অপরিহার্য কর্তব্যের আওতায় পড়ে না?

মহান দার্শনিক সক্রেটিস বিশ্বাস করতেন, যিনি জ্ঞান এবং সত্যের সন্ধান পেয়েছেন, তাঁর পবিত্র কর্তব্য হচ্ছে—ওই জ্ঞান বা সত্যকে নিজের গরজে অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়া। জগৎগুরু সক্রেটিস তা-ই করতেন—পথের মোড়ে, হাটে-বাজারে, মেলা-উৎসবে, যেখানেই মানুষের ভিড় আছে—সেই মুক্ত পরিবেশে জ্ঞানের বাণী অকাতরে প্রচার করে যেতেন। আজকের সমাজে, শিক্ষা-বাণিজ্যে কলুষিত জীবনব্যবস্থা বদলানোর জন্য এবং কর্ণবংশীয় পথশিশুদের বিদ্যা বিলানোর জন্য—প্রয়োজন একজন নতুন সক্রেটিসের, যিনি, 'দেয়াল দিয়া ঘিরিয়া, গেট রুদ্ধ করিয়া, দারোয়ান দিয়া পাহারা বসাইয়া, শাস্তি দ্বারা কণ্টকিত করিয়া, ঘণ্টা দ্বারা তাড়া দিয়া মানব জীবনের আরম্ভে' (শিক্ষা সমস্যা, রবীন্দ্র রচনাবলী ১২ শ' খণ্ড, পৃ-৩০৫)। শিক্ষার যে ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করেছি বা বিশাল সংখ্যক পথশিশুকে বাদ দিয়ে খণ্ডিত শিক্ষার যে পসরা সাজিয়ে বসেছি—তা থেকে বিদ্যালয়গামী এবং বিদ্যালয়-সংস্রববর্জিত সবাইকে, দেশ এবং জাতিকে—যুক্তি-তর্ক-বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে ভরিয়ে দেবেন প্রকৃত জ্ঞানের অমল উজ্জ্বলতায়।

www.pathagar.com

একটি ইত্যাদি প্রকাশনা

ISBN 978 984 904 369 0

www.pathagar.com